১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ও রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ)

গবেষক

মোশারফ হোসেন
রেজিস্ট্রেশন নং ৩৮/২০০৮-২০০৯
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন
অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এপ্রিল ২০১৪

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ও রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ও রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ)

গবেষক

মোশারফ হোসেন
রেজিস্ট্রেশন নং ৩৮/২০০৮-২০০৯
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন
অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এপ্রিল ২০১৪

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকারনামা

আমি মোশারফ হোসেন, এম. ফিল. রেজিস্ট্রেশন নং ৩৮/২০০৮-২০০৯, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, আমার এম.ফিল ডিগ্রির জন্য দাখিলকৃত '১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ও রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি অথবা এর কোনো অংশ কোনো ডিগ্রি অথবা প্রকাশনার জন্য অন্য কোথাও দাখিল করিনি।

গবেষক

(মোশারফ হোসেন)
রেজিস্ট্রেশন নং ৩৮/২০০৮-২০০৯
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

মোশারফ হোসেন, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য দাখিলকৃত "১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ও রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পর্কে প্রত্যয়ন করছি যে, এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লিখিত হয়েছে। এই অভিসন্দর্ভটি অথবা এর কোনো অংশ কোনো ডিগ্রি অথবা প্রকাশনার জন্য অন্য কোথাও দাখিল করা হয়নি। এটি এখন কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেওয়ার জন্য অনুমোদন করছি।

তত্ত্বাবধায়ক

(ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন)
অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার এমফিল গবেষণার অভিসন্দর্ভ '১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ও রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা'। আমার এ অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন। তাঁর ঐকান্তিক সহযোগিতায় অভিসন্দর্ভটি বর্তমান রূপ পেয়েছে। আমার তত্ত্বাবধায়কের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ যিনি প্রতিনিয়ত তাগিদ না দিলে হয়তো থিসিস কম্পিউটার টাইপ থেকে শুরু করে এ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় নিজ হাতে করতে শিখতাম না, যা আমাকে বিশেষভাবে উপকৃত করেছে। একাডেমিক ও হলের কাজে প্রচণ্ড ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি আমাকে অনুপ্রেরণা, সহযোগিতা এবং সুচিন্তিত পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। একই সাথে তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ ব্যবহার করার সুযোগ করে দিয়েছেন। ফলে আমি আমার গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে পেরেছি। আরো একজন শিক্ষকের নিকট আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ, তিনি হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. আহমেদ কামাল। যিনি সকল সময় আমার গবেষণা কর্মটি শেষ করার জন্য তাগিদ দিতেন, খোঁজ নিতেন। এমনকি তাঁর ব্যক্তিগত কম্পিউটার, সংগ্রহ ব্যবহার করার সুযোগ দিয়েছেন। তাঁর এ ধরনের সহযোগিতা না পেলে প্রাথমিক পর্যায়েই গবেষণা কর্মটি চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়তো।

কৃতজ্ঞ চিত্তে আরো স্মরণ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক প্রাক্তন অধ্যাপক কে. এম মোহসীন, অধ্যাপক শরীফউদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক এম মোফাখ্খারুল ইসলাম, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, অধ্যাপক শরিফউল্লাহ ভূঁইয়া, ড. সোনিয়া নিশাত আমিন, ড. আহমেদ আবদুল্লাহ জামাল, ড. রাণা রাজ্জাক, ড. নুরুল হুদা আবুল মনসুর, অধ্যাপক মেসবাহ কামাল, ড. আশফাক হোসেন, ড. আমজাদ আলী, মোহাম্মদ গোলাম সাকলায়েন সাকী, ড. আকসাদুল আলম, ড. ইফতেখার ইকবাল, ড. সানিয়া সিতারা, শারমীন আখতারকে। আরো স্মরণ করছি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. শামসুন নাহার, ড. মোহাম্মদ সেলিম, দৈনিক প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান, বিআইডিএস-এর গবেষণা পরিচালক ড. বিনায়ক সেন, প্রতিচিন্তার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক খন্দকার সাখাওয়াত আলী, বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের গবেষক ও লেখক ড. মোহাম্মদ হাননান এর কথা। যারা সকল সময় আমার গবেষণা কর্মের খোঁজ খবর নিয়েছেন, দ্রুত কাজটি শেষ করার পরামর্শ দিতেন। এছাড়াও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি আমার কয়েকজন শ্রদ্ধেয় বড় ভাই-বোন ইফাত আরা বিথী, আলী আকবর, মামুনুর রশীদ, আব্দুল মান্নান হাওলাদার, শহিদুল হাসান, আজিজুল রাসেল যারা সকল সময় আমার গবেষণা কর্মটি দ্রুত শেষ করার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। একই সাথে স্মরণ করছি আমার তিন বন্ধু তরিফুল ইসলাম শামীম, আবু সুফিয়ান রিজু ও মোহাম্মদ মাহতাব হোসেন মাসুমের কথা যারা আমাকে আর্থিক ও মানসিকভাবে সহযোগিতা করেছে। আরো যে সকল বন্ধু সবসময় গবেষণা কর্মের খোঁজ নিতেন তারা

Dhaka University Institutional Repository

হলেন মোঃ শামীম হোসেন, মাহবুবুল হক ধ্রুব, কাজী হারুনুর রশীদ পিন্টু, এস. এম. তানভীর আহমদ, সাবিনা ইয়াসমিন সুমা, নূর ই আলম শাহেদ, ছোট ভাই ইমতিয়াজ আহমেদ যারা সকল সময় গবেষণা কর্মের খোঁজ নিতেন ও কাজের অগ্রগতি জানতে চাইতেন।

বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি যার নিকট অনেক বেশি ঋণী তিনি আমার সহধর্মিণী রেহানা পারভীন। যিনি অনেক সময় কষ্ট করে আমার দুর্বোধ্য হাতের লেখা উদ্ধার করে কম্পোজ করেছেন, গবেষণা কর্মের বিভিন্ন অংশ পাঠ করে সুচিন্তিত পরামর্শ ও মতামত দিয়েছেন। একই সাথে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের কাজেও আমাকে নিরলসভাবে সহযোগিতা করেছেন। গবেষণা কর্মটি তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য সবসময় অনুপ্রেরণা ও তাগিদ দিতেন।

গবেষণা কাজে তথ্য সংগ্রহের জন্য আমাকে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের দ্বারস্থ হতে হয়েছে। এগুলি হলো বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভাস ও গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর গ্রন্থাগার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় গ্রন্থাগার, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গ্রন্থাগার, দৈনিক প্রথম আলোর গ্রন্থাগার ও আর্কাইভ প্রভৃতি। এসব প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সবশেষে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার বাবা মরহুম মোঃ হাছান আলীকে যিনি আমার গবেষণা কর্মটির শেষ দেখে যেতে পারেননি। আমার মা মিসেস পিয়ারা বেগম যিনি সবসময় আমার কাছে জানতে চান আমার এম. ফিল গবেষণা কবে শেষ হবে। বাবা-মা দু'জনের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। যাদের ঋণ অপরিশোধযোগ্য।

আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভ '১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ও রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা' বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে যৎসামান্যও যদি এগিয়ে নিতে সহায়তা করে তবেই আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো। যতদূর সম্ভব অভিসন্দর্ভটি ত্রুটিহীনভাবে উপস্থাপন করার সবসময় চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি, মুদ্রণ জনিত ভুল থাকে তার ব্যর্থতার দায় একান্তই আমার। সতত চেষ্টা সত্ত্বেও ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ জানাচ্ছি।

মোশারফ হোসেন
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এপ্রিল ২০১৪

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
অধ্যায় ১: ভূমিকা	১
অধ্যায় ২: ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রেক্ষাপট	১০
অধ্যায় ৩: আইনগত কাঠামো আদেশ, বিষয়বস্তু ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিক্রিয়া	৩৫
অধ্যায় ৪: নির্বাচন ব্যবস্থাপনা	৫৩
অধ্যায় ৫: রাজনৈতিক দলগুলির নির্বাচনী ইশতাহার ও প্রচারণা কার্যক্রম	৬৫
অধ্যায় ৬: ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল	১০৭
অধ্যায় ৭: গণমাধ্যম ও ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন	১৩২
অধ্যায় ৮: উপসংহার	১৫১
পরিশিষ্ট	১৫৯
গ্রন্থপঞ্জি	২০৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পূর্ব পাকিস্তান পকিস্তানের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। শুরু থেকেই পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানকে তাদের উপনিবেশ মনে করে শোষণ প্রক্রিয়া চালাতে থাকে। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রথম বাঙালিরা তাদের দাবি আদায়ের অধিকারের সংগ্রামে লিপ্ত হয়। ১৯৫৪ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রে প্রথমবারের মতো প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকটি রাজনৈতিক দল মিলে গঠিত যুক্তফ্রন্ট জয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এ বিজয় মেনে নিতে পারে নি। কারণ এ নির্বাচনে মুসলিম লীগের মত রাজনৈতিক দলের ভরাডুবি ঘটে। যুক্তফ্রন্ট সরকার মন্ত্রিসভা গঠন করলেও গভর্নর জেনারেল চক্রান্ত করে ১৯৫৬ সালে মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেয়। একই সাথে পাকিস্তানের স্বাধীনতার নয় বছর পরে ১৯৫৬ সালে সংবিধান রচনা করা হলেও কেন্দ্রীয় সরকার সে সংবিধান বাতিল করে অন্যায়ভাবে গভর্নর জেনারেলের শাসন চালু করে। ১৯৫৮ সালে গভর্নর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জাকে সরিয়ে দিয়ে পাকিস্তানের রাজনীতিতে আইয়ুব খান আর্বিভূত হন। সে সাথে শুরু হয় সামরিক শাসন। নিজের ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার জন্য নিজে একের পর এক কার্যকর পদক্ষেপ নেন। আইয়ুব খানের শাসনামলে ১৯৬০ ও ১৯৬২ সালে দুইবার বিরোধী দলবিহীন এবং ১৯৬৪ সালে 'প্রহসনের নির্বাচন' অনুষ্ঠিত হয়। সবগুলি নির্বাচনে তাঁর মনোনীত বিডি মেম্বার বা মৌলিক গণতন্ত্রীদের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে পাকিস্তানের রাজনীতিতে তিনি নিজের আসনকে আরো পাকাপোক্ত করেন। সমান্তরালভাবে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির উপর খড়গহস্ত চালান। রাজনীতিবিদদের উপর জেল জুলুম নির্যাতন মিথ্যা মামলা দিয়ে গ্রেপ্তার করে রাখেন যাতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে কেউ তাঁর অন্যায় শাসনের বিরুদ্ধে কথা বলতে না পারে। কিন্তু স্বাধীনচেতা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এ শাসন বেশিদিন মেনে নেয়নি।

আইয়ুব খানের ক্ষমতা গ্রহণের কয়েক বছরের মধ্যেই ১৯৬২ সালে প্রথমবারের মতো শিক্ষা আন্দোলনের মাধ্যমে তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে পাক-ভারত যুদ্ধের সময়ের অভিজ্ঞতা, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণের কারণে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি সম্বলিত প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বাঙালি জাতি ছয় দফা দাবিকে তাদের প্রাণের দাবি হিসেবে গ্রহণ করে। ছয় দফাকে ঘিরে যখন আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে তখন এ আন্দোলন দমনের জন্য আইয়ুব খান একের পর এক চক্রান্ত শুরু করেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে মিথ্যা মামলা দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান সহ ৩৫ জন ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা হয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিরোধিতা করে শুরু হয় আন্দোলন, যে আন্দোলন ব্যাপকতা পায় ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে। গণঅভ্যুত্থান পূর্ব পাকিস্তানে গণজোয়ার সৃষ্টি করে। এক দশকব্যাপী আইয়ুব শাসনের বিরোধিতা করে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বস্তরের জনগণ

Dhaka University Institutional Repository

রাস্তায় নেমে আসে। আইয়ুব শাসনের প্রতি অনাস্থা তৈরি হয়ে যায় পাকিস্তানের সর্বত্র। বাধ্য হয়ে পাকিস্তানের উদ্ভূত পরিস্থিতি সামাল দিতে না পেরে আগরতলা মামলা প্রত্যাহারসহ সকল রাজবন্দিদের মুক্তি দিতে বাধ্য হন। কিন্তু যে রাজনৈতিক সংকট তৈরি হয় তার সমাধান হয়নি। সংকট থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে আইয়ুব খান তাঁর উত্তরসূরী জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে পাকিস্তানের রাজনীতি থেকে বিদায় নেন।

জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় এসে আবার সামরিক শাসন জারি করেন। একই সাথে তিনি প্রধান সেনাপতি, সামরিক আইন প্রশাসক ও রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইয়াহিয়া খান তাঁর প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন তিনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ব্যারাকে ফিরে যাবেন। ঈপ্সিত লক্ষ্যের জন্য অর্থাৎ একটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য তিনি কাজ শুরু করেন। নতুন নির্বাচন কমিশন নিয়োগ করে নতুন ভোটার তালিকা করার কাজ শুরু করা হয়। ১৯৭০ সালে আইনগত কাঠামো আদেশ ঘোষণা করে জানানো হয় ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর জাতীয় পরিষদের ও ২২ অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তাঁর এ ঘোষণার ফলে পাকিস্তানের রাজনীতিতে এক প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। সকল রাজনৈতিক দল নির্বাচন নিয়ে তাদের কর্মযজ্ঞ শুরু করে। ইতিমধ্যে ইয়াহিয়া খান রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ায় দেশব্যাপী রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা শুরু হয়ে যায়। সবাই অপেক্ষা করে একটি সাধারণ নির্বাচনের। ১৯৭০ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ববাংলার কিছু অঞ্চলে বন্যা হলে বামপন্থী ও ডানপন্থী দলগুলো নির্বাচন পিছিয়ে দেয়ার দাবি জানাতে থাকে। ইয়াহিয়া খান তাদের দাবির প্রেক্ষিতে নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের ও ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন ধার্য্য করেন। যখন সবাই তাদের নিজ নিজ দলের জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে নির্বাচনী প্রচারণা কার্যে ব্যস্ত তখন ১২ নভেম্বর পূর্ববাংলার উপকূল অঞ্চলে আঘাত হানে ভয়াবহ জলোচ্ছাস ও ঘূর্ণিঝড়। প্রাণ হারায় আনুমানিক ১০ লক্ষ মানুষ। এর পরিপ্রেক্ষিতে আবার নির্বাচন পিছানোর দাবী জানানো হয়। কিন্তু শেখ মুজিব সহ কিছু রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এ দাবী অগ্রাহ্য করে। কারণ তাদের মনে শঙ্কা ছিল এভাবে নির্বাচন পিছাতে থাকলে শেষ পর্যন্ত না নির্বাচন বানচাল হয়ে যায়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান নির্বাচনের তারিখ না পিছিয়ে দুর্গত এলাকার জন্য নতুন তারিখ ঘোষণা করে নির্বাচনের পূর্বের তারিখ বহাল রাখেন। পাকিস্তানের জনগণসহ সারাবিশ্বের মানুষও অপেক্ষা করতে থাকে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কি ঘটে তা দেখার জন্য। কারণ এ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের রাজনীতিতে ক্ষমতার পালাবদল ঘটবে এবং একই সাথে যে সামরিক শাসনের ধারা শুরু হয়েছে তার সমাপ্তি ঘটবে।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ও পশ্চিম পাকিস্তানে ভুট্টোর পিপলস পার্টি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে। দু'অঞ্চলে দুটি রাজনৈতিক দল আঞ্চলিক মর্যাদা নিয়ে আর্বিভূত হয়। কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে যখন টালবাহানা শুরু হয় তখন পূর্ব পাকিস্তান থেকে দাবি ওঠে স্বাধীনতার। এর আগে পূর্ব পাকিস্তান থেকে সবসময় বলা হতো স্বায়ত্তশাসনের কথা। স্বাধীনতার দাবি তখন পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র জোরালো হয়ে ওঠে। পূর্ব

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানের জনগণ আর পাকিস্তানের উপনিবেশ হিসেবে থাকতে চাচ্ছিল না। তারা নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয়, স্বতন্ত্র ভূ-খণ্ডের দাবি করে স্বাধীনতার প্রস্তুতি নেয়। ১৯৭১ সালের জানুয়ারি থেকে পাকিস্তানের রাজনীতিতে ভিন্ন ধারা প্রবাহিত হতে থাকে। বিশেষ করে মার্চ মাস থেকে শেখ মুজিবের ডাকে শুরু হয়ে যায় অসহযোগ আন্দোলন। পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়ে। পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতি, প্রশাসন, রাজনীতি শেখ মুজিবের নির্দেশে চলতে থাকে। অপরদিকে গণপরিষদের অধিবেশন ও ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে ইয়াহিয়া খান ও ভুট্টোর আলোচনার নামে ষড়যন্ত্র শুরু হয়। অবধারিতভাবে স্বাধীনতার দাবি তখন প্রকট হয়ে ওঠে। পশ্চিম পাকিস্তানিরা অপারেশন সার্চলাইট নামে বাঙালি নিধনের নীল নকশা প্রণয়ন করে সর্বত্র অপারেশনের প্রস্তুতি নেয়। ২৫ মার্চ গভীর রাতে শুরু করে এ অপারেশন। দীর্ঘ নয় মাস বাঙালি জাতি যুদ্ধ করে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ নামে নতুন একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে প্রণীত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থসমূহে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি রূপে ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৬২ এর ছাত্র আন্দোলন, ১৯৬৬ এর ছয় দফা, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়। স্বাধীনতার পটভূমিকায় বাঙালির ঐক্য সংগঠনে ১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচন এক সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালন করে। তাই বিষয়টি ব্যাপক ও বিস্তারিত আলোচনা ও বিশ্লেষণের দাবী রাখে। আমি যখন এ বিষয়টির উপর গবেষণা করার জন্য মনস্থির করি তখন প্রতিটি গ্রন্থের এ সীমাবদ্ধতা দেখতে পাই। নির্বাচন সময়কালীন রাজনৈতিক দলগুলির কি ধরণের ভূমিকা ছিল তা কোনো গ্রন্থে খুঁজে পাওয়া যায়নি। কোন প্রেক্ষিতে পাকিস্তানের ২৩ বছর পরে কেন নির্বাচন হলো, রাজনৈতিক দলগুলো এ নির্বাচনকে কিভাবে নিয়েছে, তাদের অবস্থান কেমন ছিল, তাদের কর্মকাণ্ড, প্রচারণা, স্লোগান, আওয়ামী লীগের ম্যান্ডেট রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে তা কোথাও আলোচনা করা হয়নি। তাই আমি আমার গবেষণায় পুরো নির্বাচনকালীন সময়ের সাথে সাথে রাজনৈতিক দলগুলির সম্পৃক্ততা, তাদের কর্মকাণ্ড, তাদের ভূমিকা কেমন ছিল তার উপর বেশি জোর দিয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু অভিসন্দর্ভ রচনার জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে সব জায়গায় নির্বাচন সম্পর্কে তথ্য পাওয়া গেলেও রাজনৈতিক দলগুলির কর্মকাণ্ড নিয়ে কোনো তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি। নির্বাচন সংক্রান্ত বর্ণনা পাওয়া গিয়েছে পাকিস্তান গেজেট, নির্বাচন কমিশন রিপোর্ট ও অন্যান্য দ্বৈতীয়িক উৎসে। তাই রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা ও কর্মকাণ্ড খুঁজতে গিয়ে আমাকে দৈনিক পত্রিকার উপর নির্ভর করতে হয়েছে বেশি। কেননা দৈনিক পত্রিকা নির্বাচনসময়কালীন জুড়ে রাজনৈতিক দলগুলির কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিভিন্ন সময় গুরত্বসহকারে সংবাদ পরিবেশন করেছে। এ সকল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমি আমার গবেষণায় দেখানোর চেষ্টা করেছি ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে যে তিন ধারার রাজনৈতিক দল ছিল তাদের ভূমিকা কেমন ছিল। তারা নির্বাচনকে কিভাবে নিয়েছে এবং এক্ষেত্রে তাদের কর্মকাণ্ডগুলি কেমন ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

'১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ও রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি ভূমিকা ও উপসংহারসহ আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করা হলো। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে নির্বাচনের প্রেক্ষাপট হিসেবে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় ও পাকিস্তান শাসনামলে নির্বাচনব্যবস্থা অর্থাৎ ১৯৩৭, ১৯৪৬, ১৯৫৪, আইয়ুব শাসনের সময় অনুষ্ঠিত তিনটি নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এসব নির্বাচনগুলি কোন প্রেক্ষাপটে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, নির্বাচনে কোন কোন দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল, তাদের প্রচারণা কৌশল কেমন ছিল, কার কেমন কোন অঞ্চলে জনপ্রিয়তা ছিল, ইশতাহারের বিষয়বস্তু ও নির্বাচনের ফলাফল আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের কারণে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায় এ আইনের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট ছিল। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে সর্বপ্রথম সীমিত আকারে ভারতীয় প্রদেশগুলোতে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন, ভোটাধিকার সম্প্রসারণের কারণে বাংলার মুসালমান নেতাদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা লক্ষ করা যায়। বাংলায় মুসলমানের সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় মুসলিম নেতৃবৃন্দ নির্বাচনের মাধ্যমে এ প্রদেশে রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপনের সুযোগ দেখতে পান। এ সময় দেশের অধিকাংশ বঞ্চিত কৃষকদের নেতৃত্বদানে এগিয়ে আসেন এ কে ফজলুল হক। পূর্ববাংলায় মুসলিম লীগ নামে রাজনৈতিক দলের প্রভাব থাকলেও কৃষক প্রজা পার্টি সক্রিয় রাজনৈতিক দল হিসেবে আর্বিভূত হয়। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে এ নতুন দলটি তৃতীয় স্থান লাভ করে। এ নির্বাচনের নয় বছর পর ভারতের সাধারণ ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৬ সালে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন অনুযায়ী ৫ বছর পরপর নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা থাকলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে তা সম্ভব হয়নি। ১৯৪৬ সালের নির্বাচন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় দলের জন্য ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ নির্বাচনে দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগের উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র পাকিস্তানের যৌক্তিকতা প্রমাণ করা এবং অপরদিকে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল অখণ্ড ভারতের যথার্থতা প্রমাণ করা। মুসলিম লীগের জন্য এ নির্বাচন ছিল ব্যালট বিপ্লব। কারণ ১৯৩৭ সালের তুলনায় ১৯৪৬ সালে দল অনেক বেশি সুসংগঠিত ছিল। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের ফলাফল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পথকে প্রশস্ত করে। ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্রের জন্মের পর পাকিস্তানের রাজনীতিতে ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর দেশব্যাপী মুসলিম লীগের যে অপশাসন শুরু হয় তার বিরুদ্ধে এ নির্বাচন ছিল ব্যালট বিপ্লব। কেননা এ নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি ঘটানোর জন্য পূর্ববাংলার সমমনা কয়েকটি রাজনৈতিক দল মিলে যুক্তফ্রন্ট নামে একটি রাজনৈতিক জোট গঠন করে। এ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল তাদের নিজেদের জনসমর্থন যাচাই করার সুযোগ পায়। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করলেও কিছুদিনের মধ্যে অন্যায়ভাবে গভর্নর জেনারেলের শাসন ও পরবর্তীতে গভর্নর জেনারেলকে হটিয়ে দিয়ে জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক শাসন শুরু হয়। আইয়ুব খান ক্ষমতায় এসে নিজের আসনকে পাকাপোক্ত করার জন্য ৮০,০০০ মৌলিক গণতন্ত্রী সৃষ্টি করেন। এসব মৌলিক গণতন্ত্রীদের দ্বারা তিনি নির্বাচিত হতেন। তাঁর শাসনকালে মৌলিক গণতন্ত্রের আওতায় তিনটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬০ সালের হ্যাঁ/না ভোট, ১৯৬২ সালে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন, ১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। এ তিনটি নির্বাচনে জনগণের

Dhaka University Institutional Repository

কোনো প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার ছিল না। আইয়ুব খান সৃষ্ট মৌলিক গণতন্ত্রীরা তাকে নির্বাচিত করে। তিনটি নির্বাচন করলেও তা সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য হয়নি। তাঁর শাসনকালের শেষ পর্যায়ে গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে তাকে পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে বিদায় নিতে হয়। তখন সর্বত্র দাবি ওঠে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের। যা ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত হয়।

অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ে আইনগত কাঠামো আদেশ, এর বিষয়বস্তু এবং রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিক্রিয়া আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ আইয়ুব খান গণঅভ্যুত্থানের মুখে তাঁর পরবর্তী উত্তরসূরী ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ক্ষমতা গ্রহণ করে ইয়াহিয়া খান ১০ এপ্রিল তাঁর প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করে ঘোষণা করেন তিনি পাকিস্তানের উপর কোনো শাসনতান্ত্রিক ফর্মূলা চাপিয়ে দিতে চান না। তিনি প্রশাসনকে সঠিক পথে চালাতে, আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে এবং সবশেষে নির্বাচন অনুষ্ঠান করে গণতান্ত্রিক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চান। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। এ ভাষণে তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করার রূপরেখা প্রদান করেন। ভাষণে তিনি পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংকট নিরসনের জন্য চারটি পন্থার কথা বলেন। তন্মধ্যে চতুর্থটি ছিল একটি সামরিক আইনগত কাঠামো রচনা করে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা। যাতে নির্বাচিত পরিষদ একটি শাসনতন্ত্র রচনা করতে পারে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা হস্তান্তর পরিকল্পনাকে দেশের রাজনীতিবিদরা স্বাগত জানায়। এমনকি বিদেশী পত্রপত্রিকায়ও এর প্রশংসা করা হয়। প্রথমে বলা হয়েছিল প্রেসিডেন্ট ১৯৭০ সালের ২৩ মার্চ আইনগত কাঠামো আদেশ ঘোষণা করবেন। কিন্তু তা ঘোষণা করা হয় ৩০ মার্চ রাওয়ালপিণ্ডি থেকে। আইনগত কাঠামো আদেশ কোনো শাসনতন্ত্র নয় বরং এটি ছিল নির্বাচন অনুষ্ঠানের কর্মপদ্ধতি। আইনগত কাঠামো আদেশে একটি মুখবন্ধ, ২৭টি অনুচ্ছেদ এবং তিনটি পরিশিষ্ট ছিল। আইনগত কাঠামো আদেশে ভবিষ্যতের সংবিধান সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়। আইনগত কাঠামো আদেশ ঘোষণা দেওয়ার পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। কেউ প্রেসিডেন্টকে অভিনন্দন জানায়। আবার কেউ আইনগত কাঠামোর ২০, ২৫ ও ২৭ নং ধারার বিরোধিতা করে। কেউ কেউ এসব ধারা সংশোধন না করলে নির্বাচনে অংশ নিবে না বলেও উল্লেখ করে। একমাত্র আওয়ামী লীগ আইনগত কাঠামো আদেশের বিরোধিতা করলেও তারা নির্বাচন করার ব্যাপারে প্রথম থেকেই আগ্রহ দেখায়। পরবর্তীতে দেখা যায় সব রাজনৈতিক দল আইনগত কাঠামো আদেশের অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে সম্মত হয়। তাই এ অধ্যায়ে আইনগত কাঠামো আদেশের পটভূমি, আইনগত কাঠামো আদেশের বিষয়বস্তু, আইনগত কাঠামো আদেশ ঘোষণার পর রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিক্রিয়া আলোচনা করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায়ে ১৯৭০ সালের নির্বাচন ব্যবস্থাপনা আলোচনা করা হয়েছে। জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণ করার পর ১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর বেতার ভাষণে ঘোষণা করেন ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর জাতীয় পরিষদের এবং ২২ অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বন্যার কারণে নির্বাচন পিছিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

নতুন তারিখ ধার্য্য করা হয় ৭ ডিসেম্বর ও ১৭ ডিসেম্বর। নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তনের কারণে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। নতুন নির্বাচনী তারিখ ঘোষণার পর যখন সবাই নির্বাচনী প্রচারণা নিয়ে ব্যস্ত তখন ১২ নভেম্বর পূর্ববাংলার উপকূল অঞ্চলে আঘাত হানে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস। যার ফলে আবার দাবি ওঠে নির্বাচন পিছানোর। কিন্তু ইয়াহিয়া খান শুধুমাত্র দুর্গত এলাকার জন্য নতুন নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে আগের তারিখ বহাল রাখেন। একটি সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৬৯ সালের ২ জুলাই সুপ্রীম কোর্টের বাঙালি বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের নেতৃত্বে একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করেন। এ নির্বাচন কমিশনকে দায়িত্ব দেয়া হয় সর্বমহলে গৃহীত হবে এমন একটি ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণের জন্য। সে মতে নির্বাচন কমিশন ১৯৭০ সালের ১৫ জুনের মধ্যে নতুন ভোটার তালিকা সম্পন্ন করে এবং একই সাথে কিছুদিনের মধ্যে নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করে। পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের ৫৮টি নির্বাচনী এলাকা, প্রাদেশিক পরিষদের ৯৬টি নির্বাচনী এলাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদে ৩৯টি ও প্রাদেশিক পরিষদে ৮৯টি নির্বাচনী এলাকায় ভাগ করে। নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলগুলির জন্য প্রতীক বরাদ্দ করে। তফসিল অনুযায়ী ১৫ অক্টোবর মনোনয়ন পত্র দাখিল, ১৭ অক্টোবর বাছাই ও ২৪ অক্টোবর মনোনয়ন প্রত্যাহারের দিন ধার্য্য করা হয়। প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের জন্য ১৯ অক্টোবর মনোনয়ন দাখিল, ২১ অক্টোবর বাছাই, ২৮ অক্টোবর মনোনয়ন প্রত্যাহারের দিন ধার্য্য করা হয়। সারাদেশে নির্বাচনী কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসারদের নিয়োগ করা হয়। নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের আসন সংখ্যা ছিল সাধারণ ৩০০ ও সংরক্ষিত ১৩ এবং প্রাদেশিক পরিষদে আসন সংখ্যা ছিল ৬০০ ও মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ২১টি নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে ৭৮১ জন প্রার্থী ও পশ্চিম পাকিস্তানে ৮০০ জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনের দিন ভোট কেন্দ্রের নিরাপত্তার দায়িত্ব দেয়া হয় আনসার সদস্য ও সেনাবাহিনী সদস্যদের। নির্বাচন কমিশনার পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ভোটারদের সচেতনতার জন্য নির্বাচনী মহড়ার আয়োজন করে। নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পর ভোট গননা ও ফলাফল প্রকাশের পদ্ধতি সম্পর্কে নির্বাচন কমিশন নির্দেশ জারী করে। একই সাথে নির্বাচনের সময় আচরণবিধি কি হবে তার জন্য প্রধান নির্বাচন কমিশনার সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে ছয়টি মূলনীতি বিশিষ্ট আচরণ বিধি প্রণয়ন করে।

অভিসন্দর্ভের পঞ্চম অধ্যায়ে রাজনৈতিক দলগুলির নির্বাচনী ইশতাহার ও প্রচারণা কার্যক্রম আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে ২৪টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। ২৪টি রাজনৈতিক দলকে তিনটি ধারায় ভাগ করা হয়েছে বামপন্থী, মধ্যপন্থী ও ডানপন্থী। এ নির্বাচনে কোনো জাতীয় দল বা জাতীয় নেতা ছিল না। নির্বাচনে দুটি দল রাজনৈতিক ভাবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায়। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ও পশ্চিম পাকিস্তানে পিপলস পার্টি। দুটি রাজনৈতিক দল দু'অঞ্চলের অঞ্চলভিত্তিক দল হিসেবে আর্বিভূত হয়েছে। নির্বাচনে অংশ নেয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনী ইশতাহার ঘোষণা করে। সকল রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নির্বাচনী ইশতাহারের মাধ্যমে ফেডারেল পদ্ধতির সরকার কাঠামো, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, পূর্ববাংলার ন্যায্য অধিকার, পূর্ববাংলায় নৌ সদর দপ্তর স্থাপন, কেন্দ্রীয় ও

Dhaka University Institutional Repository

প্রাদেশিক সরকারের বিষয়সমূহ, পররাষ্ট্রনীতি, শিল্পকারখানায় শ্রমিকদের অধিকার, কৃষকদের দাবিদাওয়ার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের আশা আকাঙ্খার প্রতি লক্ষ্য রেখে নিজেদের নির্বাচনী কার্যক্রম হাতে নেয়। তবে নির্বাচনী লড়াইয়ে শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ ও ভুট্টোর পিপলস পার্টির মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতা লক্ষ্য করা যায়। আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের মতো পশ্চিম পাকিস্তানেও কিছু আসনে প্রার্থী দেয় কিন্তু ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানেই শুধু প্রার্থী দিয়েছে। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রচারণার মূল বিষয় ছিল ছয় দফা, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, দু'অঞ্চলের মধ্যকার বৈষম্য। এক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ সোনার বাংলা শশ্মান কেন এ শিরোনামে একটি নির্বাচনী পোস্টার করে। যা জনগণের মধ্যে ব্যাপক আবেদন সৃষ্টি করে। পিপলস পার্টির ভুট্টো পূর্ব পাকিস্তানে তেমন কোনো জনসমর্থন আদায় করতে পারেননি। সকল রাজনৈতিক দলগুলো যখন দু'অঞ্চলের মধ্যকার বৈষম্যের কথা বলেছেন সেক্ষেত্রে ভুট্টো নীরব ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি বরং উভয় অংশের মেরুকরণকে প্রাধান্য দেন। একই সাথে শেখ মুজিব ও তাঁর ছয় দফার সমালোচনা করেন। আওয়ামী লীগ ও পিপলস পার্টির তুলনায় অন্যান্য দলগুলির প্রচারণা কার্যক্রম ছিল ম্লান। তারা তেমন জনসমর্থন আদায় করতে পরেনি। ইসলামপন্থী দলগুলো নিজেদের মধ্যে জোট গঠন নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যায়। আবার ন্যাপ ভাসানী নির্বাচনে অংশ নেয়া না নেয়া নিয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ন্যাপ ভাসানী নির্বাচনের কয়েক দিন আগে ভোটের আগে ভাত চাই স্লোগান তুলে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ায়। নির্বাচনী প্রচারণার মাধ্যমে প্রত্যেক রাজনৈতিক দল নিজেদের জয় সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী হয়। নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসেবে প্রত্যেকটি দল নির্বাচনী স্লোগান তুলে। এসব স্লোগান, পোস্টার, ফেস্টুন, দেয়ালিকার ভাষার মাধ্যমে জনগণের মনকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। তবে সব দলের স্লোগানের মূল প্রবণতা ছিল আওয়ামী লীগকে ঘায়েল করা। আবার আওয়ামী লীগও অন্যান্য দলকে ঘায়েল করার জন্য পাল্টা স্লোগান দেয়। এ অধ্যায়ে নির্বাচনে অংশ নেয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির অবস্থান, তাদের নির্বাচনী ইশতাহার, প্রচারণা কার্যক্রম, কি কি স্লোগান দিয়েছিল তা তুলে ধরা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল আলোচনা করা হয়েছে। পাকিস্তানের রাজনীতিতে ২৩ বছর পরে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ভোটে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর ও ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে। নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ থেকে সংরক্ষিত আসনসহ আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন পায়। বাকি দুটি আসন পায় স্বতন্ত্র সদস্য পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজা ত্রিদিব রায় ও পিডিপির নুরুল আমীন। আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে একটি আসনও না পাওয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও আঞ্চলিক মর্যাদার বাইরে বের হয়ে আসতে পারে নি। পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ ২৯৮টি আসন পায়। পশ্চিম পাকিস্তানে পিপলস পার্টি ৮৮টি আসন লাভ করে। পশ্চিম পাকিস্তানে ওয়ালী ন্যাপ দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। ধর্মভিত্তিক ডানপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো সব জায়গায় ব্যর্থ হয়। পাকিস্তানের এ সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল ছিল সকলের কাছে অভাবিত। আওয়ামী লীগ প্রধান নিজের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন কিন্তু এত পরিমাণে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হবে তা ভাবতে পারেননি। নির্বাচন কমিশনারের মতে আওয়ামী লীগ ৭৫% ভোট পেয়েছে। আনুমানিক ৬৬% প্রার্থী তাদের জামানত

Dhaka University Institutional Repository

হারিয়েছেন। জামানত সবচেয়ে বেশি বাজেয়াপ্ত হয়েছে মুসলিম লীগ কাইয়ুম পন্থী, কনভেনশন মুসলিম লীগ, প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগের। নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার পর দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। সবার আগে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান দেশের জনগণকে অভিনন্দন জানায় সুষ্ঠুভাবে ভোট প্রদানের জন্য। একই সাথে তিনি আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব ও পিপলস পার্টি প্রধান ভুট্টোকে অভিনন্দন জানান। শেখ মুজিব ও ভুট্টোও পরস্পরকে অভিনন্দন জানান। পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, পাকিস্তান ইসলামিক প্রজাতন্ত্র দল, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, কনভেনশন মুসলিম লীগ, ন্যাপ ভাসানী, ন্যাপ ওয়ালী, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি, অবিভক্ত বাংলা মুসলিম লীগ, পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস, খিলাফতে রব্বানী পার্টি, তাহরিক এ ইশতেকলাল পার্টি, ছাত্র ও সুশীল সমাজ এ নির্বাচনের ফলাফলকে স্বাগত জানিয়ে তাদের বক্তব্য বিবৃতি প্রদান করে। একমাত্র ব্যতিক্রম জামায়াতে ইসলামি। তারা দাবি করে নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে হয়নি। কিন্তু জামায়াতে ইসলামির ছাত্র সংগঠন নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে বলে তাদের মতামত ব্যক্ত করে। দেশ বিদেশে সর্বত্র এ নির্বাচনের রায় নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের পিছনে যে সকল কারণগুলি কাজ করেছে যেমন- শেখ মুজিবের ব্যক্তিগত চরিত্র, সাংগঠনিক দক্ষতা, দলের সুযোগ্য নেতৃত্ব; এককভাবে নির্বাচনে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত, দলের সকল পর্যায়ের নেতাদের দলীয় প্রচারণা কার্যে অংশগ্রহণ, সুসংগঠিত প্রচারণা; শেখ মুজিবের নির্বাচনী আবেদন মূলক পোস্টার যা দু'অঞ্চলের মধ্যকার বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরে; জনকল্যাণমুখী ও ছয় দফা ভিত্তিক ইশতাহার; ভোটারদের ভোট দেয়ার আগ্রহ, উৎসাহ উদ্দীপনা; শেখ মুজিবের নির্বাচনী কৌশল; ভাসানী ন্যাপের নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানো; সর্বোপরি ১২ নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের পর পশ্চিম পাকিস্তানী সরকারের উদাসীনতা যা জনগণ সরাসরি প্রত্যক্ষ করে। এর ফলে পূর্ববাংলার জনগণ তাদের অধিকার আদায়ের জন্য বেছে নেয় ব্যালট বাক্স। শেখ মুজিবের উপর পূর্ববাংলার জনগণ আস্থা স্থাপন করে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে।

অভিসন্দর্ভের সপ্তম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে গণমাধ্যম ও ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন নিয়ে শুরু থেকেই গণমাধ্যমের আগ্রহ ছিল। এদেশে রাষ্ট্রীয় বেতার টেলিভিশন, বিভিন্ন সংবাদপত্র নির্বাচন সংক্রান্ত সংবাদ পরিবেশন করেছে। নির্বাচনের সময় দৈনিক ইত্তেফাক আওয়ামী লীগ সমর্থক, দৈনিক সংবাদ ন্যাপ ভাসানী সমর্থক, দৈনিক সংগ্রাম জামায়াতে ইসলামি সমর্থক, দৈনিক আজাদ মুসলিম লীগ সমর্থক, দৈনিক পাকিস্তান, দৈনিক দি ডন, দৈনিক মর্নিং নিউজ সরকার সমর্থক পত্রিকা হিসেবে নির্বাচন সংক্রান্ত সংবাদ পরিবেশন করেছে। ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা গ্রহণ থেকে শুরু করে তাঁর প্রথম সাংবাদিক সম্মেলন, নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা, পরিবর্তিত নির্বাচনের তারিখ, নির্বাচনী তফসিল, নির্বাচনী প্রচারণা, নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে দৈনিক পত্রিকাগুলি নিয়মিত প্রথম পৃষ্ঠা, শেষ পৃষ্ঠা, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয় আবার কখনো বিশেষ কলাম প্রকাশ করে। সব পত্রিকার কাছে নির্বাচনের ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্ব পায়। একই সাথে রাষ্ট্রীয় বেতার টেলিভিশন প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাচন কমিশনারের ভাষণ প্রচার করে। ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালের নির্বাচনী প্রচারণা কাজের সময় দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য একটি সুযোগ করে দেন। তিনি সকল রাজনৈতিক দলের প্রধানদের রাষ্ট্রীয় বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে তাদের দলীয় ইশতাহার ও কর্মপন্থা জনগণের সামনে তুলে ধরতে

পারে তার ব্যবস্থা করে দেন। যা পত্রিকাগুলিতেও সমানভাবে গুরুত্ব সহকারে পূর্ণাঙ্গ বিবরণ আকারে প্রকাশিত হতো। মোট কথা গণমাধ্যমে নির্বাচনকে কিভাবে দেখেছে, যদিও কোনো গণমাধ্যম কারো পক্ষপাত অবলম্বন করেছে তা সত্ত্বেও ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে গণমাধ্যমের একটি প্রশংসনীয় ভূমিকা রয়েছে যা এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভের উপসংহারে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল পাকিস্তানের রাজনীতিতে কি ধরনের প্রভাব ফেলেছে, পাকিস্তানের ইতিহাসে এ নির্বাচন কেন গুরুত্বপূর্ণ, পরবর্তী সাংবিধানিক সংকট কিভাবে ঘনীভূত হয়েছে, কিভাবে একটি দেশ স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হয়েছে তা আলোচনা করা হয়েছে। সর্বোপরি নতুন একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ অভ্যুদয় কিভাবে হলো, কি প্রেক্ষিতে হলো তা আলোচনা করা হয়েছে।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ও রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনার জন্য দু'ধরনের উৎস ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস ও দ্বৈতীয়িক উৎস। প্রাথমিক উৎস হিসেবে পাকিস্তান গেজেট, নির্বাচন কমিশন রিপোর্ট, দৈনিক পত্রিকা যেমন দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক আজাদ, দৈনিক পূর্বদেশ, দৈনিক পাকিস্তান, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক সংগ্রাম, দৈনিক দি ডন, দৈনিক মর্নিং নিউজ, দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে ১৯৪৭ সালের দেশভাগ থেকে শুরু করে ১৯৭৫ সাল অবধি ঘটনাবলী নিয়ে রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রেক্ষাপট

নির্বাচন ব্যবস্থা : ব্রিটিশ আমল

উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশে জাতীয়তাবাদী চেতনার উদ্ভব হতে থাকে। আস্তে আস্তে ভারতীয় উপমহাদেশের জনগণ শিক্ষিত শ্রেণী হিসেবে আবির্ভূত হয়। তারা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়। ১৮৮৫ সালে ভারতীয় উপমহাদেশে একজন ইংরেজ ভদ্রলোকের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম রাজনৈতিক দল 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস'। শুরুতে জাতীয় কংগ্রেস সর্বভারতীয় দল হিসেবে আবির্ভূত হলেও ধীরে ধীরে এটি সাম্প্রদায়িক রূপ লাভ করে। তখন মুসলমানরা নিজেদের আরো বঞ্চিত মনে করে আলাদা একটি রাজনৈতিক দল গড়ে তোলার চিন্তা করে। কিন্তু ইতিমধ্যে বাংলা ও ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে ঘটে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যা বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫-১৯১১) নামে ইতিহাসে পরিচিত। বাংলার বিভক্তি এবং আসামের সঙ্গে এর একটি অংশ যুক্ত করে নতুন প্রদেশ গঠন করা হয় প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সুবিধার কথা চিন্তা করে। কিন্তু মাত্র ৬ বছরের মধ্যে তা বাতিল করা হয়। বঙ্গভঙ্গ ও এর রদকে কেন্দ্র করে বাংলার প্রধান দুটি ধর্ম সম্প্রদায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এতদিনের গড়ে ওঠা ঐক্যের সম্পর্কে ফাটল সৃষ্টি হয়। যার প্রভাব পড়ে বাংলার রাজনীতিতে। এর ফলে ভারত উপমহাদেশে মুসলিম জাগরণের সূচনা হয়। মুসলিম জাগরণের প্রথম প্রকাশ দেখা যায় ১৯০৬ সালে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী পৃথক রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ গঠন। মুসলিম লীগ বঙ্গভঙ্গকে স্বাগত জানায় এবং এটি টিকিয়ে রাখতে বদ্ধ পরিকর ছিল। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায়ের বড় অংশ জাতীয় কংগ্রেসের সহযোগিতায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। এ পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকার ১৯০৯ সালের মর্লে মিন্টো সংস্কার আইনের মাধ্যমে মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনের দাবীকে স্বীকৃতি দেয়। যা রাজনীতিতে নতুন ধারার সূচনা করে। ১৯১১ সালে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করে হিন্দুদের সন্তুষ্ট করতে পারলেও হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের ঐক্যে যে ফাটল ধরেছে তার সমাধান করতে ব্যর্থ হয়। এ অনৈক্য ছিল দীর্ঘদিন।

বঙ্গভঙ্গ সমসাময়িক সময়ে বাংলার ইতিহাসে শুরু হয় সশস্ত্র আন্দোলন। উনিশ শতকের শেষ দিকে ভারতে যে জাতীয়তাবাদী ধ্যান ধারণার উদ্ভব হয় তা বিকাশ লাভ করে সশস্ত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। বাংলার এ সশস্ত্র আন্দোলন বিপ্লবী আন্দোলন নামে পরিচিত হলেও এর মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলা তথা ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে ব্রিটিশ শক্তিকে উৎখাত করা এবং স্বাধীনতা অর্জন করা। এই আন্দোলনের ব্যাপ্তি ছিল ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত। যদিও এ বিপ্লব শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও এর রদের মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে যে অনৈক্য সৃষ্টি হয় তা আস্তে আস্তে প্রকট হতে থাকে। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি হয়। কিন্তু ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে হিন্দু ও

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমান উভয় সম্প্রদায় ইংরেজদের সহায়তা করে। এ অবস্থায় উভয় সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক দল জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন দেখা যায়। এর ফলে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পথ তৈরি হয়। ১৯১৬ সালের ২৩ এবং ৩০ ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের বাৎসরিক অধিবেশনে উভয় দলের প্রতিনিধি দল উভয় দলের অধিবেশনে যোগ দিয়ে সমঝোতার পরিবেশ সৃষ্টি করেন। উভয় দল ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রশ্নে একটি সমঝোতায় পৌছে যা 'লক্ষ্ণৌ চুক্তি' নামে পরিচিত। এ চুক্তির মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা বৃদ্ধি পায়।

১৯০৯ সালের ভারত শাসন আইন বা মর্লে মিন্টো সংস্কার আইন ভারতীয়দের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। অন্যদিকে ১৯০৫-১১ এ সময়ে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন চলাকালে ভারতের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বরাজ বা স্বশাসনের দাবি প্রবল হয়ে ওঠে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের সহযোগিতা লাভ করে। ভারতীয়রা এর বিনিময়ে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার আশা করে। তাই ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সম্বন্ধে এ দেশীয়দের আশ্বস্ত করার উদ্দেশ্যে ভারত সচিব মন্টেগু ১৯১৭ সালের ২০ আগস্ট কমন্সসভায় এক বিখ্যাত ঘোষণায় বলেন, ব্রিটিশ সরকারের নীতি হল ভারতীয়দেরকে ভারত শাসনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অধিকতর সুযোগ দেয়া এবং ভারতবর্ষে পর্যায়ক্রমে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা। এ লক্ষ্যে ভারত সচিব মন্টেগু এবং ভাইসরয় ও গর্ভনর জেনারেল চেমসফোর্ড এ দু'পক্ষের যৌথ প্রচেষ্টায় ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ১৯১৯ সালে ভারত শাসন আইন পাশ হয়। এ আইনের মধ্য দিয়ে 'দ্বৈতশাসন' নামে শুধু প্রদেশে এক ধরনের দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু তা ছিল আংশিক। এদেশে সংসদীয় পদ্ধতির দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে এটি ছিল সর্বপ্রথম কার্যকর পদক্ষেপ।

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের পরবর্তী সময়কাল ১৯১৯-১৯২৪ সাল বাংলা তথা ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়কালে ভারত উপমহাদেশে প্রথম স্বতঃস্ফূর্ত ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ছিল খিলাফত আন্দোলন। এ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলিম দুটি সম্প্রদায় ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অংশ নেয়। যদিও এ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি তবুও এর মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক সচেতনতা জাগ্রত হয়। খিলাফত আন্দোলনের পাশাপাশি ১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা করেন। এর মাধ্যমে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সহযোগিতা না করার সিদ্ধান্ত নেয়। এ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একদিকে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সৃষ্টি হয় অন্যদিকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন জোরদার হয। মহাত্মা গান্ধী ১৯২২ সালে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলে কংগ্রেসের একদল ত্যাগী ও বিপ্লবী নেতা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সংকটময় মুহূর্তে আন্দোলনের নতুন কর্মসূচিকে সামনে রেখে একটি বিকল্প প্লাটফর্ম হিসেবে 'স্বরাজ দল' গঠন করেন। ১৯২২-২৫ সাল পর্যন্ত এ দলটি ভারতের রাজনীতিতে বেশ কিছু নতুন ধারা চালু করে। কিন্তু কংগ্রেসের বিরোধিতা, ১৯২৫ সালে চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যু, ব্রিটিশ সরকারের কঠোর নীতির কারণে এ দলটি যথার্থ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা তথা ভারতীয় উপমহাদেশের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯২৭-১৯৩৪ সাল বিভিন্ন ঘটনার কারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আছে। প্রথম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো সাইমন কমিশন। ১৯১৯ সাল থেকে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক সংঘাত, স্বরাজ দাবিতে ভারতবাসীর সোচ্চার আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার ১৯২৭ সালের শেষের দিকে সাইমন কমিশন গঠন করে। এ কমিটিতে কোনো ভারতীয় সদস্য না থাকায় প্রথম থেকেই ভারতবাসী এটিকে প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৩০ সালের মে মাসে কমিশন রিপোর্ট প্রকাশ করলেও ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো এই রিপোর্ট বর্জন করে। সাইমন কমিশনের রিপোর্ট ভারতবাসীর আকাঙ্খা পূরণে ব্যর্থ হলে ব্রিটিশ সরকার বিক্ষুব্ধ ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে একটি সর্বসম্মত সংবিধান প্রণয়ন করে ব্রিটিশ সংসদে বিবেচনার জন্য পেশ করতে আহবান জানান। সে লক্ষ্যে ভারতের জন্য পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার ব্যবস্থার ভিত্তিতে এর ভবিষ্যৎ সংবিধানের নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিশন গঠন করা হয়। যা নেহেরু রিপোর্ট নামে পরিচিত। ৩ মাস কাজ করার পর ১৯২৮ সালের আগস্ট মাসে নেহেরু রিপোর্ট পেশ করেন। নেহেরু রিপোর্ট মুসলমানদের দাবি উপেক্ষা করলে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯২৯ সালে তাঁর চৌদ্দ দফা দাবি উত্থাপন করেন। এর প্রধান দাবিগুলি ছিল ভারতীয় উপমহাদেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন, কেন্দ্রীয় আইন সভায় মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে পৃথক নির্বাচন এবং পাঞ্জাব, বাংলা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অক্ষুন্ন রাখা ইত্যাদি। কংগ্রেস নেহেরু রিপোর্টের (১৯২৮) মাধ্যমে ও মুসলিম লীগ চৌদ্দ দফা দাবির (১৯২৯) মাধ্যমে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায় পৃথক পৃথক ভাবে স্বায়ত্তশাসন ও সম্প্রদায়গত স্বার্থ আদায়ের চেষ্টা করে। যদিও কোনো দাবিই পূরণ হয়নি। এ কারণে ১৯২৯ সালে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে কয়েকটি দাবি সম্বলিত অসহযোগের ডাক দেয়া হয়। দাবিগুলো হল প্রথমত- কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের কংগ্রেস সদস্যদের পদত্যাগ; দ্বিতীয়ত- ভারতের জন্য স্বাধীনতার প্রস্তাব; তৃতীয়ত- আইন অমান্য প্রস্তাব গৃহীত হয়। মহাত্মা গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ভারতের শাসনতান্ত্রিক আলাপ আলোচনার জন্য ইংল্যান্ডে ১৯৩০-৩১ এবং ১৯৩২ সালে পরপর তিনটি গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩০ সালের প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেস যোগ দেয়নি। মুসলিম লীগের সদস্যরা এ বৈঠকে যোগদান করলেও কংগ্রেসবিহীন এ বৈঠকে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয় বৈঠকে মহাত্মা গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন সাময়িকভাবে বন্ধ রেখে যোগদান করেন। কিন্তু ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমান প্রতিনিধিদের মধ্যে কোনো আপস না হওয়ায় দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকও ব্যর্থ হয়। সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড ১৯৩২ সালের ১৬ আগস্ট সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ঘোষণা করেন। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান কোনো সম্প্রদায়কে এটি সন্তুষ্ট করতে পারেনি। যদিও শেষ পর্যন্ত ১৯৩০ সালে মুসলিম লীগ এ বাটোয়ারা মেনে নেয়। ১৯৩২ সালের তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে আগের চেয়ে অনেক কম প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। প্রতিনিধি দলের অনেক দাবি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। সাইমন কমিশনের সুপারিশ এবং গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনার ভিত্তিতে ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৩ সালে ভারতের শাসন সংস্কারের জন্য একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করে। এর পর ব্রিটিশ যৌথ পার্লামেন্টারি কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটি ১৯৩৪ সালের ২২ নভেম্বর

একটি রিপোর্ট পেশ করে। এর সুপারিশের ভিত্তিতে ভারত শাসন বিল প্রণীত হয়। এ বিল পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে পাস হয়ে ১৯৩৫ সালের ২৩ আগস্ট কার্যকর হয়।

এ অধ্যায়ে সামগ্রিকভাবে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রেক্ষাপট হিসেবে যেসব বিষয় কাজ করেছে অর্থাৎ পূর্ববর্তী নির্বাচনগুলি ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রেক্ষাপট হিসেবে কি ভূমিকা পালন করেছে তা আলোচনা করা হয়েছে।

প্রেক্ষাপট

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রেক্ষাপট হিসেবে যে সকল বিষয় কাজ করেছে তথা পূর্বের নির্বাচনগুলি বিশেষত ১৯৩৭ সালের নির্বাচন, ১৯৪৬ সালের নির্বাচন, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন এবং আইয়ুব দশকে মৌলিক গণতন্ত্রের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনসমূহ আলোচনা করা হবে।

ক. ১৯৩৭ সালের নির্বাচন

বঙ্গভঙ্গের পর মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তার, চাকরি, ব্যবসা বাণিজ্যে অংশগ্রহণের ফলে পূর্ববাংলায় একটি শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এই শ্রেণীর অধিকাংশ ছিলেন কৃষক পরিবারের সন্তান। দ্রুত বিকাশমান ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন পর্যায়ে সংস্কারের মাধ্যমে ভোটাধিকার সম্প্রসারণ করলে বাংলার রাজনীতি ক্রমশ এই নতুন মুসলিম মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি ও পেশাজীবি শ্রেণীর হাতে চলে আসতে থাকে। ১৯০৫ সালের ভারত শাসন আইনে সর্বপ্রথম সীমিত আকারে ভারতীয় প্রদেশগুলোতে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন, ভোটাধিকার সম্প্রসারণের কারণে বাংলার মুসলমান নেতাদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। বাংলায় মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় মুসলিম নেতৃবৃন্দ নির্বাচনের মাধ্যমে এ প্রদেশে রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপনের সুযোগ দেখতে পান। এ সময় দেশের অধিকাংশ বঞ্চিত কৃষকদের নেতৃত্ব দানে এগিয়ে আসেন এ কে ফজলুল হক। পূর্ববাংলায় মুসলিম লীগের জন্ম হলেও সাংবিধানিক দুর্বলতার কারণে কৃষক প্রজা সমিতি এখানে সক্রিয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে ওঠে।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩৭ সালের জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসে। এই নির্বাচন বিভিন্ন কারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আছে, বিশেষ করে প্রাদেশিক পরিষদের ক্ষমতা বৃদ্ধি, আইন পরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি, সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ তাদের ৩০ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাসে এ প্রথম এককভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের বিভিন্ন প্রাদেশিক শাখাগুলো যখন প্রায় মৃতপ্রায় তখন মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় বোর্ড পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠন করে কেন্দ্র ও প্রদেশের আসন পুনরুজ্জীবিত করে। এই কেন্দ্রীয় বোর্ডের নেতৃত্বে ছিলেন মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং তিনি দলের মৃতপ্রায় অবস্থা পুনরুদ্ধারে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন।[১] অপরদিকে বাংলায় তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের একটি ছোট অংশের অস্তিত্ব ছিল। জিন্নাহর নিরলস চেষ্টার ফলে এই গ্রুপটি সর্বভারতীয়

[১] Harun-or-Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh*, Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 1987, p.57

মুসলিম লীগের সাথে যুক্ত হয়ে নতুন ভাবে যাত্রা শুরু করে। কিন্তু নির্বাচনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সরাসরি অংশগ্রহণ না করে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টিকে সমর্থন দেয়।[২]

বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে অংশ নেয়া তিনটি রাজনৈতিক দল ছিল বৃহৎ। যথা বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস, মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড এবং কৃষক প্রজা পার্টি। মুসলমান আসনগুলোতে মূল লড়াই করেছে কৃষক প্রজা পার্টি, মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড এবং স্বতন্ত্র সদস্যরা। ত্রিপুরা কৃষক সমিতি অসীম উদ্দিনের নেতৃত্বে কিছু আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।[৩]

ক.১. নির্বাচনী ইশতেহার

মুসলিম লীগ

১৯৩৩ সালের জুন মাসে মুসলিম লীগের সংসদীয় বোর্ড ১৪ দফা কর্মসূচি সম্বলিত নির্বাচনী ইশতাহার ঘোষণা করে। এর মধ্যে ছিল[৪]–মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা, সকল দমনমূলক আইন বাতিল, জাতীয় স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর সকল ধারা বাতিল, প্রশাসনের ব্যয় সংকোচন, ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে জাতীয়করণ ও সেনাবাহিনীর খরচ কমানো, শিল্প কারখানা বিশেষ করে ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতির জন্য উৎসাহ দান, মুদ্রা ও বিনিময় ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ, গ্রামীণ দরিদ্র জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক এবং শিক্ষার উন্নতি বিধান, কৃষি ঋণ মওকুফ করা, প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা, উর্দু ভাষা সংরক্ষণ ও উন্নতি বিধান, মুসলমান জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি সাধন, করভার লাঘব করা, সমগ্র দেশে রাজনৈতিক সচেতনতা ও জনমত বৃদ্ধি।

কৃষক প্রজা পার্টি

কৃষক প্রজা পার্টি ঢাকায় তাদের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনে ১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে নির্বাচনে অংশ নেয়ার ঘোষণা দেয় এবং নির্বাচনী কর্মসূচি গ্রহণ করে। কৃষক প্রজা পার্টির এ কে ফজলুল হক তাঁর বক্তৃতায় বলেন, The KPP decided to participate in the Assembly elections believing that so long as full control over the administration of the country was not in the grip of the prajas … the complete amelioration of the condition of the masses would be a mere dream.[৫]

একই সাথে কৃষক প্রজা পার্টি ১৪ দফা কর্মসুচি গ্রহণ করে।[৬] যথা- ক্ষতিপূরণ ছাড়া জমিদারি প্রথা বিলোপ, প্রজাস্বত্ব আইন প্রবর্তন. খাজনা ও ঋণ মওকুফ, নজর ও সেলামি এবং আবওয়াব বাতিল, মহাজনী আইন বাতিল, ঋণ সালিশি বোর্ড গঠন এবং বার্ষিক সর্বোচ্চ ৪% হারে কৃষকদের ঋণ প্রদান, পাট চাষে সরকারি নিয়ন্ত্রণ এবং পাটের সর্বনিম্ন দাম নির্ধারণ, কৃষকদের জন্য সুদ মুক্ত ঋণ চালু, প্রতি থানায় হাসপাতাল স্থাপন, পূর্ববাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন, বাধ্যতামূলক

[২] Harun, *ibid*, p.57
[৩] *ibid*, p.58
[৪] *ibid*, p.58
[৫] *ibid*, p. 60
[৬] *ibid*, p. 60

অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা চালু, শাসন ব্যয় হ্রাস, মন্ত্রীদের বেতন ১০০০ টাকায় নির্ধারণ, সকল নিষ্পেষণমূলক আইন বাতিল ও রাজবন্দিদের মুক্তি। ১৪ দফা ছাড়াও কৃষক প্রজা পার্টি নির্বাচনের পূর্ব মুহূর্তে সকলের জন্য ডাল ভাতের ব্যবস্থা, লাঙ্গল যার জমি তার, ঘাম যার দাম তার স্লোগান ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

জাতীয় কংগ্রেস

জাতীয় কংগ্রেস ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে নির্বাচনে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। নির্বাচনের পূর্ব মুহূর্তে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস ৯ দফা দাবি সম্বলিত নির্বাচনী ইশতাহার ঘোষণা করে।[৭] যথা- প্রজাস্বত্ব আইন ও ক্ষুদ্র কৃষকদের উপর সুদের ভার লাঘব, কৃষকদের উপর চাপিয়ে দেওয়া ঋণের বোঝা লাঘব, খাজনা রাজস্ব ও করের ভার লাঘব, জমির উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষকদের জন্য ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ, ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতি এবং সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনা সৃষ্টি, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শিক্ষা বৃদ্ধি, জাতীয় ভিত্তিতে শিল্প ও ব্যবসা ভিত্তিক উদ্যোগ সৃষ্টি, সুষ্ঠু পানি ও সেচ ব্যবস্থা, পয়ঃনিস্কাশন ও সহজ যাতায়াত ব্যবস্থার সৃষ্টি।

ক. ২. নির্বাচনী তহবিল

মুসলিম লীগের নির্বাচনী তহবিলের মূল উৎস ছিল জমিদার ও ব্যবসায়ীরা। ১৯৩৬ সালের মে মাসে মুসলিম লীগের তহবিলে ৫ জন জমিদার, একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য চাঁদা দেয় ২৭,৫০০ টাকা।[৮] ১৯৩৬ সালের ২৬ আগষ্ট জিন্নাহ দলের সদস্যদের দলের তহবিলে নির্বাচনের জন্য ৫০,০০০ টকা চাঁদা দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করেন।[৯] কলকাতার খিলাফত কমিটি মুসলিম লীগের তহবিলে টাকা প্রদান করে। তথাপি, মুসলিম লীগের সদস্যরা সকলে ছিলেন আর্থিকভাবে স্বচ্ছল।[১০] অপরদিকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে মুসলিম লীগের সাথে কৃষক প্রজা পার্টির কোনো মিল ছিল না। এ দলের কোনো কেন্দ্রীয় তহবিল ছিল না। তা সত্ত্বেও কৃষক প্রজা পার্টি কিছু জমিদার ও ধনী ব্যক্তির সাহায্য পেয়েছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রার্থীরা নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে নির্বাচনী ব্যয় মিটাতো। কিন্তু মুসলিম লীগ সংবাদপত্রে প্রকাশ করে যে কৃষক প্রজা পার্টি কংগ্রেস ও হিন্দুদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে মুসলমানদের ঐক্য নষ্ট করছে।[১১]

ক.৩. নির্বাচনী প্রচার

১৯৩৭ সালের নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা কার্যত মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টির মধ্যে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়েছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রজা পার্টির নেতাগণ কৃষক ও জনসাধারণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতেন এবং এদের সাথে তাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। তাদের প্রধান নেতা ফজলুল হকের বিপুল জনপ্রিয়তা কৃষক প্রজা পার্টির মুলধন স্বরূপ ছিল। অন্যদিকে মুসলিম লীগ ছিল জমিদার ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অভিজাত শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান। জনসাধারণের সাথে

---

[৭] *ibid*, pp. 62-63
[৮] *ibid*, p. 69
[৯] *ibid*, p. 69
[১০] *ibid*, pp. 69-70
[১১] *ibid*, pp.70

Dhaka University Institutional Repository

তাদের বিশেষ যোগাযোগ ছিল না এবং মাওলানা আকরাম খাঁ ব্যতীত অন্য কোনো লীগ নেতা গ্রামের কোনো জনসভায় বাংলায় বক্তৃতা করতে পারতেন না। জিন্নাহ তখনও কলকাতা ব্যতীত বাংলার অন্যান্য স্থানে ভালভাবে পরিচিত হননি। তিনি যখন ঢাকায় আসেন তখন তাকে অভ্যর্থনার জন্য রেলস্টেশনে খুব কম লোক উপস্থিত ছিল এবং তাঁর বক্তৃতা শুনতেও সভায় তেমন লোক সমাগম হত না। নির্বাচনের পূর্ব মুহূর্তে আকরাম খাঁ *দৈনিক আজাদ* পত্রিকা বের করেন। মুসলিম লীগের নির্বাচনী প্রচার কার্যে *দৈনিক আজাদ* বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে।[১২] এছাড়া *স্টার অব ইন্ডিয়া* পত্রিকাও মুসলিম লীগের প্রচারে ভূমিকা রাখে। এছাড়া এক ডজন উর্দু সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাও লীগের প্রচারে ভূমিকা রাখে।[১৩]

অপরদিকে কৃষক প্রজা পার্টির নিজস্ব কোনো পত্রিকা ছিল না। একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল '*চাষী*' নামে। যেটি পূর্ববাংলার ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত হত। তাই কিছু কিছু হিন্দু পত্রিকা মাঝে মাঝে কৃষক প্রজা পার্টির পক্ষে সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য প্রচার করত। সাম্প্রদায়িক অবস্থান থেকে মুসলিম লীগের স্লোগান ছিল মুসলিম ঐক্য অনেক বেশি শক্তিশালী। মুসলিম লীগের বিখ্যাত নেতা খাজা নাজিমউদ্দিন (গভর্নর এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য) মুসলিম লীগকে সমর্থন দিতে সরকারি প্রশাসন যন্ত্রকে ব্যবহার করেন।[১৪]

নির্বাচনী প্রচার কৌশলে কৃষক প্রজা পার্টির কিছু সুবিধা ছিল। প্রথমত- বাংলায় ফজলুল হক অত্যন্ত জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। তাঁর মত এত জনপ্রিয় আর কেউ ছিল না। তাঁর নেতৃত্বের একটি বড় গুণ ছিল স্থানীয় ভাষায় কথা বলা। তাই তাকে লোকে হক সাহেব বলে সম্বোধন করতো। তাঁর এই ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা কৃষক প্রজা পার্টির জন্য ছিল সম্পদ। দ্বিতীয়ত- কৃষক প্রজা পার্টির বেশিরভাগ নেতা ছিলেন জনগণের সাথে সম্পৃক্ত। তারা স্থানীয় ভাষায় কথা বলত। স্থানীয় লোকেরা নেতাদের তাদের বাড়িতে আশ্রয় দিত এবং অবাধে মেলামেশা করতো। সর্বশেষ ফজলুল হক গরিব প্রজাদের ডাল ভাতের নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন। এছাড়া কৃষক প্রজা পার্টি বিভিন্ন স্থানে জনসমাবেশ করে এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার কার্য চালিয়েছে।[১৫]

মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর মতে প্রজা পার্টির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপের প্রতিশ্রুতি ভাওতা মাত্র। কৃষক প্রজা পার্টি করারোপ ছাড়া সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার কথা বললেও মুসলিম লীগের মতে করারোপ ছাড়া অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রর্বতন সম্ভব নয়। কৃষক প্রজা পার্টি ও কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করলেও মুসলিম লীগ একে স্বাগত জানায়। বিশেষ করে কৃষক প্রজা পার্টির সঙ্গে সমঝোতা ব্যর্থ হলে মুসলমান ভোটারদের আকৃষ্ট করতে বাংলা মুসলিম লীগের পার্লামেন্টারি বোর্ড ইসলাম রক্ষা ও মুসলিম ঐক্যের আহবান জানায়। ধর্মের পক্ষে প্রচারাভিযান জোরদার করার জন্য মুসলিম লীগ জমিয়তে উলামার সমর্থন লাভ করে। এর সভাপতি মওলানা আবু বকর সিদ্দিকীর একটি ফতোয়া ব্যাপক প্রচার করা হয়। এতে তিনি মুসলমানদের নির্দেশ দেন বাংলার মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ডের অধীনে একতাবদ্ধ হতে। যেটি প্রকৃত মুসলিম পার্টি এবং প্রকৃত মুসলিম প্রজা পার্টিও। মুসলমানদের তিনি আরও সতর্ক করে দেন তারা যেন কৃষক প্রজা পার্টি থেকে দুরে

---

[১২] মুহম্মদ আবদুর রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭)*, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০০২, পৃ. ১৯৯; আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা, খোশরোজ কিতাবমহল, পুনঃমুদ্রণ ২০০৬, পৃ. ১১২

[১৩] Harun, *ibid*, p.73

[১৪] *ibid*, pp. 73-74

[১৫] *ibid*, p.74

থাকেন যেটি কংগ্রেসের অনুগত। স্বয়ং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যিনি নিজে কখনো সাম্প্রদায়িক এবং এতটা ধার্মিক মুসলমান ছিলেন না তিনিসহ তাঁর আধুনিক ও উদারপন্থী সহকর্মীরা ইসলামের নামে নির্বাচনী লড়াইয়ে নেমে যান। সোহরাওয়ার্দী কৃষক প্রজা পার্টিকে 'মহারাজ মহাজন দল' এবং কংগ্রেস ও হিন্দুদের মহাসভার দোসর বলে অভিহিত করেন। নির্বাচনী প্রচারণায় মুসলিম লীগকে একমাত্র ইসলামি দল হিসেবে প্রচার করা হয়। স্বয়ং মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ এ প্রচারাভিযানে শামিল হন। মুসলিম লীগের নেতাদের সকলে প্রচার চালান মুসলিম লীগকে ভোট দেয়া মানে ইসলামকে ভোট দেয়া। মুসলিম লীগকে ভারতের মুসলিম স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী দল হিসেবে ঘোষণা দেয়। যদিও মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক আন্দোলন কোনো ফল বয়ে আনেনি। অন্যদিকে হিন্দু মহাসভার উগ্র সাম্প্রদায়িকতাও হিন্দু সম্প্রদায়কে আলোড়িত করেনি। হিন্দু সংরক্ষিত আসনে কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষ আবেদনের কারণে তারা সাফল্য লাভ করে।

ক. ৪. নির্বাচনের ফলাফল

নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় যে, ২৫০টি[১৬] মোট আসনের মধ্যে কংগ্রেস ৫২, স্বতন্ত্র (হিন্দু) ৩৯, হিন্দু জাতীয়তাবাদী ৩, হিন্দু মহাসভা ২, স্বতন্ত্র (মুসলিম) ৪৩, লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড ৯, কৃষক প্রজা পার্টি ৩৬, ত্রিপুরা কৃষক সমিতি ৫, ইউরোপীয়ান দল ২৫, এ্যাংলো ইন্ডিয়ান ৪ এবং ভারতীয় খ্রিষ্টান ২টি আসন লাভ করে।[১৭] পাঞ্জাব সিন্ধু সীমান্ত প্রদেশে মুসলিম লীগের চরম ভরাডুবি হয়। বর্ণ হিন্দুদের অধিকাংশ ভোট কংগ্রেস পায়। যদিও তফসিলি বর্ণের সংরক্ষিত আসনে কংগ্রেস ৩০টি আসনের মধ্যে ৭টি লাভ করে। গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের চেয়ে কৃষক প্রজা দল নির্বাচনে ভাল ফল করে। আবুল মনসুর আহমদের ভাষায় বলা যায়-

> ১৯৩৭ সালের এই নির্বাচন মুসলিম বাংলার ইতিহাসে এক স্মরনীয় ঘটনা। যুদ্ধটা দৃশ্যত: কৃষক প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগ এই দুইটি দলের পার্লামেন্টারি সংগ্রাম হইলেও ইহার পরিণাম ছিল সুদূর প্রসারী। আমরা কর্মীরা এই নির্বাচনের রাজনৈতিক গুরুত্ব পুরোপুরি এখনও উপলব্ধি পারি নাই সত্য কিন্তু সাধারণভাবে কৃষক প্রজাগণের এবং বিশেষ ভাবে মুসলিম জনসাধারণের অর্থনৈতিক কল্যাণ অকল্যাণের দিক হইতে এ নির্বাচন ছিল জীবন মরণ প্রশ্ন। এটা আমরা তীব্রভাবেই অনুভব করিতাম। ঐক্যবদ্ধভাবে কঠোর পরিশ্রমও করিয়াছিলাম সকলে।[১৮]

খ. ১৯৪৬ সালের নির্বাচন

১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পরে ৯ বছরের ব্যবধানে ভারতের সাধারণ ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ৫ বছর পর পর নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে তখন নির্বাচন হয়নি। ১৯৪৬ সালের নির্বাচন ছিল মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস উভয় দলের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এ নির্বাচনে দুটি

[১৬] Shila Sen, *Muslim Politics in Bengal 1937-1947*, New Delhi, India, p 69
[১৭] Harun, *ibid*, p.79
[১৮] আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৭

প্রধান দল মুসলিম লীগের উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান দাবির যৌক্তিকতা প্রমাণ এবং অন্যদিকে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার যথার্থতা প্রমাণ করা।[১৯]

খ.১. নির্বাচনী তফসিল

১৯৪৫ সালের ৮ মার্চ খাজা নাজিমউদ্দিন মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। বাংলার গভর্নর কে সি ব্যারোজ বিরোধীদলকে সরকার গঠনের সুযোগ না দিয়ে ৯৩(ক) ধারায় প্রদেশে গভর্নরের শাসন জারি করেন। তখন থেকেই কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ১৯৪৫ সালের ২১ আগস্ট ভারতের ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল ঘোষণা করেন আগামী শীতকালে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।[২০] অর্থাৎ ১৯৪৫ সালের ১০ ও ২২ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় পরিষদের এবং ১৯৪৬ সালের ১৯ থেকে ২২ মার্চ প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।[২১] কিন্তু নির্বাচন সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ছিল না। মোট জনসংখ্যার মাত্র প্রায় ১৪% ভোটাধিকার পেয়েছিল। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল ১০২ জন এবং মুসলিম আসন সংখ্যা ছিল ৩০টি। অন্যদিকে বঙ্গীয় মন্ত্রিসভার ২৫০টি আসনের মধ্যে মুসলিম আসন ছিল ১১৯টি।[২২]

খ.২. রাজনৈতিক দল ও তাদের নির্বাচনী ইশতাহার

১৯৪৬ সালের বঙ্গীয় আইন পরিষদের নির্বাচনে মোট ১৫টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে।[২৩] রাজনৈতিক দলগুলো হল মুসলিম লীগ, কৃষক প্রজা পার্টি, জামাতে ওলামায় হিন্দ, মুসলিম পার্লামেন্টারি বোর্ড, ইমারত পার্টি, ন্যাশনালিস্ট মুসলিম, কংগ্রেস, র‍্যাডিকেল ডেমোক্রেটিক পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি, তফসিলি ফেডারেশন, হিন্দু মহাসভা, ক্ষত্রিয় সমিতি, ইউরোপিয়ান, এ্যাংলো ইন্ডিয়ান এবং ভারতীয় খ্রিষ্টান। যদিও ১৫টি রাজনৈতিক দল অংশ নেয় কিন্তু নির্বাচন মূলত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নির্বাচনে পরিণত হয়।

মুসলিম লীগ

মুসলিম লীগের নির্বাচনী ইশতাহারের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবি। মুসলিম লীগ প্রধানত দুটি বিষয় তুলে ধরে। যথা- ১. ভারতের মুসলমানেরা একটি জাতি এবং ২. ভারতবর্ষের সমস্যার একমাত্র সমাধান হল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সেক্রেটারি আবুল হাশিম নির্বাচন উপলক্ষ্যে মুসলিম লীগের দলীয় ইশতাহার প্রস্তুত করে ঘোষণা করেন যে, মুসলমান ভোটার ও কর্মীদের আসন্ন নির্বাচনে একমাত্র লক্ষ্য হবে পাকিস্তান এবং এই পাকিস্তানের উদ্দেশ্য হল নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি লাভ। তাঁর মতে, পাকিস্তান সৃষ্টির মাধ্যমেই

[১৯] এস এম রেজাউল করিম রেজা, "১৯৪৬ সালের নির্বাচন: পূর্ববাংলার প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি", *বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, ঢাকা, সংখ্যা ২৭-২৮, ১৪০৯-১৪১১

[২০] *প্রাগুক্ত*

[২১] *প্রাগুক্ত*

[২২] রেজাউল করিম, *প্রাগুক্ত*, Harun, *ibid*, p. 207

[২৩] রেজাউল করিম, *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

কেবল পূর্ববাংলার মুসলমানেরা তাদের জীবন ও ধর্মীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে।[২৪] এছাড়া মুসলিম লীগ ইশতাহারে জমিদারি প্রথা বাতিল, কৃষি সংস্কার, খাদ্য সংকট দূর, পাটের নায্য বাজার দর নির্ধারণ, প্রধান শিল্প জাতীয়করণ, কুটির শিল্পের বিকাশ, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু, মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়।[২৫]

কংগ্রেস

কংগ্রেসের নির্বাচনী ইশতাহারের মূল উপজীব্য বিষয় ছিল অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠা। তাদের নির্বাচনে দুটি বিষয় প্রাধান্য দেওয়া হয়। যথা- ১. কংগ্রেস সর্বভারতীয়দের প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও ২. ভারত এক ও অখণ্ড রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকবে।[২৬] কংগ্রেস হাই কমান্ড ১৯৪৫ সালের ২৬ অক্টোবর ১২ দফা নির্বাচনী ইশতাহার ঘোষণা করে। এই ১২ দফা নির্বাচনী ইশতাহারের মধ্যে প্রধান প্রধান বিষয়গুলি ছিল নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের ভিত্তিতে রাষ্ট্র সংবিধান প্রণয়ন, একটি ফেডারেল সংবিধান প্রস্তুত এবং প্রতিটি প্রদেশকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান, নিজেদের জীবন ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ক্ষমতা প্রদান, ভাষা ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে পুনঃবিন্যস্ত করা, রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকদের দারিদ্রতা দূর করে উন্নততর জীবনযাপনের নিশ্চয়তা প্রদান, উৎপাদন ও বন্টনের নীতির ভিত্তিতে কৃষি ও শিল্পের আধুনিকায়ন এবং সর্বক্ষেত্রে স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হবে।[২৭]

কৃষক প্রজা পার্টি

১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস ব্যতীত কৃষক প্রজা পার্টি ঘোষণা করে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলুপ্ত করাই হল কৃষক প্রজা পার্টির নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার মূল উদ্দেশ্য। ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি সীমিত পরিসবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত ১১৯টি আসনের মধ্যে কৃষক প্রজা পার্টি কয়েকটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। তাই তাদের নির্বাচনী ইশতাহারের বক্তব্য ছিল দুর্বল। এ কারণে অনেকে মনে করেন নির্বাচনে ফজলুল হক ও তার কৃষক প্রজা পার্টি পরোক্ষভাবে মুসলিম লীগ ও তাদের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবির প্রতি সমর্থন জানায়।[২৮] এ প্রসঙ্গে ড. হারূন অর রশিদ বলেন, It was true that Huq was not an ememy of the Muslim League in the sense that he did not utter a single word against the League's Pakistan scheme during the election campaign.[২৯]

খ. ৩. নির্বাচনী প্রচার কৌশল

১৯৪৬ সালের নির্বাচনে ১৫টি দল অংশগ্রহণ করলেও মূলত মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের প্রচার কৌশল ছিল চোখে পড়ার মতো। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার শুরু থেকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের পার্লামেন্টারি বোর্ডের সেক্রেটারী আবুল

---

[২৪] *প্রাগুক্ত*; Mohammad Siraj Mannan, *The Muslim Political Parties in Bengal 1936-1947,* Dhaka, Islamic Foundation of Bangladesh, 1987, p. 43

[২৫] Shila Sen, *ibid,* p. 184

[২৬] রেজাউল করিম, *প্রাগুক্ত*

[২৭] Harun, *ibid,* p. 208; রেজাউল করিম, *প্রাগুক্ত*

[২৮] রেজাউল করিম, *প্রাগুক্ত*

[২৯] Harun, *ibid,* p.212

হাশিম পাকিস্তানের পক্ষে ভোট সংগ্রহের জন্য সমগ্র বাংলা চষে বেড়ান।[৩০] মুসলিম লীগ নির্বাচনী প্রচারণার সুবিধার্থে বাংলার ৩০টি জেলায় এবং ১১৯টি মুসলিম আসনের প্রতিটিতে একটি করে নির্বাচনী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে। মুসলিম লীগের নেতারা আঞ্চলিক নেতা, ডাক্তার, প্রধান শিক্ষক, স্কুল ও মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতি, সম্পাদক, ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি, সদস্য এবং মসজিদের ইমামদের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে প্রচারণা চালাতে উৎসাহিত করেন। এছাড়াও মুসলিম লীগের পক্ষে বাংলার ছাত্র সমাজ নির্বাচনী প্রচারণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। All Bengal Muslim Students League এর নেতৃত্বে প্রায় ২০ হাজার ছাত্র নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণ করে।[৩১] কিন্তু নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বাংলার নির্বাচনী প্রচারে অংশগ্রহণ করেননি।[৩২] তিনি একবার ট্রেনযোগে কলকাতা থেকে সিলেট পর্যন্ত পূর্ববাংলায় ঘুরে গেলেন কিন্তু পথে কোনো জনসভায় তিনি বক্তৃতা করেননি, অথচ রেলপথের দুই পাশে লক্ষ লক্ষ লোক তাঁর বক্তৃতা শোনার আশায় বসে ছিল।[৩৩] জিন্নাহ নির্বাচনী প্রচারকার্যে অংশগ্রহণ না করলেও তাঁর বোন ফাতেমা জিন্নাহ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচারকার্যে অংশ নেন।[৩৪] একথা বললে ভুল হবে না যে, ১৯৪৬ সালের বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচনে মুসলিম লীগের প্রচারণার মূল স্লোগান ছিল- লাঙ্গল যার জমি তার, বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদ চাই, কায়েমী স্বার্থের ধ্বংস চাই, শ্রমিক যে মালিক সে, জনগণের পাকিস্তান কৃষক শ্রমিকের পাকিস্তান ইত্যাদি।[৩৫]

অপরদিকে কংগ্রেস তার নির্বাচনী প্রচার কৌশলে মুসলিম লীগকে ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে স্বীকার করতে রাজি হয়নি। কংগ্রেস দাবি করে যে, মুসলিম লীগ নয় বরং তারাই ধর্ম নির্বিশেষে সবার প্রতিনিধিত্ব করে এবং জনসাধারণের অবিভক্ত ভারত চায়। নির্বাচনে কংগ্রেসের অখণ্ড ভারতের নীতির সমর্থন করে নিখিল ভারত উলামায়ে ই হিন্দ। কংগ্রেসের সভাপতি মাওলানা আজাদসহ অনেক মুসলমান নেতাকে মুসলিম লীগের বিপক্ষে প্রার্থী করেছিল। এছাড়া মুসলিম লীগের বিপক্ষে স্বতন্ত্র বা অন্য দলের প্রার্থীর পক্ষে কংগ্রেস প্রচারণা চালায়।[৩৬] কংগ্রেস তার নির্বাচনী প্রচারণায় মুসলিম লীগের পাকিস্তান সৃষ্টি এবং মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করার নীতির সমালোচনা করে বলে-

> "Jinnah in the blackest huse and characterized the Pakstan demand as 'Vivisection of Mother India', 'reactionary primitivism' and 'religious barbarism'. It accused him Muslim League of

[৩০] মুহাম্মদ ইনাম-উল হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন ১৭০৭-১৯৪৭*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫, পৃ. ২৪০
[৩১] Harun, *ibid*, p. 226
[৩২] রেজাউল করিম, *প্রাগুক্ত*
[৩৩] কামরুদ্দীন আহমদ, *পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০২, পৃ. ৬৯
[৩৪] রেজাউল করিম, *প্রাগুক্ত*
[৩৫] আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯২
[৩৬] রেজাউল করিম, *প্রাগুক্ত*

being an ultra-conservative clique of knights and Khan Bahadurs, capitalists and landlords, traders and Government prisoners".[৩৭]

খ.৪. নির্বাচনের ফলাফল

১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস বিপুলভাবে জয় লাভ করে। বঙ্গীয় আইন পরিষদের ২৫০টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ ১১৪টি আসন পায়। কংগ্রেস ৮৬টি আসন পায়। কৃষক প্রজা পার্টি মাত্র ৪টি আসন পায়।[৩৮] মুসলিম লীগ প্রদেশগুলোর মোট ৪৮২টি আসনের মধ্যে ৪২৩টি আসনে জয়ী হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে মুসলিম লীগ মোট ভোটের ৮৩.৪% ভোট পায়। কৃষক প্রজা পার্টির ৬৫.১% প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। মুসলিম লীগ একমাত্র বাংলায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

গ. ১৯৫৪ সালের নির্বাচন

১৯৫৪ সালের নির্বাচন ছিল পূর্ববাংলায় প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে প্রধান দুটি দল ছিল মুসলিম লীগ ও যুক্তফ্রন্ট।[৩৯]

১৯৫১ সালে পূর্ববাংলার আইন পরিষদের নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত তা স্থগিত থাকে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রথম কয়েক বছরেই (১৯৪৭-১৯৫৪) জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর, বিশেষভাবে পাকিস্তান মুসলিম লীগের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান ভিত্তিক উপদলসমুহের মধ্যকার ভাষা ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক স্বাধিকারের প্রশ্নে অব্যাহত মতানৈক্য ও দ্বন্দ্ব আওয়ামী মুসলিম লীগ ও কৃষক শ্রমিক পার্টির মতো আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের জন্ম দেয়।[৪০] বাঙালিদের উপর পশ্চিম পাকিস্তানীদের রাজনৈতিক আধিপত্য ও সাংস্কৃতিক নিপীড়ন পাকিস্তানের পূর্বাংশে ব্যাপক অসন্তোষের সৃষ্টি করে। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকেই পাকিস্তান সংবিধান পরিষদে বেগম শায়েস্তা ইকরামুল্লাহ অভিযোগ করেন যে, পূর্ববাংলার প্রতি চরম অবহেলা প্রদর্শন করা হচ্ছে এবং একে পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।[৪১] ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে প্রথম নির্বাচনে জনৈক শামসুল হকের নিকট সর্বশক্তিমান মুসলিম লীগের প্রার্থী খুররম খান পন্নী পরাজিত হয়। এই নির্বাচন মুখ্যমন্ত্রীর নিজের জেলাতেই অনুষ্ঠিত হয়। এই পরাজয়ে নূরুল আমীন ও সরকার এত আত্মবিশ্বাসহীন আর ভীত হয়ে পড়ল যে, এরপর থেকে তাদের আর কোথাও উপনির্বাচন অনুষ্ঠান করতে সাহস হলো না। উপনির্বাচন না হওয়ার কারণে ৩৪টি আসন শূন্য থেকে যায়। সাধারণ নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল ১৯৫১ সালে কিন্তু

---

[৩৭] রেজাউল করিম, প্রাগুক্ত; I. H. Qureshi, *The Struggle for Pakistan*, Karachi, 1965, p. 241

[৩৮] Harun, *ibid*, p. 230

[৩৯] আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন ও এস.এম.রেজাউল করিম, "১৯৫৪ সালের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ইশতাহার ও পূর্ববাংলায় এর প্রতিক্রিয়া", *সমাজ নিরীক্ষণ*, ঢাকা, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, সংখ্যা-৮৭, মে-আগস্ট ২০০৩

[৪০] কামালউদ্দিন আহমেদ, চুয়ান্ন সালের নির্বাচনঃ স্বায়ত্তশাসন প্রসঙ্গ, সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯৩, পৃ. ৪৬৭-৪৬৮; মো: শফিকুর রহমান, *জাতীয় রাজনীতি: শেরে বাংলা থেকে বঙ্গবন্ধু*, ঢাকা, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ১৯৯১, পৃ. ৬১

[৪১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬৮

Dhaka University Institutional Repository

দেশভাগ পরবর্তীকালে আইনের মারপ্যাচের মাধ্যমে তা ১৯৫২ সাল পর্যন্ত পিছিয়ে দেয়া হয় এবং ১৯৫২ সালে নূরুল আমীন গণপরিষদের সহায়তায় ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত সাধারণ নির্বাচন পুনরায় মুলতবি রাখেন।[৪২]

গ.১. নির্বাচনী তফসিল

১৯৫৪ সালের প্রথমে ফেব্রুয়ারি এবং পরে ৮-১২ মার্চ নির্বাচনের তফসিল ঘোষিত হয়। পাকিস্তান গণপরিষদে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের নির্বাচন সংক্রান্ত বিধি সংশোধন করে ১৯৫২ সালে পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, (ক) নির্বাচন হবে ২১ বছর বয়স্ক সকল নাগরিকের প্রত্যক্ষ ভোটে, (খ) অমুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণ করে পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা অনুসরণ করা হবে এবং পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের আসন সংখ্যা হবে সর্বমোট ৩০৯টি। এর মধ্যে মুসলমান ২৩৭টি (৯টি সংরক্ষিত মহিলা আসন সহ), তফসিলি জাতি হিন্দু ৩৮টি (২টি সংরক্ষিত আসন), সাধারণ বর্ণ হিন্দু ৩১টি (১টি সংরক্ষিত আসন), বৌদ্ধ ২টি এবং খ্রিষ্টান ৩টি।[৪৩]

গ. ২. নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলসমূহ

১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচনে মোট ১৬টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে।[৪৪] এ নির্বাচন ছিল মূলত মুসলিম লীগ এবং মুসলিম লীগ বিরোধী নির্বাচন। মুসলিম লীগ বিরোধী দলে ছিল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম, গণতন্ত্রী দল, যুবলীগ, খেলাফতে রব্বানী পার্টি ও কমিউনিস্ট পার্টি। মুসলিম লীগকে পরাজিত করার লক্ষ্যে মুসলমান আসনগুলির জন্য পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি এবং নেজামে ইসলাম একত্রিত হয়ে নূন্যতম কর্মসূচির ভিত্তিতে নির্বাচনী মোর্চা যুক্তফ্রন্ট গঠন করে।[৪৫] মওদুদ আহমদ এর ভাষায়-

> শেষাবদি সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, ১৯৫৪ সালের গোড়ার দিকে পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভেতরে ও বাইরে অবস্থানরত বামপন্থীদের উদ্যোগে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সমন্বয়ে একটি বৃহত্তর নির্বাচনী জোট গঠনের মধ্য দিয়ে জনগণের ঐক্যধর্মী মনোভাব পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে। প্রস্তাবিত এই জোট গঠনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো ইতিমধ্যে জাতীয়তাবাদী শক্তি কর্তৃক বাঙালি বিরোধি হিসেবে চিহ্নিত মুসলিম লীগকে সমূলে ধ্বংস করা। আওয়ামী লীগের সমর্থকদের মাধ্যমে সংগঠিত কমিউনিস্ট কর্মী এবং যুবদলের নেতৃত্বে ১৯৫৩ সালে গঠিত প্রকাশ্য রাজনৈতিক দল 'গণতন্ত্রী দল' ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে এই নির্বাচনী জোট গঠন করার লক্ষ্যে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির ওপর অপরিমেয় চাপ সৃষ্টি করে। এভাবে বাংলার তিনজন প্রাজ্ঞ রাজনৈতিক নেতা এ কে ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট নামে সংগঠিত এই নির্বাচনী জোট তাদের নির্বাচনী ইশতাহার হিসেবে সুবিখ্যাত ২১ দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে।[৪৬]

---

[৪২] Najma Chowdhury, *The Legislative Process in Bangladesh: Politics and Functioning of the East Bengal Legislature 1947-58*, Dacca, University of Dacca, 1980, pp. 85-88; কামরুদ্দীন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২

[৪৩] মো: মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১*, ঢাকা, সময় প্রকাশন, ১৯৯৯, পৃ. ১০৫

[৪৪] Keith Callard, *Pakistan–A Political Study*, London, George Allen & Unwin Ltd, 1958, p. 58

[৪৫] আবুল কাশেম সম্পাদনা ও সংকলন, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও আওয়ামী লীগ ঐতিহাসিক দলিল*, ঢাকা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০১, পৃ. ৬২-৬৫; এম. আর আখতার মুকুল, *ভাসানী মুজিবের রাজনীতি*, ঢাকা, সাগর পাবলিশার্স, ১৯৮৯, পৃ. ৯০; সমাজ নিরীক্ষণ, *প্রাগুক্ত*

[৪৬] মওদুদ আহমদ, *বাংলাদেশ: স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা*, ঢাকা, ইউপিএল, ১৯৯২, পৃ. ২৬-২৭

Dhaka University Institutional Repository

যুক্তফ্রন্ট গঠন করার পর ৫ ডিসেম্বর *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায় নিম্নোক্তভাবে এই সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছিল[৪৭]-

আওয়ামী লীগ ও কৃষক শ্রমিক পার্টি 'যুক্তফ্রন্ট গঠন' মওলানা ভাসানী ও ফজলুল হকের যুক্ত বিবৃতি–

> 'আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে মোছলেম লীগকে পরাজিত করিবার জন্য এবং বর্তমান সরকারের স্থলে জনসাধারণের সত্যিকার প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের জন্য মোছলেম লীগের বিরোধী প্রধান দুইটি রাজনৈতিক দল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মোছলেম লীগ ও পাকিস্তান কৃষক শ্রমিক পার্টি নূন্যতম কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে।'

গ. ৩. নির্বাচনী ইশতাহার

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ১৬টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করলেও মুসলিম লীগ ও যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতাহার ছিল উল্লেখ করার মতো। দুই দলই ভোটারদের মন আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি মূলক নির্বাচনী ইশতাহার ঘোষণা করে।

মুসলিম লীগ

মুসলিম লীগ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনী ইশতাহারে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার, পূর্ববাংলায় নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের ও প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাধ্যতামূলক করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। নির্বাচনী ইশতাহারে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে কোরআন শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা, পাকিস্তানী আদর্শ মোতাবেক মৌলিক অধিকার দেওয়ার, মসজিদকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় শিক্ষা দান, কোরআন সুন্নাহ ভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন এবং ইসলামি সমাজ গঠনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। এছাড়াও ইশতাহারে ব্যক্তি স্বাধীনতা, মোহাজের, সংখ্যালঘু, বেকার, জনস্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প ও পাট সমস্যার সমাধানেরও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।[৪৮] মুসলিম লীগের এই নির্বাচনী ইশতাহার ছিল অস্পষ্ট এবং গোঁজামিল প্রকৃতির। তাছাড়া মুসলিম লীগ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতায় গেলে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির যে বাস্তবায়ন হবে তারও কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। কেননা মুসলিম লীগের এই নির্বাচনী ইশতাহার প্রণয়নে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের অনুমতি ছিল না। এটা ছিল প্রাদেশিক মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দান। তাই এ নির্বাচনী ইশতাহার নিয়ে প্রাদেশিক ও গোত্রীয় মুসলিম লীগ দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে।

যুক্তফ্রন্ট

আওয়ামী মুসলিম লীগের নির্বাচনী কর্মসূচির ৪২ দফার প্রধান প্রধান দাবি নিয়ে যুক্তফ্রন্ট ২১ দফা ভিত্তিক নির্বাচনী ইশতাহার ঘোষণা করে। নির্বাচনের পূর্বে বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সমাজের সর্বস্তরের ভোটারদের আকৃষ্ট করতে সক্ষম যুক্তফ্রন্ট ২১ দফা সম্বলিত একটি নির্বাচনী কর্মসূচি গ্রহণ করে। মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমান যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার রূপরেখা প্রদান করেছিলেন এবং আবুল মনসুর আহমদ এর খসড়া তৈরি করেছিলেন। এ ব্যাপারে আবুল মনসুরকে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছিলেন এ্যাডভোকেট কামরুদ্দীন আহমদ। অবশ্য

[৪৭] মুকুল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০
[৪৮] সমাজ নিরীক্ষণ, *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

হক ভাসানীর বৈঠকে সোহরাওয়ার্দী এর চূড়ান্তকরণ করেন।[৪৯] যুক্তফ্রন্টের এই ২১ দফা ইশতাহার প্রণয়ন সম্পর্কে আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন–

> শেষ পর্যন্ত কাউন্সিল কৃষক শ্রমিক পার্টির সাথে যুক্তফ্রন্ট গঠন করার অনুমতি দেন। অতঃপর হক সাহেব ও ভাসানী সাহেব যুক্ত বিবৃতিতে যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতাহার রচনার ভার আমার ওপর পড়ে। আমি ইতিপূর্বেই আওয়ামী লীগের ৪২ দফার একটি নির্বাচনী ইশতাহার রচনা করিয়াছিলাম। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য শহীদ মিনার নির্মাণ, ২১শে ফেব্রুয়ারিকে সরকারী ছুটির দিন ঘোষণা এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন বর্ধমান হাউসকে বাংলা ভাষার সেবা কেন্দ্র করার তিনটি দফা আওয়ামী লীগের ৪২ দফায় ছিল। কাজেই ২১ ফিগারটিকে চিরস্মরনীয় করিবার অতিরিক্ত উপায় হিসাবে যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচিকে ২১ দফা কর্মসূচি করিলে কেমন হয়? অতঃপর আমার কাজ সহজ হইয়া গেল। ইতিহাস বিখ্যাত ২১ দফা রচনা হইয়া গেল।[৫০]

যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচিতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ছাড়াও অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বিষয় এবং মুদ্রা রেখে অন্যান্য বিষয় পূর্বাঞ্চলের হাতে ছেড়ে দেয়ার অঙ্গীকার করা হয়। এছাড়া বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দান, রাজবন্দিদের মুক্তি, নূরুল আমীনের সরকারি বাসভবন বর্ধমান হাউসকে 'বাংলা একাডেমি'তে রূপান্তর, ১৯৫২ সালের শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শহীদ মিনার নির্মাণ, ২১ ফেব্রুয়ারিকে সরকারি ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা, ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে আধা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার নিয়মানুযায়ী শিল্প শ্রমিকদের জন্য আর্থিক ও সামাজিক অধিকারের স্বীকৃতি, পাট শিল্প জাতীয়করণ ও উৎপাদিত পণ্যের নায্য মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সমবায় ও ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য সরকারি সাহায্য প্রদান ইত্যাদি।

গ. ৪. নির্বাচনী প্রচার কৌশল

যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারণা ১৯৫৩ সালের নভেম্বরে গৃহীত ২১ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতেই পরিচালিত হয়। ২১ দফা কর্মসূচিকে 'ভার্নাকুলার এলিট'[৫১] বা বাঙালি এলিট শ্রেণীর কর্মসূচি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তবুও বলা হয় যে, যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচির মধ্যে বৈপ্লবিক কোনো কিছু ছিল না। কোনো কোনো দফায় অর্থনৈতিক বিষয়বস্তুর চেয়ে ভাবাবেগ ছিল বেশি।[৫২] তাসত্ত্বেও ২১ দফায় অর্ন্তভুক্ত বিষয়গুলি পূর্ববাংলার জনগণের জন্য খুবই প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয়। যুক্তফ্রন্ট তাদের নির্বাচনী প্রচারণার মাধ্যমে জনগণকে বুঝাতে সক্ষম হয় যে, মুসলিম লীগ 'গণবিরোধী', দুর্নীতিপরায়ণ এবং এর শাসন পাকিস্তানকে ধ্বংসের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। অন্যদিকে মুসলিম লীগ জনগণের কাছে তাদের পক্ষে তেমন কোনো জোরালো আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি। তাদের মূল স্লোগান ছিল দু'টি– ইসলাম বিপন্ন পাকিস্তান বিপন্ন। তাদের প্রচারণায় পূর্ববাংলার মৌলিক সমস্যা ও প্রয়োজন উপেক্ষিত হওয়ায় ভোটারদের মন আকৃষ্ট করতে পারেনি।

---

[৪৯] মুকুল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪

[৫০] আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫২

[৫১] Rounaq Jahan, *Pakistan: Failure in National Integration*, Columbia, CUP, 1977, p. 47

[৫২] Abu Jafar Shamsuddin, *Sociology of Bengal Politics*, Dacca, 1973, p.33; কামালউদ্দিন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭১

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম লীগের প্রচারণার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) বলেন,

> "পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহৎ পুজিঁপতিরা প্রকাশ্যে ক্ষমতাসীন দলকে অর্থ যোগাইতে লাগিলেন। ইস্পাহানী ছিলেন লীগের কোষাধ্যক্ষ এবং মূলতঃ তারই প্রভাবে মিস ফাতেমা জিন্নাহকে লীগের অনুকূলে প্রচারকার্য চালাইবার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে আনা হইল। . . . প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী পাকিস্তানের হোমড়া চোমড়া নেতৃবৃন্দ সমভিব্যাহারে স্পেশাল ট্রেন আর চার্টার্ড স্টীমারে নির্বাচনী অভিযান শুরু করিলেন। দেশের সংবাদপত্রগুলিও প্রায় একচেটিয়া ভাবে মুসলিম লীগকে সমর্থন দিতে লাগিল।[৫৩]

মুসলিম লীগের নির্বাচনী প্রচারণা সম্পর্কে এম.আর.আখতার মুকুল বলেন,

> পাকিস্তান মুসলিম লীগ সাধারণ নির্বাচনে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলো। এক শ্রেণীর মাওলানা ও পীর সাহেব তো অবিরতভাবে যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করে সরলমনা ভোটারদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছিলো। উপরন্তু পশ্চিম পাকিস্তান থেকে একের পর এক হোমড়া চোমড়া অবাঙালী নেতারা এসে মুসলিম লীগ প্রার্থীদের পক্ষে নির্বাচনী অভিযানে শামিল হয়েছিলেন।. . . দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া তার বিখ্যাত কলাম 'রাজনৈতিক মঞ্চে' এসব নেতার নামকরণ করেছিলেন 'হাওয়াই নেতা'। সীমান্তের মুসলিম লীগ নেতা কাইয়ূম খান সম্পর্কে তার মন্তব্য ছিল- 'আগায় খান পাছায় খান, খান আবদুল কাইয়ূম খান' তখনকার দিনে মুখে মুখে প্রচারিত হয়েছিল।[৫৪]

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে কিছু পত্রিকা মুসলিম লীগের পৃষ্ঠপোষকতা করে বিভিন্ন সংবাদ প্রকাশ করতে থাকে। এদের মধ্যে ছিল ডন (করাচি), মর্নিং নিউজ (ঢাকা) এবং দৈনিক আজাদ (ঢাকা)। এসব পত্রিকায় পূর্ববাংলার জনগণকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয় যে, মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ভোট দেয়ার অর্থ হলো পাকিস্তানের শত্রুদের সহায়তা করা। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে সচেতন পূর্ববাংলার জনগণকে এভাবে বিভ্রান্ত করা সম্ভব হয়নি। পূর্ববাংলার জনগণ চেয়েছিল, যুক্তফ্রন্ট যথেষ্ট শক্তি নিয়ে নির্বাচনে জয় লাভ করুক, কেননা তাহলেই তাদের দাবিসমূহ পূরণ করা সম্ভব।[৫৫] মুসলিম লীগ ছিল মূলতঃ পশ্চিম পাকিস্তান ভিত্তিক এবং শিল্পপতি, ভূ-স্বামী, ব্যবসায়ী ও মুষ্টিমেয় শিক্ষিত জনগোষ্ঠীই ছিল এর সমর্থক। অন্যদিকে যুক্তফ্রন্টের সমর্থনে ছিল পূর্ববাংলার সাধারণ জনগণ, ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক এবং বিকাশমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এছাড়া যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্ব মুসলিম লীগের তুলনায় শক্তিশালী ছিল। পশ্চিম পাকিস্তান ভিত্তিক পত্রপত্রিকায় যুক্তফ্রন্টের নেতাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের কুৎসা রটনা করা হয় যে, "যুক্তফ্রন্টের পক্ষে নির্বাচনের ফলাফলকে প্রভাবিত করার জন্য প্রচুর ভারতীয় অর্থ পূর্ববাংলায় ছড়ানো হয়েছে।[৫৬] যুক্তফ্রন্টের প্রচারণা সম্পর্কে এম. রাশিদুজ্জামান মন্তব্য করেছেন- যুক্তফ্রন্টের নেতাদের কৌশল ছিল মুসলিম লীগ সরকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যর্থতা, বিশেষ করে ভাষা প্রশ্নের উপর অধিকতর জোর দেয়া। এটা ছিল জনগণের কাছে স্পর্শকাতর বিষয় এবং এর মাধ্যমে জনসমর্থন অর্জন করা সহজতর ছিল। অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু ছিল পাটের নিম্নমূল্য। পাটের এই নিম্নমূল্য পূর্ব বাংলার পাটচাষীদের মধ্যে ব্যাপক হতাশার সৃষ্টি করে।[৫৭]

---

[৫৩] তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, *পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর*, ঢাকা, বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল লি, ১৯৮১, পৃ. ৪৮-৪৯; কামালউদ্দিন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭১

[৫৪] মুকুল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪

[৫৫] কামালউদ্দিন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭২

[৫৬] কামালউদ্দিন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭২

[৫৭] M. Rashiduzzaman, "The Awami League in the Political Development of Pakistan", *Asian Survey*, X-7, 1970, p. 577; কামালউদ্দিন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭৩

Dhaka University Institutional Repository

যুক্তফ্রন্টের জন্য এর বিভিন্ন শরিক দলের কর্মীরা ব্যাপক নির্বাচনী প্রচারণায় অবতীর্ণ হয়। যুক্তফ্রন্টের প্রচারাভিযান ছিল অধিকতর আক্রমণাত্মক ও স্বতঃস্ফূর্ত। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা যুক্তফ্রন্টের পক্ষে জনসমর্থন আদায়ের জন্য শহর থেকে সুদূর লোকালয়ে গিয়েও কাজ করতে থাকে। এমনকি ছাত্ররা ঘরে ঘরে গিয়ে যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচি প্রচার করার চেষ্টা করে। পূর্ববাংলার খ্যাতিমান রাজনৈতিক নেতারা, যেমন মওলানা ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমদ, শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ জেলা ও মহকুমা পর্যায়ে বহু জনসভায় বক্তৃতা দেন এবং পূর্ববাংলার জন্য পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দানের দাবির পক্ষে বাঙালি জনমত সৃষ্টি করেন।[৫৮] তবে ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে ময়মনসিংহের নান্দাইলে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এই তিন নেতার ঐতিহাসিক জনসভা। নান্দাইল ছিল তৎকালীন প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনের এলাকা। তাই যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ এ মর্মে কৌশল গ্রহণ করলেন যে, জনাব নূরুল আমীনকে তাঁর নিজস্ব এলাকায় ব্যস্ত রাখার লক্ষ্যে এ ধরনের একটা জনসভা অপরিহার্য। এই কৌশল খুব কার্যকরী হয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন তরুণ ছাত্রলীগ কর্মী খালেক নেওয়াজ খানের নিকট পরাজিত হয়েছিলেন।[৫৯]

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে কতগুলি জনপ্রিয় স্লোগান ছিল- 'লীগ শাসনের দুর্গতি দু'আনার ম্যাচবাতি', 'লীগের পোলা বিলাত যায় মোগো পোলা মোষ খেদাই', শাসনবিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক কর। একই সাথে মুসলিম লীগ প্রচার করতে থাকে 'নৌকায় ভোট দিলে বিবি তালাক হয়ে যাবে', হক ভাসানী হিন্দুস্থানের দালাল।[৬০]

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের পক্ষে নির্বাচনী জোয়ার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আবদুল হক বলেন–

> নির্বাচন উপলক্ষে যে গণচেতনা লক্ষ্য করা গেলো তা অভূতপূর্ব। যেখানেই যাই, সেখানেই বসি, সেখানেই দেখি, প্রায় সকলেই লীগের সমালোচনায় মুখর। অন্তত ঢাকায় লীগের সমর্থক চোখে পড়ে না বললেই চলে। . . . রাষ্ট্রীয় ও সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের আকাঙ্খা এবং লীগ বিরোধীতাই তাদেরকে যুক্তফ্রন্টের সমর্থক করে তুলেছে। এক হিসেবে যুক্তফ্রন্ট তাদেরই সৃষ্টি, নেতাদের নয়। . . . ইসলাম ও পাকিস্তান বিপন্ন বুলি শুনে তারা ভুলতে চায় না। তাদের যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবি, যে ভাষা ও সংস্কৃতির দাবি, তা তারা ছাড়ছে না। এটা ক্রমেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, পূর্ববাংলার অধিবাসীরা এখনো রাজনীতিতে ধর্মের কথা শুনতে চায় না। তাদের মধ্যে এখন ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আদর্শেরই বেশি প্রসার হচ্ছে এবং দ্রুত প্রসার হচ্ছে।[৬১]

গ. ৫. নির্বাচনের ফলাফল

ভারত বিভাগের ৬ বছর ৫ মাস ২৭ দিন পর পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে ১৯৫৪ সালের ১১ মার্চ পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদের

---

[৫৮] Talukder Moniruzzaman, *Radical Politics and the Emergence of Bangladesh*, Dacca, 1975, p.23; কামালউদ্দিন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭৩-৪৭৪

[৫৯] মুকুল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩

[৬০] আবু সাঈদ খান, *শ্লোগানে শ্লোগানে রাজনীতি*, ঢাকা, অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০৮, পৃ. ২২

[৬১] আবদুল হক, *লেখকের রোজনামচা চার দশকের রাজনীতি*, নুরুল হুদা সম্পাদিত, ঢাকা, ইউপিএল, ১৯৯৩, পৃ. ৫-৬

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।[৬২] ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম আসনে ৩৭.৬০% ভোট পড়ে।[৬৩] তখনকার যোগাযোগ ব্যবস্থার দুরবস্থা, মহিলাদের ভোট কেন্দ্রে আসতে অনীহা[৬৪] প্রভৃতি কারণে ভোটদানের হার কম ছিল। নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা শুরু হয় ১৯৫৪ সালের ১৫ মার্চ থেকে এবং সরকারিভাবে ফলাফল ঘোষিত হয় ২ এপ্রিল।[৬৫] ফলাফল ঘোষণার পর দেখা যায় যে, পূর্ববাংলার প্রথম অবাধ ও সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট এক অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। যুক্তফ্রন্ট আইন পরিষদের মোট ৩০৯টি আসনের মধ্যে এককভাবে ২২৩টি আসন লাভ করে। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ মাত্র ৯টি আসন লাভ করে। দেশ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত যে মুসলিম লীগ পূর্ববাংলায় খুবই জনপ্রিয় ছিল, সে মুসলিম লীগের জন্য এই নির্বাচনের ফলাফল ছিল একটি চরম আঘাত। এমনকি ইসলামের দোহাই এবং পৃথক নির্বাচনের ওয়াদাও মুসলিম লীগকে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ব্যাপক ভরাডুবি থেকে রক্ষা করতে পারেনি।[৬৬] সরকারি প্রশাসন যন্ত্রকে অবাধে নিজেদের পক্ষে ব্যবহার করেও মুসলিম লীগ পূর্ববাংলার গণরায়কে পরিবর্তন করতে পারেনি। যুক্তফ্রন্টের এই বিপুল বিজয় মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ও পশ্চিম পাকিস্তানি কায়েমী স্বার্থবাদীদের মোহমুক্তিই শুধু ঘটায় নি, তাদের ভীত সন্ত্রস্থও করে তোলে।[৬৭] মুসলমান আসনের স্বতন্ত্র সদস্যদের ৮ জন যুক্তফ্রন্টে যোগ দেন। ফলে যুক্তফ্রন্টের সদস্য সংখ্যা ২২৩ এ উন্নীত হয়।[৬৮] চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত একজন স্বতন্ত্র সদস্য মুসলিম লীগে যোগদান করলে ঐ দলের সদস্য সংখ্যা ১০ হয়।[৬৯] মুসলমান আসনের জেলাভিত্তিক ফলাফলে দেখা যায় যে, ৮টি জেলায় যুক্তফ্রন্ট একচেটিয়াভাবে সবগুলি আসন লাভ করে। মুসলিম লীগ শুধুমাত্র রংপুর, যশোর, সিলেট ও ত্রিপুরা জেলায় আসন পায়। খেলাফতে রব্বানী পার্টি সিলেটে ১টি মাত্র আসন পায়।[৭০] ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলমান মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৯টি আসনে ৩৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। এই আসনগুলোতে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীরা বিজয়ী হন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ববাংলার রাজনীতিতে জাতীয় এলিট গোষ্ঠীর আধিপত্য নিঃশেষিত হয়ে যায়। পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতি তখনো ভূ-স্বামী গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। কিন্তু পূর্ববাংলায় জমিদারদের স্থলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত এলিট গোষ্ঠীর যেমন- আইনজীবী, সাংবাদিক, শিক্ষক ও ব্যবসায়ীদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়।[৭১] নির্বাচিতদের মধ্যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যই ছিলেন নতুন। বয়সে অপেক্ষাকৃত তরুণ এবং এদের অনেকেরই পূর্ব রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ছিল না। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচিত ২২৩ জন সদস্যের মধ্যে ১৩০ জন ছিলেন আওয়ামী লীগের।[৭২]

---

[৬২] মুকুল, *প্রাগুক্ত* পৃ. ১০৫

[৬৩] কামালউদ্দিন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭৫

[৬৪] মহিলা আসনে নির্বাচনে মহিলা ভোটারের উপস্থিতির হার ছিল নিম্নরূপ- মুসলমান মহিলা- ৩৭.৪৮%, তফসিলি মহিলা ৩৫.৬২%, সাধারণ আসনে মুসলমান মহিলা ৬.০৬%, সাধারণ হিন্দু মহিলা ২১.৭৩%, তফসিলি হিন্দু মহিলা ১২.৬৪%, বৌদ্ধ মহিলা ১০.৯৭%

[৬৫] মাহবুবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৪

[৬৬] কামালউদ্দিন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭৪

[৬৭] A. K. Choudhury, *The Independence of East Bengal*, Dhaka, A.K. Choudhury,1984, p. 14

[৬৮] মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৫

[৬৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৫

[৭০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৫

[৭১] কামালউদ্দিন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭৫-৪৭৬

[৭২] কামালউদ্দিন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭৬

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. পাকিস্তানে সামরিক শাসন ও সামরিক শাসনের অধীনে নির্বাচন

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী হলে এ কে ফজলুল হক পার্লামেন্টারি বোর্ডের নেতা নির্বাচিত হন এবং সে মোতাবেক ফজলুল হক ১৯৫৪ সালের ৩ এপ্রিল চার সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কিন্তু মন্ত্রিসভা নিয়ে যুক্তফ্রন্ট শরিকদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। এছাড়া তিনি এসময় কলকাতা সফরে গিয়ে যেসব বক্তব্য দেন তা কারো কাছে ভাল লাগে নি। উল্লেখ্য কেন্দ্রীয় সরকার শুরু থেকেই চেয়েছিলেন যুক্তফ্রন্টের শরিকদের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করতে এবং এর জন্য তারা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। তখন কেন্দ্রীয় সরকার অভিযোগ উত্থাপন করে যে ফজলুল হক ভারতের কাছে বাংলাকে বিক্রি করে দিতে চান।[৭৩] এসময় কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্তে পূর্ববাংলার শিল্পকারখানায় বাঙালি অবাঙালি দাঙ্গা[৭৪] বাঁধিয়ে দিয়ে অভিযোগ উত্থাপন করে যে যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ।[৭৫] মূলত যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী সাফল্য মুসলিম লীগ ও কেন্দ্রীয় সরকার ভালভাবে নেয়নি। তারা যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করার জন্য বিভিন্ন উপায় খুঁজতে থাকে। তাই তারা শুরু থেকেই যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে বিশেষ করে ফজলুল হকের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ উত্থাপন করতে থাকে। অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৪ সালের ২৯ মে পূর্ববাংলার ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা বাতিল করে প্রদেশে গভর্নরের শাসন জারি করে। যা ১৯৫৫ সালের ২ জুন পর্যন্ত বহাল থাকে। ইতিমধ্যে ১৭ মে মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জাকে পূর্ববাংলার গভর্নর নিয়োগ করা হয়।[৭৬] গভর্নরের শাসনের শুরু থেকেই তিনি ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেন। যুক্তফ্রন্টের ৬৫৯ জন কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। ফজলুল হককে গৃহবন্দি করে রাখা হয়। পূর্ববাংলায় কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করা হয়। সন্দেহজনক সকল বামপন্থী নেতা ও কর্মীকে বন্দি করার পর কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ববাংলায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা সরকার গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ফজলুল হককে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী করে পাকিস্তানের সংহতি রক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয়। ইতিমধ্যে যুক্তফ্রন্টের ভাঙ্গন দেখা দেয়।[৭৭] যুক্তফ্রন্টের শরিকদলগুলো দুই ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। আওয়ামী লীগের ধারাটি ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি গ্রহণ করে, অন্যদিকে ফজলুল হকের জোট রক্ষণশীল ধারার রাজনীতি গ্রহণ করে মুসলিম লীগের নিকট নিজেদের গ্রহণযোগ্য করে তোলে।[৭৮]

১৯৫৪ সালের মার্চ মাস থেকে ১৯৫৮ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত সময়ে সাতটি মন্ত্রিসভা ও তিনবার গভর্নরের শাসন চালু হয়। ১৯৫৮ সালের বাজেটের ব্যাপারে চারটি মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। কিন্তু আগস্ট পর্যন্ত বাজেট পাস সম্ভব হয় না। অবশেষে সেপ্টেম্বর মাসে পার্লামেন্টের সদস্যদের আঘাতে আহত হয়ে ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী ইন্তেকাল করেন, যা

[৭৩] মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩০
[৭৪] দাঙ্গায় আদমজী জুট মিলে ৩৮৬টি লাশ পড়ে।
[৭৫] মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩০
[৭৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩০
[৭৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩১
[৭৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩২

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ববাংলা জাতীয় পরিষদের ইতিহাসে একটি কলংকজনক অধ্যায়। এরপর ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করা হলে পূর্ববাংলা তথা পাকিস্তানে সংসদীয় সরকার পদ্ধতির অবসান ঘটে।

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা সামরিক বাহিনীর সহায়তায় মালিক ফিরোজ খানের সংসদীয় সরকারকে উৎখাত করে পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করেন।[৭৯] একই সাথে তিনি পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল মুহম্মদ আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করেন। তিনি ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিল, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার সমূহকে বরখাস্ত করেন, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সমূহকে ভেঙ্গে দেয়া হয়, রাজনৈতিক দলসসূহ বিলুপ্ত করা হয়, মৌলিক অধিকার সমুহ কেড়ে নেয়া হয়। ২৭ অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট মীর্জাকে উৎখাত করে দেশত্যাগে বাধ্য করেন। ২৮ অক্টোবর আইয়ুব খান এক সরকারি আদেশ জারির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর পদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন এবং নিজে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করা হয়।

আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করে নিজের ক্ষমতা বৈধ করার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি এসব পদক্ষেপ গ্রহণ করার মাধ্যমে জনগণকে বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, তিনি শুধু দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেননি বরং একই সাথে তিনি দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনেন এবং বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে দেশকে উন্নত ও শক্তিশালী করেছেন। তিনি প্রথমেই দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত করে পাকিস্তানের প্রায় ১৫০ জন সাবেক মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি এবং ৬০০ জন সাবেক জাতীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্যদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ আনা হয়। একই অভিযোগে আইয়ুব খান কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসের অনেক সদস্যকেও চাকুরি থেকে বরখাস্ত করেন। একই সাথে তিনি সকল প্রকার চোরাকারবারি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। সামরিক আইন যে সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য জারি করা হয়েছে তা প্রমাণের উদ্দেশ্যে তিনি নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য নির্ধারণ করে দেন, পাকিস্তানের ভূমি সংস্কার করেন, মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ জারি করেন।

আইয়ুব খান ১৯৫৯ সালে 'মৌলিক গণতন্ত্র' ব্যবস্থা নামে দেশে এক নতুন ধরনের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করেন। 'মৌলিক গণতন্ত্র' বলতে ১৯৫৯ সালের মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ বলে সৃষ্ট চারস্তর বিশিষ্ট স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাকে বুঝায়। মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল "জনগণের ইচ্ছাকে সরকারের কাছাকাছি এবং সরকারি কর্মকর্তাদেরকে জনগণের কাছাকাছি এনে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ" এর ব্যবস্থা করা। নিচের দিক থেকে এই স্তরগুলি ছিল- ১. ইউনিয়ন কাউন্সিল (গ্রাম এলাকায়) এবং টাউন ও ইউনিয়ন কমিটি (শহর এলাকায়), ২. থানা কাউন্সিল (পূর্ব পাকিস্তানে এবং তহশিল কাউন্সিল পশ্চিম পাকিস্তানে), ৩. জেলা কাউন্সিল এবং ৪. বিভাগীয় কাউন্সিল।[৮০]

---

[৭৯] হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২, পৃ. ৬২৩-৬২৫

[৮০] সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা, বাংলাদেশ এলিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯৩, পৃ. ৪৮৯-৪৯০

Dhaka University Institutional Repository

মৌলিক গণতন্ত্রের আওতায় নির্বাচন

আইয়ুব খান ক্ষমতা গ্রহণ করে মৌলিক গণতন্ত্র নামে নতুন একটি শাসন পদ্ধতি চালু করেন। এই পদ্ধতির আওতায় তিনটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনগুলি হচ্ছে–

১. ১৯৬০ সালের হ্যাঁ/না ভোট:

১৯৬০ সালের ১১ জানুয়ারি সারাদেশে 'মৌলিক গণতন্ত্রী' নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনে জনসাধারণ সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যগণকে অর্থাৎ তথাকথিত মৌলিক গণতন্ত্রীগণকে (Basic Democrats বা B.D Member) নির্বাচিত করেন। উক্ত নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের ৪০,০০০ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ৪০,০০০ মোট ৮০,০০০ মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচিত হন।[৮১] মৌলিক গণতন্ত্রীদের নির্বাচনের পর আইয়ুব খান ১৯৬০ সালের ১৩ জানুয়ারি "The Presidential (Election and Constitutional) Order", ১৯৬০ জারি করেন। এই অর্ডিন্যান্সের উদ্দেশ্য ছিল মৌলিক গণতন্ত্রীগণ একটি রেফারেন্ডামের মাধ্যমে আইয়ুব খানকে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত করে তাকে একটি সংবিধান প্রণয়নের অধিকার প্রণয়ন করবেন। প্রেসিডেন্ট পদে তাঁর মেয়াদকাল শুধুমাত্র অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য হবে না, বরং ভবিষ্যতে প্রণীত সংবিধানে যে মেয়াদকাল নির্ধারণ করা হবে- সেই প্রথম মেয়াদকালের জন্য। এইভাবে আইয়ুব খান সামরিক শাসনকে আইনসিদ্ধ করার প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। নির্বাচিত মৌলিক গণতন্ত্রীরা ১৯৬০ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি গোপন ব্যালটে হ্যাঁ-না ভোট দিয়ে আইয়ুব খানকে পাঁচ বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করেন। এই নির্বাচনে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বি ছিল না। ছিল শুধু দু'টি বাক্স। একটি হ্যাঁ বাক্স এবং অন্যটি না বাক্স। প্রেসিডেন্টের ওপর আস্থা আছে কিনা সেটি জানাতে বি.ডি মেম্বারগণ হ্যাঁ বা না বাক্সে তাদের ভোট দিয়েছেন। তবে ব্যালটে সীল মারার কোনো বিধান ছিল না। ৭৮,৭২০টি ভোট পড়ে. এর মধ্যে হ্যাঁ ভোট ৭৫,২৮২টি ছিল।[৮২] আইয়ুব খান শতকরা ৯৫টি ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য।

২. ১৯৬২ সালের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন:

পাকিস্তানের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ১৯৬০ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি একটি এগারো সদস্য বিশিষ্ট সংবিধান কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনের দায়িত্ব ছিল ১৯৫৬ সালের সংবিধানের ব্যর্থতার কারণ ও প্রকৃতি নির্ণয় করা এবং পাকিস্তানের জন্য ভবিষ্যৎ সংবিধানের বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন করা। কমিশন তাঁর রিপোর্টে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির এবং শক্তিশালী আইন পরিষদের সুপারিশ করেন। কিন্তু কমিশনের কোনো সুপারিশ প্রেসিডেন্টের পছন্দ না হওয়ায় তিনি নিজে আরেকটি কমিটি গঠন করে সংবিধানের খসড়া প্রণয়ন করেন। ১৯৬২ সালের ১ মার্চ প্রেসিডেন্ট সংবিধান ঘোষণা করেন এবং তা ১৯৬২ সালের ৮ জুন কার্যকরী করা হয়।

---

[৮১] হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬-৫৯

[৮২] S. A. Akanda, "Was Parliamentary System of Government a Failure in Pakistan? A Case Study of a Constitutional Debate in Pakistan during Martial Law, 1958-1962" *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies*, Vol. VI, 1982-1983, P. 163

Dhaka University Institutional Repository

আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলের ৪৪ মাসে তাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য কোনো আন্দোলন সংঘটিত হয়নি কিংবা কোনো বক্তব্য-বিবৃতি উচ্চারিত হয়নি। এসময় আইয়ুব খানের গৃহিত কিছু পদক্ষেপের কারণে পূর্ববাংলার ছাত্র, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক কর্মী এবং কিছু রাজনীতিবিদ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠেন। আইয়ুব খান পূর্ববাংলার সংস্কৃতির উপর আঘাত স্বরূপ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেন। যেমন- রোমান হরফে বাংলা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা, কবি নজরুলের কবিতার শব্দ পরিবর্তন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন বন্ধ করা প্রভৃতি। এসময় আস্তে আস্তে পূর্ববাংলায় ছাত্র আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেপ্তার, ১৯৬২ সালের সংবিধান বিরোধী এবং 'শরীফ কমিশন' শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের বিরোধিতা করে আন্দোলন শুরু হয়।

১৯৬০ সালে গঠিত সংবিধান কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৬২ সালের ২৮ এপ্রিল জাতীয় পরিষদের এবং ৬ মে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্ররা শেষ পর্যন্ত এই নির্বাচনের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুললে আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ নির্বাচনে অংশ নেয়া থেকে বিরত থাকে।

৩. ১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনঃ

মৌলিক গণতন্ত্রীদের দ্বারা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর ১৯৬৫ সালে আবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিভিন্ন বিরোধীদল আইয়ুব বিরোধী মঞ্চে সমবেত হওয়ার অপূর্ব সুযোগ করে দেয়। ১৯৬৪ সালের জুলাই মাসে আওয়ামী লীগ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামি, নেজামে ইসলামী এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট গঠনের একটি প্রস্তাব সমর্থন করে এবং 'সম্মিলিত বিরোধীদল' (Combined Opposition Party বা COP) নামে একটি জোট গঠন করে। এই জোট প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সকল বিরোধীদলের পক্ষে মিস ফাতেমা জিন্নাহকে প্রার্থী মনোনয়ন করে।[৮৩] কপ নয় দফা নির্বাচনী ইশতাহার ঘোষণা করে।[৮৪] যথা- একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়ন, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের আইন ও বাজেট প্রণয়নের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রদান, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিধান, প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা হ্রাসকরণ, শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ, আইনের সাংবিধানিক বৈধতা যাচাইয়ের ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টকে প্রদান, সকল রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি, নিবর্তনমূলক সকল আইনের বিলুপ্তি।

নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সকল বিরোধী দল মিস ফাতেমা জিন্নাহর জয়লাভের ব্যাপারে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কোনো কোনো দল নির্বাচনী পুস্তিকা প্রকাশ ও প্রচার করেন। হাজী মোহাম্মদ দানেশ, শেখ মুজিবুর রহমান, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, পূর্ব পাকিস্তান সংগ্রামী ছাত্রসমাজ[৮৫] প্রচারপত্র প্রকাশ করে।

---

[৮৩] S. A. Akanda, "The Working of the Ayub Constitution and the People of Bangladesh", *The Journal of the Institute of Bangladesh Stueies*, Vol IV, 1979-80, p. 93

[৮৪] *ibid*, p. 93

[৮৫] পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ এবং পাকিস্তান ছাত্রশক্তি নামে তিনটি ছাত্র সংগঠন মিলে 'পূর্ব পাকিস্তান সংগ্রামী ছাত্রসমাজ' নামক ছাত্র ঐক্য জোট গঠন করা হয়।

১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সাধারণ জনগণের মধ্যে মিস ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেলেও নির্বাচনী ফলাফলে দেখা যায় যে আইয়ুব খান ভোট পান ৪৯,৯৫১ অপরদিকে মিস ফাতেমা জিন্নাহ পান মাত্র ২৮,৬৯১। পশ্চিম পাকিস্তানে আইয়ুব খান ৭৩.৭% ভোট এবং পূর্ব পাকিস্তানে ৫৩.১% ভোট পান।[৮৬] এর কারণ জনসাধারণ ও রাজনৈতিক নেতা কর্মীবৃন্দ বিপুল ভাবে মিস ফাতেমা জিন্নাহকে সমর্থন জানালেও আসল ভোটার ছিলেন মৌলিক গণতন্ত্রীরা যাদেরকে আইয়ুব খান সহজেই তাঁর পক্ষে ভোট দেয়ার জন্য প্ররোচিত করতে পেরেছিলেন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর ১৯৬৫ সালের ২১ মার্চ জাতীয় পরিষদের এবং ১৬ মে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬২ সালের সংবিধানের আওতায় অনুষ্ঠিত এই সাধারণ নির্বাচন সম্পর্কে প্রফেসর সফর আলী আকন্দ মন্তব্য করেন[৮৭]-

> The general election in Pakistan under the 1962 constitution was not political fights among political parties based on principles and ideologies. They were reduced to a grotesque auction of votes in which the highest bidder could win. Indeed, money had replaced politics in the elections, and it appeared, politics was slipping out into the hands of the non-practitioner of politics, where there was money.

১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর পরই পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়। এ যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বুঝতে পারে তারা সামরিক দিক দিয়ে কতটা অরক্ষিত। তখন তারা স্বায়ত্তশাসনের দাবি যা দেশভাগের সময় থেকেই উচ্চারিত হতে থাকে, তা আরো জোরদার হয়ে ওঠে। স্বায়ত্তশাসনের দাবি নিয়ে এগিয়ে আসে আওয়ামী লীগ। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পরাজয়ের পর 'কপ' নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। আওয়ামী লীগ তখন স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত করে। পাক-ভারত যুদ্ধের পরপরই শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বায়ত্তশাসন জরুরী হয়ে পড়েছে। তিনি একই সাথে স্বায়ত্তশাসনের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে 'ছয় দফা কর্মসূচি' প্রণয়ন করেন। ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলের এক সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচি উপস্থাপন করেন। কিন্তু তা প্রত্যাখ্যাত হয়। এরপর শেখ মুজিব পূর্ববাংলায় ছয় দফার পক্ষে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। যার ফলশ্রুতিতে তাঁর ওপর শুরু হয় আইয়ুব সরকারের নির্যাতন, জেল জুলুম। শেখ মুজিব সকলকে বুঝাতে চেষ্টা করেন যে একমাত্র ছয় দফা বাস্তবায়ন হলেই পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসন অর্জন সম্ভব। ছয় দফা আন্দোলন দমনের জন্য রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের গ্রেপ্তারের সাথে সাথে আইয়ুব সরকার পূর্ববাংলার ভাষা ও সংস্কৃতির ওপরও আঘাত হানে। আইয়ুব সরকার পাকিস্তানের রেডিও টেলিভিশনে রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচার, পহেলা বৈশাখ পালন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। একই সাথে তারা বাংলা ভাষা সংস্কার করে একটি 'জাতীয় ভাষা' প্রচারের চেষ্টা শুরু করে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সরকারের এসব সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং ছয় দফা

[৮৬] S. A. Akanda, *ibid*, pp. 98-99
[৮৭] *ibid*, pp. 98-99

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবায়নের জন্য আন্দোলন শুরু করে। ১৯৬৭ সালে ছয় দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি যখন ব্যাপক আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে রূপ লাভ করে তখন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান আন্দোলনকে স্তিমিত করার এক কূটকৌশল আবিষ্কার করেন। ভারতীয়দের সহযোগিতায় পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র করছে এমন অভিযোগ এনে 'ষড়যন্ত্র পরিকল্পনা ও পরিচালনা'র নামে শেখ মুজিবসহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়। যা 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে পরিচিত। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বুঝতে পারে তাদের স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে নস্যাৎ করার জন্য আইয়ুব খান একের পর এক ঘৃণ্য পদক্ষেপ নিচ্ছেন। ইতিমধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের বামপন্থী ছাত্রসংগঠনগুলো আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। তারা ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে আন্দোলনের কর্মসূচি হিসেবে ১১-দফা দাবি ঘোষণা করে। সারাদেশে শুরু হয় আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন। একই সাথে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারসহ সকল রাজবন্দিদের মুক্তির দাবি জানায়। ১১-দফার দাবির মধ্যে ছয় দফা দাবি অর্ন্তভূক্ত হওয়ায় এগারো দফার আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক সমর্থন লাভ করে এবং আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব ছাত্র-নেতৃবৃন্দদের হাতে চলে আসে।

আইয়ুব বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে শুরু হলেও তা ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে তুঙ্গে ওঠে। যা আস্তে আস্তে গণআন্দোলনে রূপ নেয়। আইয়ুব বিরোধী মিছিল-মিটিং, সভা-সমাবেশ নিত্যদিনকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। আইয়ুব খান পুলিশ, ইপিআর ও সেনাবাহিনী দিয়ে এ আন্দোলন স্তব্ধ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। আন্দোলন আরও শক্তিশালী হতে থাকে। ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি পুলিশের গুলিতে ছাত্রনেতা আসাদ শহীদ হলে আন্দোলন সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। আন্দোলন রাজধানী শহরে সীমাবদ্ধ না থেকে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহা পুলিশের বেয়নেট চার্জের ফলে মৃত্যুবরণ করেন। এ মৃত্যু সংবাদ প্রচার হলে সারাদেশে ব্যাপক গণবিক্ষোভ শুরু হয়। এতে ভীত হয়ে আইয়ুব খান ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেয়।

১৯৬৯ সালের ২১ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান ৬-দফা ও ১১-দফার আলোকে পাকিস্তানের সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধনীর খসড়া প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের কাছে পেশ করেন। এ খসড়ায় পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ও সেনাবাহিনীর ক্ষমতা সংকুচিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়ায় আইয়ুব খান ভীত হয়ে পড়েন। আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন শুধুমাত্র পূর্ব পাকিস্তানে সীমাবদ্ধ থাকে না, তা পশ্চিম পাকিস্তানেও ব্যাপকতা লাভ করে। এমন অবস্থায় আইয়ুবের পক্ষে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু স্বৈরাচারী আইয়ুব খান জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের চেয়ে সেনাবাহিনীর হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা ভাল মনে করেন। সে উদ্দেশ্যে ১৯৬৯ সালের ২৪ মার্চ পাকিস্তানের তৎকালীন সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল মোহাম্মদ ইয়হিয়া খানকে এক চিঠি লিখে ক্ষমতা গ্রহণের আহবান জানান। ফলে ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ সারাদেশে সামরিক আইন জারি করে আইয়ুব খানের কাছ থেকে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। ১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর জেনারেল ইয়াহিয়া ঘোষণা করেন যে, যত শীঘ্র সম্ভব তিনি প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। একই সাথে ঘোষণা করেন যে, ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর দেশে জাতীয় পরিষদের এবং

Dhaka University Institutional Repository

২২ অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তাঁর এ ঘোষণায় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ অপেক্ষা করতে থাকে একটি অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

আইনগত কাঠামো আদেশ, বিষয়বস্তু ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিক্রিয়া

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা দেশে সামরিক আইন জারি এবং সেনাপ্রধান আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করেন। ২৭ অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট মীর্জাকে উৎখাত করে তাকে দেশত্যাগে বাধ্য করেন। ২৮ অক্টোবর আইয়ুব খান এক সরকারি আদেশ জারির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর পদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন এবং নিজে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তারপর এক দশককাল ধরে শুরু হয় আইয়ুবীয় শাসন। আইয়ুব খান এদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে তথাকথিত মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা চালু করেন। এতে দেশের জনগণ তাঁর সামরিক শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তাঁর শাসনকালে তিনি পুর্ববাংলার আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এমনকি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাঙালিদের দমনের জন্য নিত্য নতুন পন্থা বের করেন। শেষ পর্যন্ত বাঙালিদের নেতৃত্বদানকারী সুযোগ্য নেতা শেখ মুজিবকে মিথ্যা মামলা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দিয়ে অন্যায়ভাবে বিচার কাজ চালালে পূর্ববাংলার জনগণ সেটা মেনে নেয়নি। আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে শুরু হয় দেশব্যাপী আন্দোলন। সে আন্দোলন ব্যাপকতর রূপ লাভ করে ১৯৬৮ সালের শেষ সময থেকে ১৯৬৯ এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এ আন্দোলনের জোয়ারে পূর্ব পাকিস্তানের আপামর জনসাধারণ আইয়ুব খানের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে আসে। এসময় দেশের আইন শৃঙ্খলার অবস্থার চরম অবনতি ঘটে। শেষ পর্যন্ত আইয়ুব খান বাধ্য হয়ে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিব সহ সকল বন্দিদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। এরপরপর সাংবিধানিক সংকট নিরসনের জন্য তিনি রাজনীতিকদের গোলটেবিল বৈঠক ডেকেছিলেন কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। যার ফলশ্রুতিতে আইয়ুব খান পাকিস্তানের রাজনীতি থেকে পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন।

১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পদত্যাগ করে প্রধান সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। পদত্যাগ পত্রে জেনারেল আইয়ুব খান বলেন,

> ‘অতীব দুঃখের সহিত আমাকে এই সিদ্ধান্তে আসিতে হইয়াছে যে, দেশের সমুদয় বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা ও নিয়মতান্ত্রিক কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ অচল হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমান অবস্থার উদ্বেগজনক মাত্রায় যদি অবনতি ঘটতে থাকে, তাহা হইলে দেশের অর্থনৈতিক জীবনধারা তথা সভ্য জীবনের অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া পড়িবে।
>
> এমতাবস্থায়, ক্ষমতার আসন হইতে নামিয়া যাওয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তর দেখিতেছি না।
>
> তাই আমি পাকিস্তানী দেশরক্ষা বাহিনীর হস্তে দেশের পূর্ণ কর্তৃত্ব ন্যস্ত করিয়া যাওয়ার সাব্যস্ত করিয়াছি। কেননা, সামরিক বাহিনীই দেশের আজিকার একমাত্র কর্মক্ষম ও আইনানুগ যন্ত্র।[১]

পদত্যাগ পত্রে আইয়ুব খান যেভাবে দেশের পরিস্থিতি বর্ণনা করলেন বাস্তবে এর চিত্র ছিল ভিন্নতর। আইয়ুব খানের এটা ছিল এক বিরাট ব্যর্থতা যে তিনি পাকিস্তানের কমান্ডার ইন চীফ ইয়াহিয়া খানকে “চরম বিশৃঙ্খলা ও সার্বিক ধ্বংস হতে

[১] হাসান হাফিজুর রহমান ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, ২য় খণ্ড, ঢাকা, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২, পৃ. ৪৪৯

Dhaka University Institutional Repository

দেশকে রক্ষা করতে" আহবান জানান। সত্যিকার বলতে কি রাজনৈতিক নেতারা দেশে প্রায় নৈরাজ্যমূলক পরিস্থিতি মোকাবিলা করার হাত থেকে হাফ ছেড়ে বাঁচলেন। তারা সম্ভবত খুশিই হয়েছিলেন যে, পরিস্থিতি মোকাবিলায় সামরিক বাহিনীকে ডাকা হয় যে পরিস্থিতি ছিল তাদের হিসেবের বাইরে।

আইনগত কাঠামো আদেশের পটভূমি

জেনারেল ইয়াহিয়া খুব সতর্কতার সাথে পাকিস্তানের সংকটকালীন সময়ে ক্ষমতা নিলেন। প্রথমে তিনি সকলের সামনের এমন ভাবে ক্ষমতা নিলেন যেন তিনি আইয়ুব খানের আহবানে ক্ষমতা নিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে জেনারেল ইয়াহিয়া খান অনেক আগে থেকেই ক্ষমতা গ্রহণ করতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু তা আইয়ুব খান অনেক পরে জানতে পারেন। আইয়ুব খান যখন বুঝলেন তখন জেনারেল ইয়াহিয়া খানের মনোভাব অনুযায়ী তিনি প্রেসিডেন্টের পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ইয়াহিয়ার উদ্দেশ্যে বলেন, "আপনি কি করতে চাচ্ছেন তা আমি বুঝতে পারছি। প্রয়োজনীয় পেপারস তৈরী করুন, আমি স্বাক্ষর দেবো।[২] জেনারেল ইয়াহিয়া খান প্রথম যখন ক্ষমতা নিলেন তখন মনে হল তিনি তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে পাকিস্তানকে সংকট থেকে রক্ষার জন্য ক্ষমতা নিলেন। কিন্তু একদিনের ব্যবধানে তাঁর উদ্দেশ্য পরিস্কার হয়ে যায়। ক্ষমতা গ্রহণ করার পর ১৯৬৯ সালের ২৬ মার্চ ঘোষণা করেন, 'আমি পরিস্কারভাবে বলতে চাই আমার কোনো ব্যক্তিগত উচ্চাশা নেই, আমি শুধু একটি সাংবিধানিক সরকার গঠনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস একটি গঠনমূলক রাজনৈতিক অবস্থানের জন্য এবং অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধদের হাতে বিনা ঝামেলায় ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বশর্ত হলো একটি নির্ভরযোগ্য, পরিচ্ছন্ন ও সৎ প্রশাসন। এই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দায়িত্ব হবে দেশে একটি প্রয়োগবাদী সংবিধান করা এবং দেশে আলোড়নকারী সমুদয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাবলীর সমাধান খুঁজে বের করা।[৩]

একই সাথে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১০ এপ্রিল প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, আমার একমাত্র লক্ষ্য হলো মানুষের জীবন, অধিকার ও সম্পত্তি সংরক্ষণ করা এবং প্রশাসনকে সুসংহত করা। তিনি বলেন যে, পাকিস্তানের উপর কোনো শাসনতান্ত্রিক ফর্মূলা চাপিয়ে দিবেন না। তিনি প্রশাসনকে সঠিক পথে চালাতে, আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে এবং সবশেষে নির্বাচন অনুষ্ঠান করে গণতান্ত্রিক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চান।[৪]

গণঅভ্যুত্থানের ফসল হিসেবে গণতন্ত্রের বিজয়কে বিলম্বিত করার কাজটি তিনি ভালোই সম্পাদন করেন। তিনি একদিকে যেমন প্রত্যাশার বিস্ফোরণ দমিয়ে রাখেন, অন্যদিকে তেমনি নিষ্ক্রিয় হয়ে ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙেন নি।[৫] ১৯৬৯ সালে যখন ৩৬টি রাজনৈতিক দল-উপদল নির্বাচন অনুষ্ঠানের অপেক্ষায় ছিল তখন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তাঁর উদ্দেশ্য হাসিলের সুযোগ

[২] রাও ফরমান আলী, *বাংলাদেশের জন্ম*, ঢাকা, ইউপিএল, ১৯৯৬, পৃ. ২৪-২৫
[৩] *দৈনিক ডন*, ২৭ মার্চ ১৯৬৯
[৪] *দৈনিক পাকিস্তান*, ১১ এপ্রিল ১৯৬৯
[৫] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *বাংলাদেশ: জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব*, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ২০০০, পৃ. ১৬৪

Dhaka University Institutional Repository

খুঁজে পান।[৬] ইয়াহিয়া খানের মনে এ বিশ্বাস ছিল যে, নির্বাচক মন্ডলীকে মতামত প্রকাশের পূর্ণ ক্ষমতা দিলে একটি মাত্র দলের পিছনে তারা কখনো একতাবদ্ধ হতে পারবেন না। বরঞ্চ এদের পরিষদকে নামমাত্র এবং পরস্পর বিরোধী লক্ষ্যের পথে যথেচ্ছ ব্যবহার করা যাবে। তখন মতভেদের দরুন পরিষদের অচলাবস্থার দোহাই দিয়ে তিনি সুনিশ্চিতভাবে একটি শাসনতন্ত্র তৈরি করতে পারেন তাহলে তিনি বিপদমুক্ত হয়ে ক্ষমতার শীর্ষেই আরোহন করতে সক্ষম হবেন। এই সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার মতো ইয়াহিয়া খানের যথেষ্ট কারণ ছিল। কেননা আইয়ুব খানের পতন ঘটানোর জন্য সমগ্র দেশ ও দেশের রাজনীতিকগণ একতাবদ্ধ হলেও তারা একটি বিকল্প পদ্ধতির সরকার গঠনের ব্যাপারে মতৈক্যে পৌছতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।[৭] এ থেকেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা আকঁড়ে ধরে থাকার মনোভাব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১৯৬৯ সালে ইয়াহিয়া খান যখন তাঁর পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলেন তখন তিনি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মাঝে উত্তেজনা ও মতদ্বৈততার বিষয়ে একটি সন্তোষজনক সমাধানের ব্যাপারে প্রকৃতই আগ্রহী ছিলেন।[৮] কেননা ইয়াহিয়া খান পূর্বেই নির্ভুলভাবে অনুমান করেছিলেন যে, শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজে প্রধান বাধা আসবে পুর্ব পাকিস্তান থেকে। পশ্চিম পাকিস্তানিদের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানিরা রাজনীতির ক্ষেত্রে অধিক সচেতন। দুই যুগেরও অধিককাল ধরে শোষিত হওয়ার পর তারা সরকারি কর্তৃত্ব সম্পর্কে সন্দিহান। তাই স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাদেরকে সর্বান্তকরণে বুঝিয়ে স্বমতে আনতে না পারলেও তিনি ধূর্ততার সাথে তাদের সন্দেহ নিরসনে তৎপর হিলেন। কৌশলটি ছিল সরল অথচ যথেষ্ট ফলদায়ক। ইয়াহিয়া খান নিজের গোপন ইচ্ছা মনে রেখে ক্ষমতা হস্তান্তর পরিকল্পনা নিয়ে কিছু কার্যকরী পদক্ষেপ নেন। যাতে পাকিস্তানের জনগণ বুঝতে পারে যে ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা গ্রহণের উদ্দেশ্য সৎ। এক্ষেত্রে তিনি যে কাজগুলো করেন[৯]–

১. তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা ও শলাপরামর্শ করতে থাকেন। কখনো প্রকাশ্যে আবার কখনো গোপনে এই আলোচনা করতে থাকেন। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যে, যদিও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান শাসনতন্ত্র বাতিল করে দেন।

২. প্রাদেশিক ও জাতীয় উভয় আইন পরিষদ সমূহ ভেঙ্গে দেন এবং সারাদেশে সামরিক আইন জারী করেন তবুও রাজনৈতিক দলসমূহকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেননি এবং ১৯৫৮ সালের আইয়ুব খানের মত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠাননি। বরং নতুন সামরিক জান্তা আগে থেকেই শেখ মুজিব, মওলানা ভাসানী ও ভুট্টোর মত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে কিছুটা যোগাযোগ রক্ষা করেছিলেন। আইয়ুব খানের বিদায়ের আগে তাঁর ডাকা গোলটেবিল বৈঠকের পরিণতি দেখে ইয়াহিয়া খান রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কোনো সম্মেলন ডাকেননি। পক্ষান্তরে ইয়াহিয়া খান রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে চুপচাপ এবং দ্বিপাক্ষিক আলোচনা শুরু করেন। তিনি দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত সফর করেন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সাথে সত্যিকারের

[৬] এ্যান্থনী ম্যাসকারেনহাস, অনুবাদ ড. মযহারুল ইসলাম, *বাংলাদেশ লাঞ্ছিতা*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩, পৃ. ৫২
[৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১-৫২
[৮] জি ডব্লিউ চৌধুরী, *অখণ্ড পাকিস্তানের শেষ দিনগুলি*, ঢাকা, হক কথা প্রকাশনী, ১৯৯১, পৃ. ৮৫
[৯] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৫-১৬৬

আলাপ আলোচনা চালান এবং রাজনীতিকগণ ক্রমশ তাঁর আন্তরিকতায় মুগ্ধ হন। তিনি সঠিকভাবেই শেখ মুজিবের প্রতি অধিক মনোযোগ দেন। কারণ তিনি ছিলেন বাঙালিদের নেতা। আর এ বাঙালিরাই ছিল দেশের জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ট অংশ।[১০]

৩. তিনি বেশ কিছু প্রশাসনিক সংস্কার করেন। তিনি প্রশাসনের কিছু উচ্চপদে কতিপয় বাঙালি আমলা নিয়োগ করেন এবং অনেক উচ্চপদে আসীন ব্যক্তিকে অব্যাহতি দেন। কেন্দ্রীয় সরকারের কয়েকজন বাঙালি সচিব (এ.কে.এম আহসান, এম.এ. রব, সাদেক আহমদ চৌধুরী, সাইউদ আহমদ) নতুন নিযুক্ত হলেন। পূর্ব পাকিস্তনের মুখ্য সচিব হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় এস.এম শফিউল আজমকে।

৪. প্রশাসনকে পরিস্কার ও কলুষমুক্ত করার জন্য তিনি সরকারি কর্মচারীদের সম্পদ নিয়ে তদন্ত শুরু করেন। যার ফলশ্রুতিতে ৩০৩ জন লোক চাকুরী হারায়।

৫. তিনি প্রধান নির্বাচনী কমিশনার হিসেবে বিদায়ী সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে নিয়োগ দেন। তাকে দায়িত্ব দেয়া হলো ভোটার তালিকা তৈরি ও নির্বাচনের জন্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণের।

৬. ক্ষমতা গ্রহণ করার পর প্রথম চার মাস ইয়াহিয়া খান নির্বাহী ক্ষমতা সামরিক ব্যক্তিদের হাতে রাখেন। তিনি একই সাথে প্রেসিডেন্ট, সর্বাধিনায়ক, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব নেন।

৭. বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার মার্শাল নুর খান, নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এস. এম. আহসান এবং সেনাবাহিনীর প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আবদুল হামিদকে তিন উপ-প্রধান সামরিক প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব দেন।

৮. প্রেসিডেন্টের দফতরে লেফটেন্যান্ট জেনারেল এস. জি. এম পীরজাদাকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দেয়া হয়।

৯. দুই প্রদেশে দুই জন সেনাপাতিকে আঞ্চলিক সামরিক প্রশাসক ও গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়। জেনারেল মোফাফ্ফরউদ্দিনকে পূর্ব পাকিস্তানে এবং লে. জেনারেল আতিকুর রহমানকে পশ্চিম পাকিস্তানের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

১০. মন্ত্রিসভার তিন ব্যক্তি এডমিরাল এ আর খান, ফিদা হাসান এবং মিয়া আরশাদ হোসেনকে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়।

১১. ১৯৬৯ সালের ৪ আগস্ট ইয়াহিয়া খান একটি বেসামরিক মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এয়ারমার্শাল নুর খানকে[১১] পশ্চিম পাকিস্তানের এবং এডমিরাল এস এম আহসানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। মন্ত্রিসভার দশ সদস্যের মধ্যে পাঁচজন ছিলেন বাঙালি। এরা হলেন ডা. আবদুল মোতালেব মালিক, হাফিজুদ্দিন আহমদ, শামসুল হক, আহসানুল হক এবং ড. গোলাম ওয়াহেদ চৌধুরী।

[১০] জি ডব্লিউ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫-৭৬

[১১] কয়েক মাস পর নুর খান পদত্যাগ করলে তার স্থলাভিষিক্ত হন জেনারেল আতিকুর রহমান।

Dhaka University Institutional Repository

চারমাস আলাপ আলোচনার পর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৬৯ সালের ২৮ জুলাই একটি বড় ধরনের নীতি নির্ধারণী ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি রাজনৈতিক নেতাদের সাথে তাঁর আলোচনা উল্লেখ করেন এবং ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের মত ব্যাপারগুলোতে তীব্র মতভেদের কথা জানান। শেখ মুজিব ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তন করার বিরুদ্ধে ছিলেন অন্যদিকে অনেকেই মনে করতেন যে, ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র হওয়া উচিত একটি আইনগত দলিল যার অধীনে শীঘ্রই একটি নির্বাচন হতে পারে। এরপর বিতর্ক ছিল প্রতিনিধিত্বের মূলনীতির ব্যাপারে–তা কি 'এক ব্যক্তি এক ভোট' এর ভিত্তিতে হবে নাকি ১৯৫৫ সালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান এ উভয় অঞ্চলের নেতাদের ঐক্যমতের সমমর্যাদার ভিত্তিতে হবে। কিন্তু শেখ মুজিব সমমর্যাদার ব্যাপারে বিরোধিতা প্রকাশ করে দাবি করেন যে, প্রতিনিধিত্বের ভিত্তি হওয়া উচিত গণতান্ত্রিক নীতি অর্থাৎ এক ব্যক্তি এক ভোট এ পদ্ধতিতে যা বাঙালিদের জাতীয় সংসদে নিশ্চিতভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রদান করবে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দ এটি গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ফেডারেল আইন পরিষদ দুইকক্ষ বিশিষ্ট না হয় নিম্নকক্ষ হবে জনসংখ্যার ভিত্তিতে বা এক ব্যক্তি এক ভোট এ হিসেবে এবং উচ্চকক্ষ হবে অন্য কিছুর ভিত্তিতে। পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট তথা ১৯৫৫ সালের মতো চারটি প্রদেশকে মিলিয়ে এক প্রদেশে পরিণত করার ব্যাপারে বিতর্ক ছিল। ছোট ছোট প্রদেশগুলোও এক ইউনিট বিরোধী ছিল এবং শেখ মুজিবও এর বিপক্ষে ছিলেন।[১২]

তিনটি বিতর্কিত বিষয়ে পর্যালোচনার পর ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন– "আপনারা দেখছেন এসব প্রধান ইস্যুগুলোতে নানা মত ও দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। আমার সম্বন্ধে আমি আগেই কয়েকবার ইঙ্গিত দিয়েছি যে, আমার মন এ সব ব্যাপারে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত এবং সিদ্ধান্ত নিবে জনগণ। কেবলমাত্র যে শর্তের ব্যাপারে আমি জোর দিচ্ছি তা হল, যে কোনো শাসনতন্ত্র বা যে কোনো রকমের সরকার যা পাকিস্তানের জনগণ তাদের নিজেদের জন্য গ্রহণ করবে তাকে অবশ্যই পাকিস্তানের কাঙ্ক্ষিত আদর্শ ও অখণ্ডতার ধারক হতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত এ সব দাবি পাকিস্তানের অখণ্ডতার সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়– ততক্ষণ পর্যন্ত সে সব মিটানোর জন্য পন্থা ও পদ্ধতি বের করতে হবে।[১৩]

ক্ষমতা হস্তান্তর পরিকল্পনা প্রণয়নে তিনটি মৌলিক বিষয়ে ইয়াহিয়া খানকে সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছিল। প্রথমটি ছিল কোনো দ্বিতীয় সংসদীয় কক্ষ অথবা কোনো বিশেষ ভোটার ব্যবস্থা– যাতে জাতীয় পরিষদে নিছক সংখ্যাগরিষ্ঠতার পরেও প্রয়োজন হবে এ ধরনের বিধি ব্যবস্থা ছাড়াই বাঙালিদের এক ব্যক্তি এক ভোট এর ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের শর্তহীন দাবি। দ্বিতীয় এবং সবচেয়ে জটিল ব্যাপারটি ছিল কেন্দ্র-প্রদেশের সম্পর্ক। এটি ছিল পাকিস্তানের টেকসই রাজনৈতিক পদ্ধতি উদ্ভাবনে শাসনতান্ত্রিক অন্বেষণের ক্ষেত্রে এক জটিল বিষয়। তৃতীয় বিষয়টি ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ভেঙ্গে দিয়ে একটি প্রদেশ হিসেবে পুর্নবহাল করা।[১৪]

---

[১২] জি ডব্লিউ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯-৮০

[১৩] *দৈনিক ডন*, ২৯ জুলাই ১৯৬৯

[১৪] আবুল মাল আবদুল মুহিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫-১৬৬

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তাঁর পরিকল্পনাটির প্রাথমিক খসড়া তৈরি করেছিলেন জেনারেল পীরজাদা এবং জি ডব্লিউ চৌধুরীর সমন্বয়ে খুবই ক্ষুদ্র একটি সাহায্যকারী দলকে নিয়ে এবং সর্বাত্মক আন্তরিকতার সাথে রাজনীতিকদের মতামতকে সর্বক্ষণ মূল্যায়ণ ও পুর্ণমূল্যায়ণ করা হয়েছিল এবং সামরিক ও বেসামরিক গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট সম্পূর্ণভাবে হিসেবের মধ্যে আনা হয়েছিল। চূড়ান্ত পর্যায়ে জেনারেল ইয়াহিয়া খান, জেনারেল পীরজাদা, দু'জন প্রাদেশিক গভর্নর এবং দু'জন আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসকের সমন্বয়ে গঠিত ভিতর মন্ত্রিসভার দীর্ঘ বৈঠকের মাধ্যমে।[১৫]

জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। এই ভাষণে তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করার রূপরেখা প্রদান করেন। তিনি বলেন তাঁর সামনে চারটি বিকল্প পথ রয়েছে। এক- একটি সংবিধান কনভেনশন নির্বাচিত করে তাদের হাতে সংবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা ন্যস্ত করা। দুই, ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র পুনরুজ্জীবিত করে সে অনুযায়ী দেশ শাসন করা। নিয়মমাফিক এই সংবিধানের সংশোধনও করা যেতে পারে। তিন, তিনি নিজে একটি সংবিধান প্রণয়ন করে তার ওপরে গণভোট নিতে পারেন। চার, একটি সামরিক আইনগত কাঠামো রচনা করে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা-যাতে নির্বাচিত পরিষদ একটি সংবিধান রচনা করতে পারে।[১৬] একইসাথে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তও ঘোষণা করেন। প্রথমটি হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বাতিল করে দেন এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে ভবিষ্যৎ জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের জন্য 'একজন লোক একটি ভোট' এই নীতি গ্রহণ।[১৭] এর ফলে পুর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে প্যারিটি বা সমতার যে নীতি আওয়ামী লীগ সহ সকল রাজনৈতিক দল দাবি করে আসছিল তা তারা সকলে মেনে নিয়েছিলেন এবং যা ১৯৫৬ ও ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রে গৃহিত হয়েছিলো তা পরিত্যক্ত হলো। প্রেসিডেন্টের এই সিদ্ধান্তের ফলে প্রথমবারের মতো জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা স্থায়ীভাবে স্বীকৃত হলো।

বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের সাথে চারমাসব্যাপী আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে এবং জনগণের সুস্পষ্ট ইচ্ছা অনুসারে প্রেসিডেন্ট কতগুলো বিষয়কে স্থিরীকৃত বলে ঘোষণা করেন।[১৮] এগুলো হচ্ছে:

১. ফেডারেল পার্লামেন্টারি ধরনের সরকার।

২. প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার ভিত্তিক প্রত্যক্ষ নির্বাচন।

৩. নাগরিকদের মৌলিক অধিকার দান এবং আইন আদালতের মাধ্যমে এই অধিকার রক্ষার নিশ্চয়তা বিধানের ব্যবস্থা।

৪. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং তাকে শাসনতন্ত্র রক্ষকের ভুমিকা দেয়া।

৫. যে আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা অক্ষুন্ন রাখার জন্য একটি ইসলামি ভাবাদর্শ ভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন।

---

[১৫] জি ডব্লিউ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১-৮২

[১৬] *দৈনিক ডন*, ২৯ নভেম্বর ১৯৬৯

[১৭] বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং পাকিস্তান: পাকিস্তান সরকারের শ্বেতপত্র*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১২

[১৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩

প্রেসিডেন্ট আরো প্রকাশ করেন যে, ১৯৭০ সালের ৩১ মার্চ নাগাদ একটি আইন কাঠামো এবং জুন মাস নাগাদ ভোটার তালিকা তৈরি করে ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর জাতীয় পরিষদের এবং ২২ অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হবে।[১৯]

১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের পরিকল্পনাটি ছিল তিনটি মৌলিক সূত্রের উপর ভিত্তিশীল।[২০] প্রথমত- শেখ মুজিব তাঁর ছয় দফা পরিকল্পনা পরিবর্তন করে প্রকৃত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনে সন্তুষ্ট থাকবেন এবং বিচ্ছিন্নতার দিকে যাবেন না। দ্বিতীয়ত, পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ রাজনীতিক ও শিল্পপতিগণ উভয় গোষ্ঠীই পাকিস্তানকে অবিভক্ত রাখার শর্ত হিসেবে বাঙালিদের ন্যায্য আশা আকাঙ্খার এবং অর্থনৈতিক পাওনা মেটাতে প্রয়োজনীয় ত্যাগ ও ছাড় প্রদানে রাজি হবেন এবং তৃতীয়ত, সামরিক ব্যবস্থা অবশ্যই ক্ষমতা হস্তান্তর করবে - ১৯৫৮ সাল হতে যে ক্ষমতায় অভ্যস্থ হয়ে পড়েছে।

প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা হস্তান্তর পরিকল্পনার ঘোষণা দেশের উভয় অংশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দ কর্তৃক অভিনন্দিত হয়েছে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতা হস্তান্তর কর্মসূচি ও উহার বাস্তবায়ন পদ্ধতির প্রশ্নে দ্বিমত পোষণ করলেও দেশের সমস্যা অনুধাবনে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের আন্তরিকতা প্রশংসাযোগ্য বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।[২১] রিকুইজিশন পন্থী ন্যাপ প্রধান ওয়ালী খান প্রেসিডেন্টের ঘোষণাকে ঐতিহাসিক বলে অভিনন্দন জানিয়েছেন।[২২] পিডিপি নেতা এয়ার মার্শাল আসগর খান প্রেসিডেন্টের ঘোষণাকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আশা আকাঙ্ক্ষা পুরোপুরি পূরণ না করিলেও গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবনের কঠিন সমস্যার একটি যুক্তিসঙ্গত সমাধান নির্দেশ করেছে বলে অভিমত প্রকাশ করেন।[২৩] কনভেনশন লীগ নেতা খান এ সবুর খান প্রেসিডেন্টের ঘোষণায় শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরে তাঁর আন্তরিক আগ্রহের পরিচয় ফুটে উঠেছে বলে মন্তব্য করেন।[২৪] জামায়াতে ইসলামি প্রধান মওলানা আবুল আলা মওদুদী বলেন যে, প্রেসিডেন্টের সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ও এর আইনগত কাঠামো সম্পর্কিত প্রস্তাব সমগ্র জাতির জন্য সন্তোষজনক বিবেচিত হবে।[২৫] খেলাফতে রব্বানী পার্টির চেয়ারম্যান এ এস এম মোফাখখার এক বিবৃতিতে বলেন, সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণাসহ নির্বাচনের সময়সূচি নির্দিষ্ট করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জাতির সামনে যে কর্মসূচি পেশ করেছেন, তা নিঃসন্দেহে জনগণের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং স্বস্তির বাণী বলে বিবেচিত হবে।[২৬] নেজামে ইসলাম পার্টির সভাপতি মওলানা সিদ্দিক আহমদ সাহেব প্রেসিডেন্টকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।[২৭]

---

[১৯] বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩
[২০] জি ডব্লিউ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯
[২১] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ ডিসেম্বর ১৯৬৯
[২২] *ঐ*
[২৩] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ ডিসেম্বর ১৯৬৯
[২৪] *ঐ*, ২ ডিসেম্বর ১৯৬৯
[২৫] *ঐ*
[২৬] *ঐ*
[২৭] *ঐ*

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতা হস্তান্তর পরিকল্পনার ভাষণ দেশের বাইরেও বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়। বিশ্ব প্রচারমাধ্যমগুলো পাকিস্তান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুর্নবহাল এবং দেশের জটিল আঞ্চলিক বিরোধ সমাধানে ইয়াহিয়া খানের সাহসী এবং আন্তরিক প্রস্তাবকে স্বাগত জানায়।[২৮] নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকা "পাকিস্তান উদাহরণ স্থাপন করল"- এ শিরোনাম লিখে "পাাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান তার দেশে গণতান্ত্রিক বেসামরিক শাসন পুর্ণবহালের পদক্ষেপ নিয়ে অন্যান্য সামরিক শাসকদের জন্য এক দূরদর্শী উদাহরণ স্থাপন করলেন... "এক ব্যক্তি এক ভোট" এর মূলনীতি পূর্ব পাকিস্তানের অশান্ত বাঙালিদেরকে তাদের সংখ্যাশক্তি অনুপাতে জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা দান করে।[২৯] ক্রিশ্চিয়ান সাইন্স মনিটর পত্রিকা মন্তব্য করে "ইয়াহিয়া খান এখন সারাদেশ ব্যাপী এক ব্যক্তি এক ভোট এর ভিত্তিতে নির্বাচনের স্পষ্ট ও দ্বিধান্বিতহীন সময়সূচি এবং একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ঘোষণা দিয়েছেন যা পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদেরকে প্রকৃতপক্ষে স্বায়ত্তশাসন এবং জাতীয় ব্যাপারে তাদেরকে কথা বলার অধিকার প্রদান করবে- যা অবশেষে তাদের সংখ্যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে।[৩০] যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে মি. সাইকস বলেন, 'প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান একটি উৎসাহব্যঞ্জক নজির পেশ করেছেন। যা অন্যান্য জাতিগুলোরও পালন করা ও প্রশংসা করা উচিত। তাঁর শান্তিপূর্ণ কিন্তু ফলপ্রসু নীতিমালা পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।[৩১] প্রেসিডেন্ট নিক্সন ওয়াশিংটনে গ্রীকদূতকে বলেছিলেন গ্রীসে ইয়াহিয়া খানের নজির অনুসরণ করা উচিত।[৩২]

দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে যারা পাকিস্তানকে অখণ্ড ও স্থিতিশীল দেখতে চাইত, তারা সবাই ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা হস্তান্তর পরিকল্পনাকে স্বাগত জানায়। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জটিল সম্পর্ককে একটি সুদৃঢ় রাজনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার এটি ছিল সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ প্রচেষ্টা। এর ফলে মনে হচ্ছিল পাকিস্তান সঠিকপথে চালিত হচ্ছে।

আইনগত কাঠামো আদেশ ঘোষণা

প্রথমে বলা হয়েছিল ১৯৭০ সালের ২৩ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আইনগত কাঠামো আদেশ ঘোষণা করবেন।[৩৩] কিন্তু ১৯৭০ সালের ২৮ মার্চ জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণে প্রেসিডেন্ট বলেন-[৩৪]

> ১৯৭০ সালের আইন কাঠামো আদেশ এ মাসের ৩০ তারিখে প্রকাশিত হবে। এই আদেশটি হবে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্যে জাতীয় পরিষদের কার্যনির্বাহীর মূল ভিত্তি। আমার বিবেচনা মত জনমত যাচাই করে এই আদেশটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এখন আমি প্রধান কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে কিছু বলতে চাই।
>
> জাতীয় পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা হবে ৩১৩। এর মধ্যে ১৩টি আসন সংরক্ষিত থাকবে মহিলাদের জন্য। বিভিন্ন প্রদেশের সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত হবে ১৯৬১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী জনসংখ্যার ভিত্তিতে।
>
> আইন কাঠামো আদেশে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাও রয়েছে।

---

[২৮] জি ডব্লিউ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮
[২৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮
[৩০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮
[৩১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮
[৩২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮
[৩৩] *দৈনিক আজাদ*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭০
[৩৪] *দৈনিক মর্নিং নিউজ*, ২৯ মার্চ ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে যখন পরিকল্পনা তৈরি করা হচ্ছিলো, তখন আমরা মনে করেছিলাম যে, প্রাদেশিক পরিষদ সমুহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে শাসনতন্ত্র চূড়ান্ত করার পর। পরে আমার সরকার বিষয়টি আরও বিশদভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন, এখন আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌছেছি যে, জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই প্রাদেশিক পরিষদ সমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে, তা রাজনৈতিক দিক থেকে জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হবে। এর প্রধান কারণ এই যে, শাসনতন্ত্র চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ার পর অবিলম্বে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর পক্ষে এ ব্যবস্থা সহায়ক হবে। এছাড়া এর ফলে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও তাদের দলসমূহ শাসনতন্ত্র রচনার পর আর একটি নতুন নির্বাচনী অভিযানের ঝুঁকি বহনের হাত থেকে রেহাই পাবেন। আমার মতে, শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নগুলোর মীমাংসা একবার হয়ে গেলেই আমাদের নেতৃবৃন্দের যা করা উচিত - তা আর এক দফা নির্বাচনী অভিযান চালানো নয় বরং তা হচ্ছে জাতি গঠনের প্রধান কর্তব্যগুলোর প্রতি আত্মনিয়োগ করা। এইসব বিষয় বিবেচনা করে আমি স্থির করেছি যে প্রাদেশিক পরিষদ সমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ১৯৭০ সালের ২২ অক্টোবরের মধ্যে তবে শাসনতন্ত্র রচিত হলে আমি তা অনুমোদন করার পর যখন প্রাদেশিক পরিষদসমূহের অধিবেশন আহবান করা হবে, তখনই যে পরিষদগুলোর কাজ শুরু হবে।"

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তাঁর কথামত ৩০ মার্চ রাওয়ালপিণ্ডিতে নির্বাচন সংক্রান্ত 'আইনগত কাঠামো আদেশ' ঘোষণা করেন। এই আদেশ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের আদেশ নং ২/১৯৭০ নামে ঘোষিত হয়।[৩৫] ১৯৭০ সালর ৩০ মার্চ প্রেসিডেন্টের দুইটি আদেশ বলবৎ হলো। ১৯৭০ সালের প্রথম আদেশে পশ্চিম পাকিস্তানে চারটি প্রদেশে গঠিত হলো এবং ইসলামাবাদ ও কেন্দ্রীয় শাসিত উপজাতি এলাকা হলো ফেডারেল এলাকা। ১৯৭০ এর দ্বিতীয় আদেশে আইনগত কাঠামো প্রতিষ্ঠা পেল।[৩৬]

বিষয়বস্তু

আইনগত কাঠামো আদেশ বা কোনো শাসনতন্ত্র নয় বরং একটি জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের জন্য একটি কর্মপদ্ধতি মাত্র- যার সর্বপ্রকার কাজ হবে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা।[৩৭]

আইনগত কাঠামো আদেশ বা এলএফওতে একটি মুখবন্ধ, ২৭ টি অনুচ্ছেদ এবং তিনটি পরিশিষ্ট ছিল। এটি দেখতে অনেকটা সামরিক শাসনতন্ত্রের মত ছিল।[৩৮] আইনগত কাঠামো আদেশের মূল বিষয়গুলি হচ্ছে–

১. পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট বাতিল করে পূর্বের প্রদেশগুলোকে পুর্নবহাল করা হবে।

২. নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এক ব্যক্তি এক ভোট এ নীতির ভিত্তিতে। জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে।

৩. জাতীয় পরিষদের নির্বাচন ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন ২২ অক্টোবরের আগেই কোনো তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।

[৩৫] *দৈনিক মর্নিং নিউজ*, ৩১ মার্চ ১৯৭০
[৩৬] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৬
[৩৭] জি ডব্লিউ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১
[৩৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৩

Dhaka University Institutional Repository

৪. পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ ৩১৩ সদস্য বিশিষ্ট হবে। এর মধ্যে ৩০০ হবে সাধারণ আসন এবং ১৩টি হবে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন। প্রাদেশিক পরিষদের আসন হবে ৬২১।

৫. জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের কোনো আসন খালি হলে আসন খালি হওয়ার তিন সপ্তাহের মধ্যে তা পূরণের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

৬. নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রেসিডেন্ট একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করবেন। এতে একজন প্রধান কমিশনার এবং দুইজন সদস্য থাকবেন।

৭. কোনো ব্যক্তি পাকিস্তানের নাগরিক হলে, তাঁর বয়স কমপক্ষে ২৫ বছর হলে তিনি জাতীয় বা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

৮. কোনো ব্যক্তি একসঙ্গে একাধিক পরিষদের সদস্য হতে কিংবা একই পরিষদের একাধিক নির্বাচনী এলাকার সদস্য হতে পারবেন না। কোনো সদস্য স্পীকারের কাছে নিজের স্বাক্ষর যুক্ত লিখিত বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে তার আসন থেকে পদত্যাগ করতে পারবেন।

৯. জাতীয় পরিষদ সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পর প্রেসিডেন্ট পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র তৈরির কাজ সম্পন্ন করার জন্য তাঁর বিবেচনা মতো উপযুক্ত তারিখ, সময় ও স্থানে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান করবেন।

১০. প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদে ভাষণ দিতে পারবেন। এমনকি প্রয়োজনে পরিষদে এক বা একাধিক বার্তা পাঠাতে পারবেন।

১১. জাতীয় পরিষদের সদস্যরা দুইজন সদস্যকে স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত করবেন।

১২. জাতীয় পরিষদের অধিবেশন চলাকালে কোনো সদস্য স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে কোরাম সংকটের কারণে স্পীকার অধিবেশন কাজ বন্ধ বা মুলতবি রাখতে পারবেন।

১৩. জাতীয় পরিষদের কোনো কাজের বৈধতা কোনো আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না।

১৪. স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার এবং অন্য সদস্যরা প্রেসিডেন্ট যে রকম আদেশ দিবেন সে অনুসারে ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ভোগ করবেন।

১৫. পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে বলা হয় পাকিস্তান একটি ফেডারেল প্রজাতন্ত্র হবে এবং তা পাকিস্তান ইসলামি প্রজাতন্ত্র নামে অভিহিত হবে। পাকিস্তান সৃষ্টির ভিত্তি হবে ইসলামি আদর্শবাদ। জনসংখ্যা ও প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট মেয়াদ পরপর ফেডারেল ও প্রাদেশিক পরিষদ সমূহের নির্বাচনের ব্যবস্থার মাধ্যমে গণতন্ত্রের মূলনীতিসমূহের অনুসরণ নিশ্চিত করা হবে। জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বৈষম্য দুর করা হবে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা দেওয়া হবে। আইন তৈরির

ক্ষমতা, প্রশাসনিক এবং আর্থিক ক্ষমতা সহ সকল ক্ষমতা ফেডারেল সরকার এবং প্রদেশসমূহের মধ্যে এমনভাবে ভাগ করা হবে যাতে প্রদেশগুলো সর্বাধিক পরিমাণে স্বায়ত্তশাসন পায়।

১৬. শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনায় থাকবে পাকিস্তানের মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ অনুসারে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী জীবন গড়ে তুলবে। সংখ্যালঘুরা অবাধে তাদের ধর্ম পালন করতে পারবে।

১৭. জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহই হবে জাতীয় ও প্রাদেশিক পর্যায়ে প্রথম আইন পরিষদ।

১৮. জাতীয় পরিষদ তার প্রথম অধিবেশনের ১২০ দিনের মধ্যে শাসনতন্ত্র বিল নামে একটি বিলের আকারে শাসনতন্ত্র তৈরি করবেন এবং তা করতে ব্যর্থ হলে পরিষদ বাতিল হয়ে যাবে।

১৯. জাতীয় পরিষদের পাশ করা শাসনতন্ত্র বিল প্রেসিডেন্টের অনুমোদনের জন্য পেশ করা হবে। শাসনতন্ত্র যদি প্রেসিডেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত না হয় তাহলে জাতীয় পরিষদ বাতিল হয়ে যাবে।

আইনগত কাঠামো আদেশে ভবিষ্যৎতের সংবিধান সম্বন্ধে যথেষ্ট দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়। কিন্তু এই আদেশের ২০ নং ধারায় সংবিধানের মূল ছয়টি নীতি বেঁধে দেয়া হয়। এসব নীতি ছিল– ১. ফেডারেল পদ্ধতির সরকার, ২. রাষ্ট্রের ভিত্তি ইসলামী আদর্শ, ৩. প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনে জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি নির্বাচন, ৪. মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা, ৫. নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিভিন্ন এলাকার মধ্যেকার অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বৈষম্য দূর, ৬. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত। আইনগত কাঠামো আদেশে অনেক খুঁটিনাটি বিষয় উল্লেখ করা হলেও সংবিধান বিল কিভাবে গ্রহণ করা হবে তা পরিষদের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়।

আইনগত কাঠামো আদেশের প্রতিক্রিয়া

আইনগত কাঠামো আদেশের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যে জাতীয় সংসদের রূপরেখা ঘোষণা করেন তা ছিল এক দুর্বল জাতীয় সংসদ। জাতীয় সংসদের অস্তিত্ব নির্ভরশীল ছিল প্রেসিডেন্টের ইচ্ছার উপর। একশত বিশ দিনের মধ্যে সংবিধান প্রণয়ন ও তাতে প্রেসিডেন্টের সম্মতি নিতে ব্যর্থ হলে সে জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত হয়ে যাবে, সে সংসদকে সার্বভৌম বলা যায় না। বস্তুত আইয়ুব খানের ন্যায় ইয়াহিয়া খানের বিশ্বাস ছিল যে, নির্বাচনে কোনো দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারবে না। এই বিশ্বাস থেকেই তিনি আইন কাঠামো আদেশ সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আশ্বাস দিয়ে একশত বিশ দিনের বাধ্যবাধকতা জুড়ে দেন।[৩৯]

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কর্তৃক আইনগত কাঠামো আদেশ ঘোষিত হওয়ার পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।

[৩৯] মাহবুবুর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (১৯৪৭-৭১), সময় প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ২১৫

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যপন্থী রাজনৈতিক দল

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কর্তৃক আইনগত কাঠামো ঘোষিত হওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির ১ এপ্রিল ১৯৭০ ঢাকায় দুই দিন ব্যাপী জরুরী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান। বৈঠক শেষে গৃহিত প্রস্তাবে জনগণের গণতান্ত্রিক আশা আকাঙ্ক্ষা বানচালের ফলে যে গুরুতর পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে তা এড়ানোর জন্য আইনগত কাঠামো নির্দেশ যথাযথভবে সংশোধনের আহবান জানানো হয়।[৪০] পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ শাসনতন্ত্রের মূলনীতির কাঠামো সম্পর্কিত নির্দেশের কতিপয় বিধান সম্পর্কে বিশেষ করে ২৫ ও ২৭ নং ধারা সম্পর্কে গভীর দুঃখ প্রকাশ করে উক্ত নির্দেশকে গণতন্ত্রের মূলনীতির সাথে সংগতিপূর্ণ করে সংশোধন করার জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি আহবান জানানো হয়।[৪১] আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ১ মে হাতিয়াতে এক জনসভায় বক্তৃতাকালে তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের প্রতি জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাস্বরূপ আইন পরিষদের সার্বভৌমত্বের নিশ্চয়তা বিধানের জন্যে আইনগত কাঠামোর ২৫, ২৬ ও ২৭ নম্বর ধারা সংশোধনের আহবান জানান।[৪২] নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে এক গৃহিত প্রস্তাবে প্রেসিডেন্টকে অবিলম্বে আইনগত কাঠামো নির্দেশ সংশোধনের আহবান জানিয়ে জনগণের ভুল বুঝাবুঝি দূর করার জন্য বলা হয়।[৪৩] লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন কমিটির সম্পাদক ও জাতীয় প্রগতি লীগের নেতা জনাব এম এ সামাদ এক বিবৃতিতে বলেন যে, আইনগত কাঠামোর নির্দেশে কেবলমাত্র জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে ব্যর্থতার পরিচয় দেওয়া হয়নি। এর কতিপয় ধারায় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়েছে।[৪৪] জাতীয় প্রগতি লীগের বৈঠকে গৃহিত এক প্রস্তাবে ১৯৭০ সালের আইনগত কাঠামো নির্দেশ অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়। কেননা এটি জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।[৪৫] জাতীয় প্রগতি লীগের সভাপতি আতাউর রহমান খান ৮ জুন ১৯৭০ সালে খুলনার হাদিস পার্কে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বলেন, আইনগত কাঠামো মেনে নিয়ে নির্বাচনে গেলে কোনোই ফল হবে না। তথাপিও তাঁর দল নির্বাচনে অংশ নিবে।[৪৬] কিন্তু ১৬ জুন ১৯৭০ সালে ঢাকার শান্তিনগরে আতাউর রহমান খান তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্ত বাতিল করে ঘোষণা করেন, আইনগত কাঠামো আদেশ বাতিল না করলে তাঁর দল নির্বাচনে অংশ নিবে না।[৪৭] খেলাফতে রব্বানী পার্টির প্রেসিডিয়ামের এক অধিবেশনে বলা হয় যে, আইনগত কাঠামো আদেশে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের অধিকার সংকুচিত করা হয়েছে।[৪৮] ঢাকায় জাতীয় প্রগ্রেসিভ লীগের প্রস্তুতি কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় প্রগ্রেসিভ লীগের সভাপতি জনাব আতাউর রহমান খান। সভায় প্রেসিডেন্টের ঘোষিত আইনগত কাঠামো আদেশটি জনগণের জন্য অগ্রহণযোগ্য হওয়ায় তা

[৪০] *দৈনিক পাকিস্তান*, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২ এপ্রিল ১৯৭০
[৪১] *দৈনিক আজাদ*, ২ এপ্রিল ১৯৭০
[৪২] *দৈনিক পাকিস্তান*, ২ মে ১৯৭০
[৪৩] *ঐ*, ৮ জুন ১৯৭০
[৪৪] *দৈনিক আজাদ*, ২ এপ্রিল ১৯৭০
[৪৫] *ঐ*, ৪ এপ্রিল ১৯৭০
[৪৬] *দৈনিক পাকিস্তান*, ৯ জুন ১৯৭০
[৪৭] *ঐ*, ১৭ জুন ১৯৭০
[৪৮] *দৈনিক আজাদ*, ৪ এপ্রিল ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যাখ্যান করে একটি সার্বভৌম গণপরিষদ গঠনের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আহবান জানানো হয়। জনাব আতাউর রহমান খান বলেন যে, আইনগত কাঠামো আদেশের কয়েকটি ধারা অগণতান্ত্রিক, স্বেচ্ছাচারমূলক ও পরস্পরবিরোধী। এ কারণে জনগণ এটিকে ভবিষ্যৎ নির্বাচনে ও শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না।[৪৯] জনাব আতাউর রহমান ৩ মে কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে এক জনসভায় বলেছেন, আইনগত কাঠামো নির্দেশ কেবল নিজেদের শাসনতন্ত্র রচনার ব্যাপারে জনসাধারণের সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করা হয়নি বরং জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দেশপ্রেমের প্রতিও অনাস্থার পরিচয় তুলে ধরে।[৫০] ১৬ জুন ১৯৭০ সালে ন্যাশনাল প্রগ্রেসিভ লীগের প্রধান জানিয়েছেন যে, শাসনতন্ত্রের আইনগত কাঠামো প্রত্যাহার করা না হলে তাঁর দল আগামী ৫ অক্টোবরের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না।[৫১] পূর্ব পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক প্রধান জনাব আবদুস সালাম খান আইন কাঠামোতে বর্ণিত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার যোগ্যতা সংক্রান্ত কতিপয় বিধি বিধান শিথিল করার আহবান জানিয়েছেন। তিনি বলেন যাদের স্বামী বা স্ত্রী শিক্ষকতা করেন কিংবা সমাজকল্যাণ কাজে নিয়োজিত রয়েছেন তাদের স্বামী বা স্ত্রীদের বেলায় নির্বাচনে প্রার্থী হতে নিষেধাজ্ঞা থাকা উচিত নয়। তিনি আরো বলেন, অথচ যে সব লোক সরকারি চাকুরি করেন অথবা যাদের স্বামী বা স্ত্রী প্রশাসনিক বা বিচার বিভাগীয় কাজে নিয়োজিত রয়েছেন তাদের স্ত্রী বা স্বামীদের ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা ঠিকই হয়েছে।[৫২] পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রধান নূরুল আমীন আইনগত কাঠামো আদেশ ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় করাচী প্রেস ক্লাবে বলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আইনগত কাঠামো আদেশ ঘোষণার মাধ্যমে জাতির প্রতি প্রদত্ত তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা এবং পাকিস্তানের গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও জনগণের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার কর্মপন্থা গ্রহণ করেছেন। তিনি আরো বলেন প্রেসিডেন্ট তাঁর ভাষণে যে কোনো মূল্যে পাকিস্তানের অখণ্ডতা আদর্শ ও বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখার সংকল্প ঘোষণা করেছেন যা একটি শুভ পদক্ষেপ ও পরম স্বস্তির বিষয়। নতুন শাসনতন্ত্রের ফেডারেল বৈশিষ্ট্যের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতার নিশ্চিয়তা প্রদান করায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।[৫৩] জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি জনাব নুরুল হক এবং সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুল মান্নান সংবাদপত্রে প্রেরিত এক যুক্ত বিবৃতিতে প্রেসিডেন্টের আইনগত কাঠামো আদেশের ২৫ ও ২৭ নং ধারা প্রত্যাহারের দাবি জানান।[৫৪] ১৩ এপ্রিল পিপলস পার্টি প্রধান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো করাচিতে আইনগত কাঠামোর পক্ষে বলেন, শুধু এর ব্যাখ্যা নিয়েই সমস্যা হয়েছে। তিনি বলেন, তেরশত বছরে ইসলামের ব্যাখ্যা নিয়ে মুসলমানেরা কখনো এক হতে পারেনি। আজও এই ব্যাখ্যা নিয়ে এক হতে পারে না।[৫৫]

---

[৪৯] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৪ এপ্রিল ১৯৭০; *দৈনিক আজাদ*, ৬ এপ্রিল ১৯৭০
[৫০] *দৈনিক পাকিস্তান*, ৪ মে ১৯৭০
[৫১] *দৈনিক পাকিস্তান*, ৪ মে ১৯৭০
[৫২] *ঐ*, ২২ মে ১৯৭০
[৫৩] *দৈনিক আজাদ*, *দৈনিক ডন*, ১ এপ্রিল ১৯৭০
[৫৪] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১০এপ্রিল ১৯৭০
[৫৫] *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৪ এপ্রিল ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

বামপন্থী রাজনৈতিক দল

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি প্রধান মওলানা ভাসানী এক বিবৃতিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ভাষণের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, জাতীয় পরিষদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে প্রেসিডেন্টের ব্যাখ্যা তাকে অত্যন্ত ব্যথিত করেছে। প্রেসিডেন্টের ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক পাকিস্তানির এই ধারণা হবে যে, শাসনতন্ত্রের চূড়ান্ত কাঠামোর ব্যাপারে নির্বাচিত সদস্যদের কোনো কথা বলার অধিকার থাকবে না। তিনি আরো বলেন, আসন্ন নির্বাচন দেশের দুই অংশের মধ্যে স্থায়ী ঘৃণা ও অসন্তোষ সৃষ্টি করবে।[৫৬] পূর্ব পাকিস্তান ভাসানী পন্থী ন্যাপের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় সরাসরিভাবে আইনগত কাঠামো আদেশ প্রত্যাখ্যান করা হয়। ন্যাপ ওয়ার্কিং কমিটি নির্বাচনের পূর্বে ১৯৪০ সালের পাকিস্তান প্রস্তাবের স্বায়ত্তশাসন, সার্বভৌম পার্লামেন্ট এবং কৃষক ও শ্রমিকদের জন্য আসন সংরক্ষণের দাবি করেন।[৫৭] পূর্ব পাকিস্তান ন্যাপ ওয়ালী সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ এবং সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেন এক বিবৃতিতে বলেন যে, আসন্ন সাধারণ নির্বাচন এবং শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট যে আইনগত কাঠামো ঘোষণা করেছেন এতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য একটি সার্বভৌম গণপরিষদ গঠনের জন্য দেশবাসীর দাবির প্রতি মরণ আঘাত হানা হয়েছে।[৫৮] পূর্ব পাকিস্তান ন্যাপ ওয়ালী সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ পল্টনে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় আইনগত কাঠামোকে সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য বলে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, উক্ত আইনগত কাঠামো আদেশের ২০, ২৫ ও ২৭ তিনটি অগণতান্ত্রিক ধারার সঙ্গে জাতীয় পরিষদের সার্বভৌমত্ব খর্ব করা হয়েছে এবং পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির রিকুইজিশন পন্থী সাধারণ সম্পাদক জনাব মাহমুদুল হক ওসমানী করাচীতে বলেন যে, নতুন জাতীয় পরিষদ সার্বভৌম করার জন্য ১৯৭০ সালের আইনগত কাঠামো আদেশ সংশোধনের দাবি জানান।[৫৯] এরকম জাতীয় পরিষদ পূর্ববাংলার আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করতে সক্ষম হয়।[৬০] শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের খান সাইফুর রহমানের সভাপতিত্বে দলের কার্যনির্বাহী কমিটির দু'দিন ব্যাপী এক সভা শেষে আইনগত কাঠামো প্রত্যাহার না করলে নির্বাচনে অংশগ্রহণে তাঁরা অপারগ বলে ঘোষণা করেন।[৬১]

ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল

পূর্ব পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম লীগের নির্বাচনী কমিটির আহবায়ক জনাব এ বি এম শফিকুল ইসলাম এক বিবৃতিতে প্রেসিডেন্টকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি বলেন পাকিস্তানের ভাবী শাসনতান্ত্রিক আইনগত কাঠামো সম্পর্কে প্রেসিডেন্টের ঘোষণার প্রতি জাতির মনোভাব প্রশংসাযোগ্য। এতে জনগণের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে তাঁর দৃঢ়তা ও

[৫৬] *দৈনিক পাকিস্তান*, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ এপ্রিল ১৯৭০
[৫৭] *দৈনিক আজাদ*, ১৩ এপ্রিল ১৯৭০
[৫৮] *দৈনিক আজাদ*, ২ এপ্রিল ১৯৭০
[৫৯] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১০ এপ্রিল ১৯৭০
[৬০] *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৭ এপ্রিল ১৯৭০
[৬১] *ঐ*, ২৭ জুন ১৯৭০

আন্তরিকতা পুনঃপ্রমাণিত হয়েছে।[৬২] পাকিস্তান মুসলিম লীগ প্রধান খান আবদুল কাইয়ুম খান ২৫ এপ্রিল রংপুরে এক জনসভায় বলেন যে, আইনগত কাঠামো সংশোধন বা প্রত্যাহার যারা দাবি করছেন, তাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে কেন্দ্রকে দুর্বল করা।[৬৩] পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামির আমির অধ্যাপক গোলাম আযম ২৭ এপ্রিল সিলেটে বলেন যে, ইসলামি জনতার চাপে যারা প্রকাশ্যে ইসলাম বিরোধি মতবাদ প্রচার করতে ভয় পান তারাই কৌশলে ইসলামি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার জন্য আইনগত কাঠামো সংশোধনের ধুয়া তুলেছেন।[৬৪] কনভেনশনপন্থী মুসলিম লীগ আইনগত কাঠামোর সমালোচনা করে ১৩ এপ্রিল লাহোরে কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় প্রস্তাব গ্রহণ করে।[৬৫] পূর্ব পাকিস্তান জমিয়াতুল উলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম কাউন্সিল আইনগত কাঠামো আদেশের ৫টি মূলনীতিকে অভিনন্দন জানায়। প্রেসিডেন্ট এই মূলনীতির আলোকে শাসনতন্ত্র অনুমোদন করবেন বলে কাউন্সিল আস্থা ও আশা প্রকাশ করে।[৬৬]

ছাত্র সংগঠনসমূহ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ সভাপতি জনাব তোফায়েল আহমেদ প্রেসিডেন্টের নিকট শাসনতন্ত্রের আইনগত কাঠামো আদেশের ২৫ ও ২৭ নং ধারা বিলুপ্তির আবেদন জানিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন, এক ইউনিটের বিলুপ্তি, এক ব্যক্তি এক ভোট জাতীয় বিভিন্ন ব্যবস্থার মাধ্যমে একের পর এক প্রধান সমস্যা সামাধান করে সাধারণ নির্বাচনের ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রচেষ্টা জনগণ সর্বান্তঃকরণে অভিনন্দন জানালেও তারপর বহু প্রতীক্ষিত আইনগত কাঠামো জনগণকে আশাহত করেছে।[৬৭] পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ গণপ্রতিনিধিদের দেশের সাড়ে বার কোটি মানুষের আশা আকাংখা অনুযায়ী একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সুযোগ দানের জন্য ২৮ মার্চ ঘোষিত আইনগত কাঠামো আদেশ বাতিল করে গণপরিষদের সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি সম্বলিত গণতান্ত্রিক আদর্শের পরিপূরক একটি নতুন আইনগত কাঠামো আদেশ ঘোষণার জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি আহবান জানান। ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির এক জরুরী সভায় প্রেসিডেন্টের আইনগত কাঠামো আদেশ বিস্তারিত বিশ্লেষণ শেষে গৃহীত এক প্রস্তাবে এ আহবান জানানো হয়। এ প্রস্তাবে অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, প্রেসিডেন্টের ঘোষিত আইনগত কাঠামো নির্দেশের ২৫ নং ধারা (শাসনতন্ত্র বিলে প্রেসিডেন্ট সম্মতি না দিলে জাতীয় পরিষদ বিলুপ্ত হবে) "পরিষদের সার্বভৌমত্বের প্রতি নিঃসন্দেহে অনাস্থাস্বরূপ"। প্রস্তাবে বলা হয়, উক্ত আদেশের ২৭ নং ধারায় আইনগত কাঠামোর ব্যাখ্যা দান বা সংশোধনের অধিকার জাতীয় পরিষদের নয়–একমাত্র প্রেসিডেন্টের এখতিয়ারধীন রাখাও অনভিপ্রেত ও অসমীচীন। প্রস্তাবে আরো বলা হয় যে, এই আইনগত কাঠামো শুধু 'গণতন্ত্রের মূলনীতির পরিপন্থী" নয় এটি "জনগণের গণতান্ত্রিক বিবেককে প্রকাশ্যে অস্বীকার ও অবমাননার শামিল এবং গণপরিষদের সার্বভৌমত্ব ও মর্যাদার পক্ষে চরম অবমাননাকর। প্রস্তাবে দৃঢ়তার সঙ্গে বলা হয় যে, "শাসনতন্ত্রের মূলনীতি

[৬২] *দৈনিক আজাদ*, ২ এপ্রিল ১৯৭০
[৬৩] *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৭ এপ্রিল ১৯৭০
[৬৪] *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৯ এপ্রিল ১৯৭০
[৬৫] *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৪ এপ্রিল ১৯৭০
[৬৬] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১০ মে ১৯৭০
[৬৭] *ঐ*, ৫ এপ্রিল ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

ও মুখবন্ধ নির্ধারণের অধিকার একমাত্র গণপ্রতিনিধিদের রয়েছে।" প্রস্তাবের শেষ অংশে জাতীয় সংহতি ও সমৃদ্ধির প্রয়োজনেই ৬-দফা ও ১১-দফা বাস্তবায়িত হওয়া উচিত বলে মত প্রকাশ করা হয়।[৬৮] আইনগত কাঠামো আদেশ জারির মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র দিয়ে আবার গণতন্ত্র নিয়ে যাওয়ার আইনগত প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ এ্যাকশন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ৭ এপ্রিল এবং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) ১৩ এপ্রিল প্রতিরোধ দিবস পালন করে। আইনগত কাঠামো আদেশ ঘোষণার প্রতিবাদে বিভিন্ন সংগঠনের বিবৃতি, প্রতিবাদ ইত্যাদির পাশাপাশি ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন পৃথক পৃথক প্রচারপত্রও বের করে। [৬৯] ছাত্রলীগের প্রচারপত্রে বলা হয়-

> . . . ইয়াহিয়া ঘোষিত আইনগত কাঠামোতে একটি দিক লক্ষ্যণীয় যে পাকিস্তানে দুই অঞ্চলের সংহতি ও অখণ্ডতাকে জোর করিয়া চাপাইয়া দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বিশেষভাবে আইনগত কাঠামোর ২৫ নং বিধিতে গণপরিষদের উপর সন্দেহ প্রকাশ ও ২৭ নং বিধিতে ইয়াহিয়ার একনায়কতন্ত্রমূলক যে মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে তাহা সকলের মূলনীতি বিরোধী। দেশের আপামর জনসাধারণ সার্বিক মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমরা স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে চাই যে, ইয়াহিয়া প্রণীত এই নীতিমালা কোনভাবেই প্রদেশের সংগ্রামী মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।[৭০]

ছাত্র ইউনিয়নের প্রচারপত্রে বলা হয়-

> . . . ঘোষিত নির্বাচনী আইনগত কাঠামো আদেশ দ্বারা নির্বাচনী জাতীয় পরিষদকে কার্যতঃ পুরোপুরিভাবে "কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করণের তথাকথিত পরিষদে" পরিণত করা হইয়াছে এবং কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করিলে এই পরিষদ কর্তৃক শাসনতন্ত্র গৃহিত হইলেও উহাকে বাতিল করিবার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের হাতেই রাখিবার পাশাপাশি আইনও প্রণয়ন করা হইয়াছে। শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য নির্ধারিত পরিষদের সার্বভৌমত্ব বলিতে কিছুই নাই।[৭১]

ব্রিটেনস্থ পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশন সম্প্রতি ঘোষিত আইনগত কাঠামো আদেশের কতিপয় ধারা সংশোধনের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের প্রতি আহবান জানিয়েছে। ফেডারেশনের কাউন্সির সভা কর্তৃক সুপারিশকৃত গৃহীত এক প্রস্তাবে দুঃখ প্রকাশ করে বলা হয় যে, আইনগত কাঠামো আদেশের কতিপয় ধারা গণতন্ত্রের মূলনীতিকে লঙ্ঘন করেছে। প্রস্তাবে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য প্রস্তাবিত গণপরিষদের সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে আইনগত কাঠামো আদেশ সংশোধনের জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি আহবান জানানো হয়েছে।[৭২]

আইনগত কাঠামো আদেশ সংশোধন দাবির বিরোধিতা

কাউন্সিল মুসলিম লীগ, পিডিপি, জামায়াতে ইসলামি, জমিয়তে উলামায়ে পাকিস্তান, জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম, মারকাজি

---

[৬৮] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৪ এপ্রিল ১৯৭০

[৬৯] মোহাম্মদ হাননান, *ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস (১৮৩০-১৯৭১)*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯, পৃ. ৫৩২

[৭০] হাসান হাফিজুর রহামন ও অন্যান্য সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২১-৫২২

[৭১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২৩-৫২৫

[৭২] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ মে ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

সিরাত কমিটি, আঞ্জুমানে শরফরাসানে ইসলাম এবং সুন্নি মাহাদ এই আটটি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের আইনগত কাঠামোর ২৫ ও ২৭ নং ধারা বাতিলের বিরোধিতা করে।[৭৩]

আইনগত কাঠামো আদেশ সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের বক্তব্য

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠন কর্তৃক প্রেসিডেন্টের ঘোষিত আইনগত কাঠামো নিয়ে বিরূপ সমালোচনা হতে থাকে। অনিষ্টকর হবে না বলে যাকে একসময় মনে করা হয়েছিল সেই আইনগত কাঠামোর সামগ্রিক ফলাফল ছিল হতবুদ্ধিকর। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সবশেষে তাঁর মুখ খুলেছেন।[৭৪] শাসনতন্ত্র সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান মন্তব্য করেছেন- "শাসনতন্ত্র হচ্ছে একটি পবিত্র দলিল এবং একত্রে বসবাসের মৌলিক চুক্তি কোনো সাধারণ আইনের সঙ্গে তার তুলনা করা চলে না।[৭৫] ১৯৭০ সালের ৪ এপ্রিল আইনগত কাঠামো আদেশ সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট মন্তব্য করেন যে, জনগণের সার্বভৌমত্ব খর্ব করার কোনো ইচ্ছাই তাঁর নেই।[৭৬] ঢাকা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে তিনি বলেন, "আমি মনে করি না যে, কারো কোন সার্বভৌমত্ব খর্ব হয়েছে, আমার আকাংখা হচ্ছে জাতিকে গণতন্ত্রের দিকে পরিচালিত করা। সার্বভৌমত্বের ব্যাপারে জনগণকে আমি যে কথা বলে আসছিলাম এ পর্যন্ত আমার কাজের সাথে তার কোন বৈপরীত্য নেই।[৭৭] এক সপ্তাহব্যাপী পূর্ব পাকিস্তান সফর শেষে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান রাওয়ালপিণ্ডিতে যখন ফিরে যাচ্ছিলেন তখন তিনি বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের বলেন, মানুষে মানুষে পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থা থাকিলে যাহা লাভ করা যায়। আইনগত শব্দ বা ভাষা দ্বারা তাহা লাভ করা যায় না।[৭৮] সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আইনগত কাঠামো আদেশকে জনগণের বিরাট মুষ্টিমেয় কিছু লোক যারা এখানকার দু'একটি ব্যাপারে উৎকণ্ঠিত ছিল তারাও এর শতকরা ৯৯ ভাগ গ্রহণ করেছে। তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন যে, যদি আইনগত কাঠামোতে দেওয়া ব্যাপক মূলনীতি অনুযায়ী শাসনতন্ত্র রচিত হয় তাঁর তা অনুমোদন না করার কোন কারণ থাকবে না।[৭৯] প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আরো বলেন যে, যদি তাঁর প্রতি জাতির বিশ্বাস থাকে তাহলে জাতিকে অবশ্যই এটা অনুধাবন করতে হবে যে, আমি এসব হাসি তামাশার জন্য করছি না। তিনি তাঁর অনুমোদনের প্রামাণিকতা সম্পর্কে বলেন, এটি একটি পদ্ধতিগত আনুষ্ঠানিকতা মাত্র, অন্য কিছু নয়।[৮০] আইনগত কাঠামো আদেশ সংশোধন না হলে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না এমন প্রশ্নের উত্তরে ইয়াহিয়া খান বলেন, আইনগত কাঠামো সংশোধন না হলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না এমন কথা তাকে কোনো রাজনৈতিক দল বলেনি।[৮১]

---

[৭৩] *দৈনিক আজাদ*, ৪ মে ১৯৭০
[৭৪] এ্যান্থনী ম্যাসকারেনহাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮
[৭৫] বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪
[৭৬] *দৈনিক পাকিস্তান*, ৫ এপ্রিল ১৯৭০
[৭৭] *দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার*, ৫ এপ্রিল ১৯৭০
[৭৮] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১১ এপ্রিল ১৯৭০
[৭৯] *দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার* ও *দৈনিক পাকিস্তান*, ১১ এপ্রিল ১৯৭০
[৮০] *ঐ*, *দৈনিক পূর্বদেশ*, ১১ এপ্রিল ১৯৭০
[৮১] *দৈনিক পাকিস্তান*, ১১ এপ্রিল ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

তবে এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সেনাবাহিনীর একটি গ্রুপকে শান্ত রাখতে গিয়েই ক্ষমতা হাতে রেখে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। শক্তিশালী এই গ্রুপটি ছিল নির্বাচনের বিরুদ্ধে এবং নির্বাচনের পূর্বে সংবিধান প্রয়োগ করার পক্ষে। অবশ্য এই বিষয়টিতে ইয়াহিয়া বারবার শেখ মুজিবকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে, এ ধরনের কিছু ঘটবে না। শেখ মুজিব আরো সিদ্ধান্ত নেন যে একবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেলেই তার অবস্থা উন্নত হবে। তাতে ক্ষমতাসীন সামরিক জান্তা যে ক্ষমতাই প্রয়োগ করুক না কেন শেখ মুজিব উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে নির্বাচনের মাধ্যমে তিনি তাঁর দলের ক্ষমতা সংহত করতে পারবেন যা এতদিন যাবৎ শৃঙ্খলা এবং সংহতির অভাবের সম্মুখীন হয়েছে। এছাড়া নির্বাচন হলে শেখ মুজিব তাঁর নেতৃত্বে বৈধতা এবং দরকষাকষির ক্ষমতা বাড়ানোর কথা বিবেচনায় রেখেছিলেন। তিনি আরো চিন্তা করলেন নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলে ক্ষমতার আইনগত কর্তৃত্ববিহীন সেনাবাহিনী তাঁর সঙ্গে ঐক্যমত্যে না আসলেও বিশ্বজনমত শেখ মুজিবের পক্ষেই থাকবে। শেষ পর্যন্ত এই কৌশলকে সামনে রেখেই আইনগত কাঠামো আদেশের বিরুদ্ধে ব্যাপক সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও শেখ মুজিব নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন।[৮২]

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঘোষিত আইনগত কাঠামো আদেশের বিরূপ সমালোচনা হলেও ভাসানী ন্যাপ ব্যতীত অন্য সকল রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচনে ব্যাপক জনসমর্থন বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন। এরপর সকল রাজনৈতিক দল তাদের নির্বাচনী কর্মকাণ্ড পুরোপুরিভাবে শুরু করে এবং একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও গণতান্ত্রিক নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যায়।

[৮২] মওদুদ আহমদ, অনুবাদ জগলুল আলম, *বাংলাদেশ: স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা*, ঢাকা, ইউপিএল, ১৯৯২, পৃ. ১৬০

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

নির্বাচন ব্যবস্থাপনা

১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ আইয়ুব খানের নিকট থেকে ক্ষমতা গ্রহণের পর ২৬ নভেম্বর ১৯৬৯ সালে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন যে, যত শীঘ্র সম্ভব তিনি প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। এই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাজ হবে দেশকে একটি ব্যবহারযোগ্য শাসনতন্ত্র দেয়া এবং যেসব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা গণমনকে আলোড়িত করেছে তার একটা সমাধান বের করা। সেদিক থেকে ইয়াহিয়া খানের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন এবং প্রথমবারের মত বাঙালিদেরকে এক ব্যক্তি এক ভোট এর ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে তাদের ন্যায্য অংশ প্রদানের প্রতিশ্রুতি ছিল এক হিসেবে পাকিস্তানের রাজনীতিতে এক বৈপ্লবিক ঘটনা। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তাঁর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য অর্থাৎ একটি সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন ব্যবস্থাপনার আওতায় কিছু পদক্ষেপ নেন। এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন নিয়োগ থেকে শুরু করে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ পর্যন্ত সকল বিষয় এর আওতায় পড়ে।

এ অধ্যায়ে নির্বাচন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয় যেমন নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা থেকে শুরু করে নির্বাচন কমিশন নিয়োগ, নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়ন, তফসিল ঘোষণা, নির্বাচনী প্রতীক, ভোটদান পদ্ধতি, নির্বাচনী আচরণ বিধি, ফলাফল প্রকাশের পদ্ধতি সকল বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা

জেনারেল ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের শাসনভার গ্রহণের পর শীঘ্র নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা দিলে পাকিস্তানের জনগণ তা সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করে। জাতির উদ্দেশ্যে প্রথম যেদিন ভাষণ দেন সেদিন তিনি অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে নির্বাচন কিভাবে এবং কখন হবে সে সম্পর্কেও একটি ধারণা দেন। পাকিস্তানের উভয় অংশে তাঁর এ ভাষণ প্রশংসিত হয়। জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর ঘোষণা করেন যে, ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর দেশে জাতীয় পরিষদের এবং ২২ অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।[১] উক্ত জাতীয় পরিষদের কাজ হবে দেশের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করা। একই সাথে তিনি ঘোষণা করেন সুষ্ঠুভাবে নির্বাচনের লক্ষ্যে তিনি একটি আইনগত কাঠামো আদেশ জারি করবেন। যেখানে আগামী নির্বাচন ও শাসনতন্ত্র সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা থাকবে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালের ২৮ মার্চ জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণে উক্ত নির্বাচনের আইনগত কাঠামো আদেশ এর মূলধারাগুলো ঘোষণা করেন। উক্ত আদেশে নির্বাচন ও জাতীয় পরিষদ গঠন ও এর কার্যাবলি কেমন হবে তা ঘোষণা করেন। প্রেসিডেন্টের এই ঘোষণার ফলে পাকিস্তানের সকল রাজনৈতিক দলগুলো একে

[১] *দৈনিক আজাদ, দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ সভেম্বর ১৯৬৯

Dhaka University Institutional Repository

আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করে। তারা এ ভেবে খুশি হয় যে দীর্ঘদিন পর পাকিস্তানে একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। যার মধ্য দিয়ে সামরিক শাসনের অবসান ঘটবে এবং জনসাধারনের প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রেসিডেন্টের এই ঘোষণার ফলে সারাদেশে নির্বাচনী আমেজ শুরু হয়ে যায়। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবল বন্যা হয়। বন্যার জন্য ভোটারদের ভোট দানে অসুবিধার কথা বিবেচনা করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ঠিক করেন ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ নির্দিষ্ট হয় ১৭ ডিসেম্বর।[২]

এ নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ায় কোনো কোনো রাজনৈতিক দল বিশেষ করে বাম ও ডানপন্থী দলগুলো খুশি হয়। কেননা তারা মনে করে এতে তারা লাভবান হবে। নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ায় অনেক রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ প্রেসিডেন্টকে অভিনন্দন জানিয়ে বিবৃতি প্রদান করে। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং কাউন্সিল মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য তোফাজ্জল আলী এক বিবৃতিতে নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তনের সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, প্রেসিডেন্ট কেবল জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন নি তিনি নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকারের অসুবিধাও উপলদ্ধি করেছেন।[৩] ভাসানী পন্থী পুর্ব পাকিস্তান ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক মমিনুর রহমান বলেন, ডিসেম্বর মাস নির্বাচনের জন্য উপযুক্ত নয়। কেননা পূর্ব পাকিস্তানে এ সময় ফসল কাটা হয় এবং পশ্চিম পাকিস্তান এ সময় বরফাবৃত থাকে।[৪] পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম এর সভাপতি পীর মোহসেন উদ্দিন বলেন, দেশের সর্বনাশা বন্যা পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন করে প্রেসিডেন্ট অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন।[৫] পাকিস্তান কনভেনশন মুসলিম লীগের যুগ্ম সম্পাদক এ মতিন মন্তব্য করেন যে, বন্যা পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে প্রেসিডেন্ট উত্তম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।[৬] পাকিস্তান জাতীয় লীগের যুগ্ম সম্পাদক ইকবাল আনসারী বলেন, নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তনের ফলে জনমতের জয় এবং কায়েমী স্বার্থবাদীদের পরাজয় সূচিত হয়েছে।[৭] পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রধান নূরুল আমীন বলেন, নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন করে প্রেসিডেন্ট প্রদেশের জনগণের দাবী দাওয়ার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন এবং বন্যার্তদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও সমবেদনার পরিচয় দিয়েছেন।[৮]পাকিস্তান মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক খান আবদুস সবুর খান মন্তব্য করেন যে, তাঁর দল পাকিস্তানের সংহতি অখণ্ডতা ও একত্রে বিশ্বাসী এবং তা অক্ষুন্ন রাখতে বদ্ধপরিকর। তিনি বলেন নির্বাচন জানুয়ারির শেষ কিংবা ফেব্রুয়ারির প্রথম ভাগ পর্যন্ত পিছিয়ে দিলে ভালো হতো। কেননা ডিসেম্বরের মধ্যে বন্যা উপদ্রুতের পুর্নবাসন শেষ হবে না এবং সেপ্টেম্বর মাসে আবার বন্যার আশংকা রয়েছে বলে প্রেসিডেন্টও উল্লেখ করেছেন।[৯] আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ

[২] *দৈনিক আজাদ*, ১৬ আগস্ট ১৯৭০
[৩] *ঐ*, ১৭ আগস্ট ১৯৭০
[৪] *ঐ*
[৫] *ঐ*
[৬] *ঐ*
[৭] *ঐ*
[৮] *ঐ*, ১৬ আগস্ট ১৯৭০
[৯] *দৈনিক পাকিস্তান*, ২১ আগস্ট ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

মুজিবুর রহমান বলেন, নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ায় আওয়ামী লীগের অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটবে না। তিনি ঘোষণা করেন তাঁর দল নির্বাচন বানচাল করার যে কোনো প্রচেষ্টাকেই প্রতিহত করবে। বন্যার প্রেক্ষিতে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার দাবীদারদের সমালোচনা করে বলেন, এর দ্বারা তারা বন্যার্তদের কোনো উপকারই করেননি। নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার অন্যতম দাবীদার একজন নেতা এখন মস্কো সফর করে বেড়াচ্ছেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন।[১০] সাবেক প্রাদেশিক পরিষদের স্পীকার ও পূর্ব পাকিস্তান কনভেনশন মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট জমির উদ্দিন প্রধান নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে গৃহীত প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানান।[১১] পূর্ব পাকিস্তান গণ ঐক্য আন্দোলনের চেয়ারম্যান বি.ডি হাবিবুল্লাহ প্রেসিডেন্টের এই সিদ্ধান্তকে বিজ্ঞজনোচিত সিদ্ধান্ত বলে মন্তব্য করেছেন।[১২]

নতুন নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পর যখন সকল রাজনৈতিক দল তাদের নির্বাচনী প্রচারণা কাজে পুরোপুরি মগ্ন তখন ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণ বাংলার উপর দিয়ে বয়ে যায় এক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস। এতে অসংখ্য লোকের প্রাণহানি ঘটে। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের পর আবারো বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচন পিছিয়ে দেয়ার দাবি জানাতে থাকে। একমাত্র আওয়ামী লীগ ব্যতীত অন্য সকল দল এর পক্ষে ছিল। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান শেষ পযন্ত দুর্গত এলাকার জন্য নতুন নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনের পূর্বের তারিখ বহাল রাখেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের কিছু নির্বাচনী এলাকায় জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহের নির্বাচন অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ কথা সরকারি প্রেসনোট থেকে জানা যায়। আইনগত কাঠামো আদেশ সংশোধন করে বলা হয় ডিসেম্বর মাসে খারাপ আবহাওয়া ও বিভিন্ন এলাকার অধিবাসীদের বাসস্থান পরিবর্তনের ফলে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের যে সব নির্বাচনী এলাকা নির্বাচন অনুষ্ঠানের অনুপযোগী বলে বিবেচিত হবে সে সব এলাকায় ১৯৭০ সালের ৩১ অক্টোবরের পূর্বে নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এ ঘোষণায় আরো বলা হয় নির্বাচন অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত হলেও ভোট গণনা ও তার ফলাফল মূল নির্বাচনের সঙ্গে একযোগে ডিসেম্বর মাসে ঘোষণা করা হবে।[১৩] কিন্তু পরবর্তীতে এ সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়। নির্বাচন কমিশনার জানায় যে, পূর্ববর্তী ঘোষণা অনুযায়ী ডিসেম্বর মাসে সারাদেশে একসাথে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।[১৪] এ সিদ্ধান্ত বাতিল করার পিছনে কারণ হিসেবে জানা যায় যে, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের কোনো কোনো এলাকায় অক্টোবরে নির্বাচন একটি বিতর্কমূলক রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। কোনো কোনো রাজনৈতিক দল এ সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানালেও কিছু দল এর তীব্র সমালোচনা করে।[১৫]

---

[১০] *দৈনিক পাকিস্তান*, ২১ আগস্ট ১৯৭০
[১১] *ঐ*, ১৮ আগস্ট ১৯৭০
[১২] *ঐ*
[১৩] *ঐ*, ২৩ আগস্ট ১৯৭০
[১৪] *ঐ*, ২৯ আগস্ট ১৯৭০
[১৫] *ঐ*, ২৮ আগস্ট ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচন কমিশন গঠন

একটি গণতান্ত্রিক দেশের নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য একটি স্বাধীন নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন জরুরী প্রয়োজন। নির্বাচন কমিশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি কিভাবে একটি সুষ্ঠু অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করা যায় তার সামগ্রিক অবস্থা তত্ত্বাবধান করেন। তাই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রথমেই একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করেন। ১৯৬৯ সালের ২ জুলাই ইয়াহিয়া খানের ঘোষণা অনুযায়ী পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টের একজন বাঙালি বিচারক বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের নেতৃত্বে একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়।[১৬] জি ডব্লিউ চৌধুরীর মতে-

> তিনি একটি অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন। কোনো পর্যায়েই নির্বাচন কমিশন চাপের সম্মুখীন হয়নি এবং এমনকি কোনো ইংগিত দেয়া হয়নি কিভাবে এর কাজ চালিয়ে যেতে হবে। বিচারপতি সাত্তার আন্তরিকভাবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে একটি রাজনৈতিক ফয়সালার ব্যাপারে আশান্বিত ছিলেন এবং মনে হচ্ছিল তিনি তাঁর সম্পূর্ণ মুক্ত স্বাধীন ভূমিকা নিয়ে পুরোপুরি তুষ্ট ছিলেন। ইয়াহিয়া খান তাকে সব রকমের সৌজন্য ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন, কোনো কোনো সময় বিচারপতি সাত্তারকে মন্ত্রিসভার যে সব বৈঠকে নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হতো সেখানে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানিয়ে নেয়া হত; তাঁর মতামত এবং সুপারিশের প্রতি সব সময়েই খুব অগ্রাধিকার ও মনোযোগ দেয়া হত।[১৭]

ভোটার তালিকা প্রণয়ন

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশন গঠনের পর তাদেরকে দায়িত্ব দেয়া হয় কিভাবে একটি সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন করা যায় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনসাধারণের প্রতিনিধি নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ভোটার তালিকা প্রণয়নের জন্য প্রেসিডেন্ট একটি নির্দেশ জারী করেন। যা ১৯৬৯ সালের ভোটার তালিকা নির্দেশ নামে অভিহিত। এই নির্দেশ অনুযায়ী প্রধান নির্বাচন কমিশনারের ক্ষমতা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া স্টাফ ও রেজিস্ট্রেশন অফিসারদের নিয়োগ এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই নির্দেশ অনুযায়ী প্রণীত ভোটার তালিকার বৈষম্য কিংবা সে অনুযায়ী কোনো বিবরণী বা কার্যক্রমের আইনানুগ দিক সম্পর্কে আদালতে কোনো প্রশ্ন তোলা যাবে না। প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ভোটার তালিকায় অর্ন্তভুক্ত হওয়ার উপযুক্ত যে কোনো নাম ভোটার তালিকাভুক্ত করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।[১৮] এ নির্বাচন কমিশনের প্রাথমিক কাজ ছিল একটি সর্বজনীন ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা। ভোটার তালিকা প্রস্তুত ছাড়াও তাঁর দায়িত্ব ছিল নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ। নির্বাচন কমিশন সাফল্যের সাথে এ কাজ সমাপ্ত করেছিল। নির্বাচন কমিশনের সর্বপ্রথম কাজ ছিল এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া যে, ১৯৭০ সালের নির্বাচনের জন্য আইয়ুবীয় পদ্ধতির অধীনে যে ভোটার তালিকা প্রস্তুত হয়েছিল তা গ্রহণ করবে কিনা। বর্তমান ভোটার তালিকা গ্রহণের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল আইয়ুবের নির্বাচন পদ্ধতি ছিল পরোক্ষ

---

[১৬] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *বাংলাদেশ: জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব*, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ২০০০, পৃ. ১৬৪

[১৭] জি.ডব্লিউ চৌধুরী, সিদ্দীক সালাম অনুদিত, *অখণ্ড পাকিস্তানের শেষ দিনগুলি*, ঢাকা, হক কথা প্রকাশনী, ১৯৯১, পৃ.১০৫-১০৬

[১৮] *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৯ আগস্ট ১৯৬৯

সুতরাং এ ভোটার তালিকা প্রস্তত করা হয়েছিল মৌলিক গণতন্ত্রীদের নির্বাচনের উদ্দেশ্যে; প্রাদেশিক কিংবা কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্যদের নির্বাচনের জন্য নয়। আইয়ুব খানের অধীনে যে নির্বাচন কমিশন ছিল তাঁর নেতৃত্বে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন না বরং যে ছিলেন তিনি একজন কাযনির্বাহী কর্মকর্তা এবং কয়েক বছর আইয়ুব খানের সচিব ছিলেন। এই কমিশনের কাজ জনগণ কর্তৃক গৃহিত হয়নি। এসব বিষয় মাথায় রেখে বিচারপতি সাত্তার নতুন ভোটার তালিকা প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ১৯৬১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী সাড়ে এগারো কোটি লোক অধ্যুষিত দেশে ভোটার তালিকা প্রণয়ন খুব সহজ কাজ ছিল না। যার অধিকাংশ ছিল অশিক্ষিত এবং সুদূর গ্রামাঞ্চলে বসবাসরত যেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল খুবই খারাপ। প্রেসিডেন্ট নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়ন বিধি জারি করেন যাতে যথাযথভাবে ও জনগণের সন্তুষ্টি অনুযায়ী ভোটার তালিকা করা যায়। এতে বলা হয় ১৯৬৯ সালের ভোটার তালিকা আইন অনুসারে আবাসিক ভবনের অধিবাসীদের বিবৃতির উপর ভিত্তি করে নতুন ভোটার তালিকা তৈরি করা হবে। তালিকা প্রণয়নকারীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই তথ্য সংগ্রহ করবেন। পূর্ব পাকিস্তানে বাংলায় এবং পশ্চিম পাকিস্তানে উর্দুতে ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা হবে।[১৯] নির্বাচন কমিশন ভুয়া ভোটার তালিকা যাতে না করা হয় এ সমালোচনা এড়াতে তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সারাদেশব্যাপী স্থাপন করা হয় এক বিরাট কার্যকরী ব্যবস্থা যাতে ছিলেন ২৮৫ জন রেজিস্ট্রেশন অফিসার, ১৪০৪ জন সহকারী রেজিস্ট্রেশন অফিসার, ১৪১২১ জন সুপারভাইজার এবং ৪৫,৭৬৬ জন গননাকারী।[২০]

নির্বাচন কমিশন ১৯৭০ সালের ১৫ জুনের মধ্যে এ কাজ শেষ করে যা ছিল এক অসাধারণ কৃতিত্ব। নতুন ভোটার তালিকার প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল ১৯৬৯ সালের ২৭ আগস্ট থেকে। নির্বাচনী তালিকা প্রকাশ করা হয় এ উদ্দেশ্যে যে, যদি কোনো দাবি কিংবা আপত্তি থাকে তা অতিসত্ত্বর নিষ্পত্তির জন্য ৩১৫ জন রিভাইজিং অথরিটিস নিয়োগ দেয়া হয়েছিল যাদেরকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের হাইকোর্টের সহায়তায় নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের প্রকাশিত ভোটার তালিকার বিরুদ্ধে সর্বমোট ২০,৬৫০টি দরখাস্ত দেয়া হয় যার মধ্যে ১৫,০০৭টি গ্রহণ করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে তেমনি ৬,৯০৪টি দরখাস্ত দেয়া হয় যার মধ্যে ৫,৭৭৬টি গৃহিত হয় এবং ১,১২৪টি প্রত্যাখ্যান করা হয়। তালিকাভুক্ত সর্বমোট ভোটারের মধ্যে ৩ কোটি ২২ লক্ষ ছিল পূর্ব পাকিস্তান হতে এবং ২ কোটি ৫২ লক্ষ ছিল পশ্চিম পাকিস্তান হতে। নির্বাচনে পাকিস্তানে মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ৫ কোটি ৬৪ লাখের উপর।[২১] তালিকাভুক্ত ভোটার সংখ্যা ছিল দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৬০% যা ছিল একটি আদর্শ অনুপাত।[২২]

১৯৭০ সালে নির্বাচনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাভুটি কিছু উপজাতীয় এলাকায়ও সম্প্রসারিত করা হয়, যা অতীতে সবসময় বাদ দেওয়া হয়েছে। আজাদ কাশ্মীর যা বিতর্কিত জম্মু ও কাশ্মীরের অংশবিশেষ এবং ১৯৪৮

[১৯] *দৈনিক পাকিস্তান, দৈনিক আজাদ*, ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

[২০] জি ডব্লিউ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৬

[২১] মোঃ মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৯৪৭-১৯৭১)*, ঢাকা, সময় প্রকাশন, ১৯৯৯, পৃ. ২২১; *দৈনিক পাকিস্তান*, ০২ জুলাই ১৯৭০

[২২] Md. Abdul Wadud Bhuiyan, *Emergence of Bangladesh and Role of Awami League*, Dhaka, Panjeree Publication Ltd, 2008, p.158

Dhaka University Institutional Repository

সালের যুদ্ধবিরতি হতে পাকিস্তান সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে রয়েছে। এ অঞ্চলের জনগণকেও ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়।[২৩]

ভোটার তালিকা সম্পন্ন হওয়ার বিষয়ে দৈনিক পাকিস্তানে বলা হয়- জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের প্রথম পর্যায়ের কাজ আজ সম্পন্ন হয়েছে। দেশের সর্বত্র চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। . . . ভোটার তালিকা ছাপাতে প্রায় ২ কোটি টাকা খরচ হয়েছে এবং প্রতি পৃষ্ঠা ২০ পয়সা দামে ভোটারদের কাছে বিক্রি করা হবে।[২৪]

নির্বাচনী এলাকার সীমা নির্ধারণ

নির্বাচনী ভোটার তালিকার সাথে সাথে জরুরী হয়ে দেখা দেয় নির্বাচনী এলাকার সীমা নির্ধারণ। নির্বাচনী কমিশনারের এক বিবৃতিতে নির্বাচনী সীমানা সম্পর্কে বলা হয় যে গ্রাম অঞ্চলে এক একটি গ্রামকে নির্বাচনী এলাকা এবং শহরাঞ্চলে একটি ওয়ার্ড বা মহল্লা বা রাস্তাকে নির্বাচনী এলাকা হিসেবে গণ্য করা হবে।[২৫] প্রধান নির্বাচনী কমিশনার বিচারপতি আব্দুস সাত্তার শপথ নেয়ার পরপরই ঘোষণা দেন নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকা তৈরি করা ছাড়াও নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করবে।[২৬] আর এ লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালের নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ আদেশ জারি করেছেন।[২৭] নির্বাচনী সীমানা নির্দেশকরণের জন্য বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে চেয়ারম্যান ও পাকিস্তানের দুই অংশের হাইকোর্টের একজন করে বিচারপতি নিয়ে একটি কমিশন গঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচনী এলাকার ব্যাপারে আপত্তি ও পরামর্শ কমিশন কর্তৃক শোনা হয় ১৯৭০ সালের ১১ মে থেকে ২২ মে পর্যন্ত। কমিশন পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের ৫৮টি নির্বাচনী এলাকা এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৯৬টি নির্বাচনী এলাকায় ভাগ করে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের ৩৯টি এবং ৪টি প্রাদেশিক পরিষদের ৮৯টি নির্বাচনী এলাকায় বিভক্ত করে।[২৮] নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ শেষে পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচনী এলাকার চূড়ান্ত তালিকা ১৯৭০ সালের ৫ জুন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের নির্বাচনী এলাকার তালিকা ১৯৭০ সালের ২৫ জুন প্রকাশ করা হয়।[২৯]

নির্বাচনের আসন নির্ধারণ

সরকার ১৯৬১ সালের আদমশুমারীর ভিত্তিতে একব্যক্তি একভোট অনুযায়ী জাতীয় পরিষদের আসন সংখ্যা নির্ধারণের জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি নিযুক্ত করেছেন। প্রায় ৪ লাখ লোকের সমন্বয়ে এক একটি নির্বাচনী এলাকা গঠিত হয়।[৩০] প্রধান নির্বাচন কমিশনার এক বিজ্ঞপ্তিতে নির্বাচনী এলাকার সংজ্ঞায় বলেন গ্রাম অঞ্চলে এক একটি গ্রামকে এক একটি নির্বাচনী এলাকা এবং শহর অঞ্চলে একটি ওয়ার্ড শুদ্ধরূপে বললে মহল্লা বা রাস্তাকে নির্বাচনী এলাকা হিসেবে গণ্য করা হবে।[৩১]

---

[২৩] জি, ডব্লিউ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১০৬-১০৭
[২৪] *দৈনিক পাকিস্তান*, ২ জুলাই ১৯৭০
[২৫] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯
[২৬] *ঐ*, ১০ আগস্ট ১৯৬৯
[২৭] *দৈনিক আজাদ*, ১১ এপ্রিল ১৯৭০
[২৮] জি ডব্লিউ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭-১০৮
[২৯] *দৈনিক পাকিস্তান*, ২ জুলাই ১৯৭০
[৩০] *ঐ*, ৪ ডিসেম্বর ১৯৬৯
[৩১] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

নির্বাচনী প্রতীক

যে কোনো নির্বাচনে নির্বাচনী প্রতীক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন দলের নিকট থেকে নির্বাচনী প্রতীকের আবেদন গ্রহণ করবেন বলে কমিশন ঘোষণা দেয়।[৩২] নির্বাচন কমিশন আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য ৩৯টি রাজনৈতিক দলের জন্য নির্বাচনী প্রতীক বরাদ্দ করে। পরিষদের অনূন্য ২৫টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এ প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য নির্বাচনী প্রতীক বরাদ্দ করা হয়। কমিশনের স্বীকৃত নির্বাচনী প্রতীকের সংখ্যা ৫৩টি। বাকি ৩৪টি প্রতীক চিহ্ন ব্যক্তিগত ভাবে নির্বাচনী প্রার্থীদের মধ্যে বন্টন করা হয়। ৪২টি রাজনৈতিক দল প্রতীকের জন্য আবেদন করেছিল। এর মধ্যে প্রথম দফায় ১৯টি দলের জন্য এবং পরবর্তীতে আরও ৫টি দলের জন্য নির্বাচনী প্রতীক বরাদ্দ করা হয়েছে।[৩৩]

সারণী ১: নির্বাচনী প্রতীকের তালিকা[৩৪]

ক্রমিক নং	রাজনৈতিক দলের নাম	নির্বাচনী প্রতীক
১	পাকিস্তান আওয়ামী লীগ	নৌকা
২	পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি	ছাতা
৩	জামাতে ইসলামি	দাঁড়িপাল্লা
৪	পাকিস্তান পিপলস পার্টি	তলোয়ার
৫	পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাইয়ুম গ্রুপ)	বাঘ
৬	পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	সাইকেল
৭	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী গ্রুপ)	ধানের শীষ
৮	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী গ্রুপ)	ঘোড়া
৯	পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	লণ্ঠন
১০	জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম	খেজুর গাছ
১১	জমিয়তে আলীয়াই মোজাহেদিন	পাগড়ী
১২	খাকসার তেহরিক	বেলচা
১৩	নিখিল পাকিস্তান কেন্দ্রীয় জমিয়তে উলেমা ই ইসলাম ও নেজামে ইসলাম	বই
১৪	পাকিস্তান ন্যাশনাল কংগ্রেস	কলস
১৫	সিন্ধু করাচী মুহাজির পাঞ্জাবী পাঠান মুস্তাহিদ মাহাজ	ঘোড়া
১৬	গণতন্ত্রী দল	গরু
১৭	জাতীয় গণমুক্তি দল	মোমবাতি
১৮	বেলুচিস্তান যুক্তফ্রন্ট	চেয়ার

[৩২] *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭০
[৩৩] *ঐ*, ০৯ অক্টোবর ১৯৭০
[৩৪] *ঐ*, ৯ অক্টোবর ও ১৪ অক্টোবর ১৯৭০

১৯	কৃষক শ্রমিক পার্টি	হুক্কা
২০	পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগ	লাঙ্গল
২১	মারকাজী জমিয়তে আহলে হাদীস	গোলাপ
২২	সিন্ধু ইউনাইটেড ফ্রন্ট	ছড়ি
২৩	মারকাজী জমিয়তে উলামায়ে ই ইসলাম	চাবি

সূত্রঃ *দি ঢাকা গেজেট, এক্সট্রাঅর্ডিনারী*, সেপ্টেম্বর ১৯৭০, পৃ. ৯৫১

স্বতন্ত্র প্রার্থীদের প্রতীকের জন্য সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার রিটার্নিং অফিসারদের কাছে আবেদন করার কথা বলা হয়। তাদের বরাদ্দের জন্য ৩১টি প্রতীক ছিল। প্রতীকগুলো হচ্ছে- আতা, গরুর গাড়ি, ঘুড়ি, তালা, রেলগাড়ির ইঞ্জিন, কাঁচি, লোটা, চাকা, ফেজটুপি, হরিণ, ছুরি, মই, বেহালা, হাতি, টোঙ্গা, এরোপ্লেন, মাছ, আনারস, আম, দোয়াত-কলম, বোতল, ঢোলক, রেডিও, বাস, টেবিল, সেতু, রকেট, প্রদীপ, কাপ, পিরিচ ও মশাল।[৩৫]

নির্বাচনী তফসিল

যে কোনো নির্বাচনে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনের প্রচার প্রচারণা শুরু হয়। নির্বাচন কমিশন ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকা থেকে একজন করে সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোটারদের প্রতি আহবান জানিয়ে ইশতাহার জারি করেন। ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচনের ব্যাপারেও একই রকম ইশতাহার জারি করা হয়। প্রেসিডেন্ট কর্তৃক ১০ জুলাই জারিকৃত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ (নির্বাচন) অর্ডিন্যান্স ১৯৭০ অনুযায়ী এ ইশতাহার জারি করা হয়। তফসিল অনুযায়ী ১৫ অক্টোবর মনোনয়ন পত্র দাখিল, ১৭ অক্টোবর বাছাই ও ২৪ অক্টোবর মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের দিন ধার্য করা হয়। প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের জন্য ১৯ অক্টোবর মনোনয়ন পত্র দাখিল, ২১ অক্টোবর বাছাই ও ২৮ অক্টোবর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের তারিখ নির্ধারণ করা হয়।

জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে দেশের উভয় অঞ্চলে সকাল সাড়ে আটটা থেকে বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ করা হবে। নির্বাচন কমিশনারের সূত্র থেকে জানা যায় দেশের আসন্ন নির্বাচনে ৬ কোটি ৬৫ লাখ ভোটার অংশগ্রহণ করবে। নির্বাচন কমিশন নির্বাচন বাবদ সর্বমোট প্রায় ৫ কোটি টাকা ব্যয় হবে বলে মনে করা হয়।

সারাদেশে ৫০০ রিটার্নিং অফিসার, ১৪০০ সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রায় ৩০ হাজার প্রিসাইডিং অফিসার ও প্রায় ৩ লাখ পোলিং অফিসার নির্বাচনের সময় কাজ করার জন্য নিয়োগ দেয়া হয়। নির্বাচনে ৩ লাখ ব্যালট বাক্স ব্যবহার করা হয়। জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে মোট ১৩ কোটি ৫৬ লাখ ব্যালট পেপার ছাপানো হয়। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের পর ব্যালট পেপার ছাপা শুরু হয়।[৩৬] পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগ প্রধান আতাউর রহমান খান নির্বাচন বয়কটের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেও এবং ভাসানী ন্যাপ নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করলেও ব্যালট পেপারে তাদের নাম ছিল। নির্বাচনে মওলানা

[৩৫] *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৪ অক্টোবর ১৯৭০

[৩৬] *দৈনিক পাকিস্তান*, *দৈনিক আজাদ*, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭০

ভাসানী, আতাউর রহমান খান, ইউসুফ আলী চৌধুরী, কৃষক শ্রমিক পার্টির সভাপতি এ.এস.এম. সোলায়মান ভোট দেননি।[৩৭]

নির্বাচনে দলগত প্রার্থীর সংখ্যা

১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে আসন সংখ্যা ছিল সাধারণ ৩০০ এবং মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ১৩টি। প্রাদেশিক পরিষদে আসন সংখ্যা ছিল সাধারণ ৬০০ এবং মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ২১টি। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলো পৃথক পৃথক ভাবে প্রার্থী মনোনীত করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে মোট ৭৮১ জন প্রার্থী এবং পশ্চিম পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদে মোট ৮০০ জন প্রার্থী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে।[৩৮] নিচের সারণী ২ এ পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের দলগত প্রার্থীর সংখ্যা দেয়া হল।

সারণী ১: পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদে দলগত প্রার্থী সংখ্যা[৩৯]

ক্রমিক নং	রাজনৈতিক দলের নাম	পূর্ব পাকিস্তান	পাঞ্জাব	সিন্ধু	উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	বেলুচিস্তান	মোট
	মোট আসন	১৬২	৮২	২৭	২৫	৪	৩০০
১	আওয়ামী লীগ	১৬২	২	২	২	১	১৬৯
২	জামায়াতে ইসলামি	৬৯	৪৩	১৯	১৫	২	১৪৮
৩	মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	৬৫	৩৪	১২	১৭	৪	১৩২
৪	মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	৯৩	২৪	৬	১	-	১২৪
৫	পাকিস্তান পিপলস পার্টি	-	৭৭	২৫	১৬	১	১১৯
৬	মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	৫০	৫০	১২	৫	২	১১৯
৭	পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি	৮১	২১	৩	২	১	১০৮
৮	হাজবাড়ি জমিয়তই উলামা ইসলাম	১৩	৪৭	২০	১৯	৪	১০৩
৯	ওয়ালী ন্যাপ	৩৬	-	৬	১৬	৩	৬১
১০	থানভী মারকাজি জামায়াতে ইসলাম নিজামী	৪৫	৪	১	২	-	৫২
১১	জমিয়তে উলামায়ে পাকিস্তান	-	৩৮	৮	১	-	৪৭
১২	ভাসানী ন্যাপ	১৫	২	২	-	১	২০
১৩	পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগ	১৩	-	-	-	-	১৩
১৪	সিন্ধু করাচী মোহাজির	-	১	৫	-	-	৬

[৩৭] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১০ ডিসেম্বর ১৯৭০
[৩৮] জি ডব্লিউ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১০
[৩৯] *দৈনিক ডন*, ২০ নভেম্বর ১৯৭০

	পাঞ্জাবি পাঠান						
১৫	ইসলামী ডেমোক্রেটিক পার্টি	৫	-	-	-	-	৫
১৬	জাতীয় গণমুক্তি দল	৪	১	-	-	-	৫
১৭	পাকিস্তান ন্যাশনাল কংগ্রস	৪	-	-	-	-	৪
১৮	কৃষক শ্রমিক পার্টি	৩	-	-	-	-	৩
১৯	মাসিহী লীগ	-	১	১	১	-	৩
২১	খাকসার তেহরিক	-	২	-	-	-	২
২২	জমিয়তে আহলে হাদিস	-	২	-	-	-	২
২৩	বেলুচিস্তান ইউনাইটেড ফ্রন্ট	-	-	-	-	১	১
২৪	পাখতুনিস্থান ন্যাপ						
২৫	পাকিস্তান দরদী সংঘ	১	-	-	-	-	১
২৬	সিন্ধু ইউনাইটেড ফ্রন্ট	-	-	১	-	-	১
২৭	স্বতন্ত্র	১০৯	১১৪	৪৬	৪৫	৫	৩১৯
	মোট দলীয় প্রার্থী	৮২১	৪৩০	১৫১	১২৩	২৪	১৫৪৯

সূত্র : *দৈনিক ডন*, ২০ নভেম্বর ১৯৭০

নির্বাচনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা

ভোট গ্রহণের দিন ভোটাররা যাতে নির্বিঘ্নে ভোট প্রদান করতে পারে সেদিকেও নির্বাচন কমিশন সতর্ক দৃষ্টি দেয়। নির্বাচনকালীন সময়ে প্রদেশের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ১৪,৪৯৫টি নির্বাচন কেন্দ্রে প্রায় ১ লক্ষ ১০ হাজার আনসার সদস্য মোতায়েন করা হয় বলে সরকারি হ্যান্ড আউটের মাধ্যমে জানানো হয়।[৪০] প্রাদেশিক নির্বাচনের সময় পূর্ণ শান্তি বজায় রাখার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় এবং ভোট গ্রহণের দিনে ব্যাপকভাবে সৈন্য মোতায়েন করা হবে বলে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়। জাতীয় পরিষদের নির্বাচনেও এমন ব্যবস্থা করা হয়। সেনাবাহিনী রাস্তায় টহল দিবে ও নির্বাচনের পূর্বে বা নির্বাচনের সময় যাতে কোনো ধরনের বেআইনী কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত না হয় এবং নির্বাচন যাতে সুশৃঙ্খল ভাবে হয় সে ব্যাপারে অতিরিক্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখবে।[৪১]

ভোট দান পদ্ধতি

নির্বাচনের সময় ভোটদান পদ্ধতি কেমন হবে তা জানিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের পত্রপত্রিকায় জানিয়ে দেয়া হয়। নির্বাচন কমিশনারও ভোটদান পদ্ধতি সম্পর্কে ভোটারদের সচেতন করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে

[৪০] *দৈনিক আজাদ*, ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭০
[৪১] *ঐ*, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনী মহড়ার আয়োজন করে। বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য এটি ছিল খুবই গ্রহণযোগ্য। কারণ এ মহড়ার ফলে যে সকল অশিক্ষিত মানুষ ভোটার ছিল তাদের এ সম্পর্কে সচেতন করা হয় যাতে তারা সুষ্ঠুভাবে ভোটদান করতে পারে। নির্বাচন কমিশন নতুন ভোটদান পদ্ধতি চালু করে। এ নতুন পদ্ধতিতে ব্যালট পেপারে প্রার্থীদের নাম ও তাদের নিজেদের নামের পাশে নির্বাচনী প্রতীক থাকবে। এছাড়া পুলিং বুথে চারকোনা সিল ও প্যাড রাখা হবে। ভোটারগণ ব্যালট পেপারে নিজের পছন্দের প্রার্থীর নামের পাশের প্রতীক চিহ্ন অথবা প্রার্থীর নামের মধ্যে সিল মেরে পুলিং অফিসারের সামনে রাখা ব্যালট বাক্সে ফেলে দিলে ভোট দেয়া শেষ হবে। দুইটি নামের অথবা প্রতীক চিহ্নের মাঝখানে সিল পড়লে সিলের বেশিরভাগ অংশ যেদিকে পড়বে সে প্রার্থীকে ভোট দেয়া হয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে।[৪২]

ভোট গণনা ও ফলাফল প্রকাশ পদ্ধতি

১৯৭০ সালের নির্বাচনে ভোট গণনা ও ফলাফল প্রকাশ সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনার জানান যে, নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসাররা ভোটকেন্দ্র থেকে পাওয়া নির্বাচনের প্রাথমিক ফলাফল সংবাদমাধ্যমগুলোকে সরবরাহ করবে। তবে বিভিন্ন ভোট কেন্দ্র থেকে পাওয়া ফলাফল বিন্যাসের পর সরকারিভাবে ফলাফল প্রকাশ করা হবে।[৪৩] নির্বাচনী ফলাফল কিভাবে প্রকাশ করা হবে তা নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়ে জানায় যে, দেশব্যাপী নির্বাচন কেন্দ্রসমূহের প্রিসাইডিং অফিসাররা নিজেদের নির্বাচনী এলাকায় প্রাপ্ত ভোট গণনা করে রিটার্নিং অফিসারের নিকট পাঠাবেন। প্রধানত মহকুমা ও জেলা সদর দপ্তরে অবস্থিত এ সকল রিটার্নিং অফিসার পাকিস্তান বেতারসহ অন্যান্য সংবাদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট ঐ সকল ফলাফল প্রেরণ করবে। রিটার্নিং অফিসাররা প্রাদেশিক নির্বাচনী কমিশনারের কাছে এ সকল ফলাফল জানাবে। প্রাদেশিক কেন্দ্রসমূহের চূড়ান্ত ফলাফল টেলিভিশনসহ অন্যান্য সংবাদ প্রচারকারী মাধ্যমের নিকট পাঠানো হবে। প্রাদেশিক নির্বাচনী কমিশনের নিকট রিটার্নিং অফিসারদের এবং কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কমিশনের নিকট প্রাদেশিক নির্বাচনী কমিশনের ফলাফল পাঠানোর সুবিধার জন্য টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ বিভাগ তারযোগাযোগ স্থাপন করবে। বেতার টেলিভিশন ও অন্যান্য প্রচারমাধ্যম কর্তৃক এ সকল ফলাফলকে ভোট গণনার অস্থায়ী ও বেসরকারি ফলাফল হিসেবে প্রচার করা হবে। প্রত্যেকটি নির্বাচনী এলাকার সকল ভোট কেন্দ্রের ফলাফল একত্র করার পর প্রত্যেকটি নির্বাচনী এলাকার ফলাফল সরকারিভাবে ঘোষণা করা হবে।[৪৪]

নির্বাচনী আচরণবিধি

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আব্দুস সাত্তার সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক করে ছয়টি মূলনীতি বিশিষ্ট আচরণ বিধি প্রণয়ন করেন। এগুলো হল-[৪৫]

---

[৪২] *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৮ জুলাই ১৯৭০
[৪৩] *ঐ*, ২৯ জুলাই ১৯৭০
[৪৪] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৫ নভেম্বর ১৯৭০; ১১ নভেম্বর ১৯৭০
[৪৫] *দৈনিক আজাদ*, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ নভেম্বর ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

১. অন্য রাজনৈতিক দলের সভায় হাঙ্গামা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে দলীয় কর্মী, সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীদের বিরত রাখার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর চেষ্টা করা উচিত।

২. রাজনৈতিক দলগুলির নেতৃবর্গ ও কর্মীদের অন্যান্য নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে কটুক্তি পরিহার করা উচিত। বক্তৃতা ও স্লোগান মার্জিত এবং শালীনতা ও শিষ্টতার নীতি ভিত্তিক হওয়া উচিত।

৩. জননেতা ও রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য সকলকে দায়িত্ববোধ ও সম্মানবোধ সহকারে অবশ্যই কাজ করতে হবে। নিজেদের মত ও কর্মসূচি প্রচারকালে তাদের এ কাজ করার ব্যাপারে অন্যদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। কারণ তা গণতন্ত্রের পরিপন্থী।

৪. দলের নিজস্ব কর্মসূচি ও নীতি ব্যাখ্যাকারী প্ল্যাকার্ড ও অন্যান্য সচিত্র প্রচারণা অন্যান্য দলের নেতৃবর্গের বিরোধী হওয়া উচিত নয়।

৫. হাঙ্গামার আবেদন জানানো বা হাঙ্গামার হুমকি প্রদান বা হাঙ্গামা সৃষ্টি কঠোরভাবে এড়িয়ে চলা উচিত।

৬. জনসভায় অস্ত্রশস্ত্র বহন করতে দেওয়া হবে না এবং এ ব্যাপারে কঠোরভাবে সরকারি বিধি পালন করতে হবে। জনসভায় হাতবোমা ও অন্যান্য বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহার করা উচিত নয়।

পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথম সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তাঁর গৃহিত বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে আন্তরিকতার পরিচয় তুলে ধরেছেন। একটি সুষ্ঠু অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। নির্বাচনী ব্যবস্থাপনার আওতায় নির্বাচনের জন্য নতুন ভোটার তালিকা থেকে শুরু করে নির্বাচনী তফসিল পর্যন্ত সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন। ভোটার তালিকা প্রণয়নে নির্বাচন কমিশন এবং সীমা নির্দেশকরণ কমিশনের নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণের কাজ দেশে স্বাগত জানানো হয়। কোনো বড় রাজনৈতিক দল কিংবা কোনো পত্রপত্রিকায় বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের নেতৃত্বে গঠিত দু'টি কমিশনের সদিচ্ছার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ প্রকাশ করেনি। প্রত্যেক ব্যক্তি দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের আয়োজন নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল। সমগ্র দেশবাসী অপেক্ষা করতে থাকে একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য। ১ জানুয়ারি ১৯৭০ সালে সকল রাজনৈতিক দলগুলোর উপর থেকে রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে দেয়ার ফলে সকল দল একযোগে নির্বাচনী প্রচার কার্য শুরু করে। সবাই নিজেদের জয়ের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করে। ভোটারদের কাছে তাদের নিজস্ব কর্মসূচি ও তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পাকিস্তানের তেইশ বছরের ইতিহাসে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার মত পরিবেশ তৈরি হয়। দীর্ঘ আকাঙ্খার ফসল ১৯৭০ সালের নির্বাচন।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

রাজনৈতিক দলগুলির নির্বাচনী ইশতাহার ও প্রচারণা কার্যক্রম

পাকিস্তানের ইতিহাসে ১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল প্রথম সাধারণ নির্বাচন। জেনারেল আইয়ুব খান গণ আন্দোলনের মুখে পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে পাকিস্তানের রাজনীতি থেকে বিদায় নেন। জেনারেল ইয়াহিয়া খান সামরিক শাসন জারি করে জাতির উদ্দেশ্যে প্রথম ভাষণে ঘোষণা দিয়েছিলেন যত শীঘ্র সম্ভব সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। এ লক্ষ্যে তিনি কাজ শুরু করেন। দেশের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশন গঠন করেন। নির্বাচন কমিশন আন্তরিকতার সাথে তাঁর কাজ সমাপ্ত করে। নির্দিষ্ট সময়ে ভোটার তালিকা প্রণয়নসহ নির্বাচনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে। একই সাথে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সামরিক শাসন জারি করে সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে, দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরে আসলে তিনি রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা তুলে নিবেন। কিন্তু ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের রূপরেখা সম্বলিত আইনগত কাঠামো আদেশ ঘোষণা করেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো প্রথমে আইনগত কাঠামো আদেশ না মানলেও পরবর্তীতে এটি মেনে নিয়ে নির্বাচনে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে সকল রাজনৈতিক কার্যকলাপের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়। এর পরপরই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করে। একই সাথে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নির্বাচনী ইশতাহার ও কর্মসূচি জনকল্যাণমুখী করার মাধ্যমে ভোটারদের মন আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। সকলের নির্বাচনী ইশতাহারে প্রাধান্য পায় জাতীয় ও প্রাদেশিক বিষয়ের বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধানের প্রতিশ্রুতি। একই সাথে সামরিক শাসনের সময় গৃহিত বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে কোনগুলি তারা গ্রহণ করবে আর কোনগুলি তারা বাদ দিয়ে নতুন করে তৈরি করবে তার কর্মপন্থা। কমবেশি সকল রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নির্বাচনী ইশতাহারে পূর্ববাংলার কথা উল্লেখ করে, বিশেষ করে পূর্ববাংলার বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধানের উপায়। দেশের সংবিধানের রূপরেখা, জাতীয় ও প্রাদেশিক সমস্যাসমুহ, বৈদেশিক সম্পর্ক কেমন হবে, জনগণের কল্যাণে কি কাজ করবে তার ব্যাপক কর্মসূচি। একই সাথে রাজনৈতিক দলগুলো দেশের সর্বত্র প্রচার কার্য শুরু করে। সকল রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নির্বাচনী প্রচারণা ও বক্তৃতা বিবৃতিতে প্রচার করতে থাকে তাদের দলের শ্রেষ্ঠত্ব ও তাদের গৃহিত বিভিন্ন কর্মসূচির কথা। এক দল অপর দলের সমালোচনা শুরু করে। এভাবে রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। সমগ্র দেশব্যাপী শুরু হয় নির্বাচনী জোয়ার।

Dhaka University Institutional Repository

এই অধ্যায়ে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে অংশ নেয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর রাজনৈতিক ও আদর্শগত অবস্থান, নির্বাচনী ইশতাহার, তাদের প্রচারণা কার্যক্রম, বিভিন্ন দলের নির্বাচনী স্লোগান ও রাজনৈতিক দলগুলোর গৃহিত কর্মসূচির মূল্যায়ন করা হয়েছে।

নির্বাচনে অংশ নেয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলসমূহ

সারণী ১- আদর্শগত রাজনৈতিক দলগুলির শ্রেণীবিভাগ

বাম	মধ্য	ডান
১. ন্যাপ (ভাসানী ও ওয়ালী গ্রুপ) ২. জাতীয় গণমুক্তি দল ৩. সিন্ধু-সংযুক্ত দল (কেবল সিন্ধু কেন্দ্রিক)	১. আওয়ামী লীগ ২. পাকিস্তান পিপলস পার্টি ৩. পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি ৪. পাকিস্তান মুসলিম লীগ (তিনটি গ্রুপ) ৫. কৃষক শ্রমিক পার্টি ৬. পাকিস্তান জাতীয় লীগ ৭. পাকিস্তান ন্যাশনাল কংগ্রেস	১. নিখিল পাকিস্তান জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ২. জামায়াতে ইসলামি ৩. মারকাসী জমিয়তে আহলে হাদীস ৪. মারকাজে জমিয়তে উলামা ৫. জমিয়াতে উলামায়ে ইসলাম

সূত্রঃ জি ডব্লিউ চৌধুরী, *অখণ্ড পাকিস্তানের শেষ দিনগুলি*, হক কথা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ১১২

১৯৭০ সালের নির্বাচনে অংশ নেয়া রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যে, কোনো জাতীয় নেতা বা কোনো জাতীয় দল ছিল না। মুসলিম লীগের তিনটি শাখা, জামায়াতে ইসলামি, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির সমগ্র পাকিস্তান ব্যাপী সংগঠন ছিল এবং তারা পাকিস্তানের উভয় অংশে প্রার্থী দিয়েছিল। কিন্তু এসব দলগুলির কোনোটারই পূর্ব পাকিস্তানে জনপ্রিয়তা ছিল না এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানের পাকিস্তান পিপলস পার্টির তুলনায় তারা পিছিয়ে ছিল। নির্বাচনে দুটি দল সবচেয়ে বেশি রাজনৈতিক গুরুত্ব পায় সেগুলি হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ ও পশ্চিম পাকিস্তানের পাকিস্তান পিপলস পার্টি। এ দুটি দল রাজনৈতিক ভাবে জাতীয় দল হিসেবে নয় আঞ্চলিক দল হিসেবে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে কেননা দুটি দল আঞ্চলিক ভাবে প্রাধান্য বিস্তার করতে পেরেছে এবং অঞ্চলভিত্তিক প্রার্থী মনোনয়ন দিয়েছে। এর মধ্য দিয়ে আঞ্চলিক মেরুকরণ হয়েছে, জাতীয় দল বা জাতীয় নেতৃত্ব গড়ে ওঠেনি।

নির্বাচনী ইশতাহার

নির্বাচনী ইশতাহার যে কোনো রাজনৈতিক দলের একটি মুখপাত্র। ইশতাহারের মাধ্যমে নির্বাচনে অংশ নেয়া রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নির্বাচনী ওয়াদা ও কর্মসূচি জনগণের সামনে তুলে ধরে। রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে জয়ী হলে জনগণের কল্যাণে ও দেশের কল্যাণে কি কাজ করবে তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ থাকে। অর্থাৎ জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্য রেখে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নির্বাচনী ইশতাহার ঘোষণা করে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে অংশ নেয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্ন বক্তৃতা বিবৃতির মাধ্যমে বা আনুষ্ঠানিক ভাবে নির্বাচনী ইশতাহার ঘোষণা করে। নিম্নে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতাহার সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

আওয়ামী লীগ[১]

আওয়ামী লীগ তার ঘোষণাপত্রের শুরুতে উল্লেখ করে যে, জনগণের নিরবিচ্ছিন্ন, সুকঠিন ও সুপ্রতিজ্ঞ দীর্ঘ সংগ্রামের ঐতিহ্যময় পটভূমিতে আওয়ামী লীগ জনগণের সামনে উপস্থিত চ্যালেঞ্জ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করার জন্য যে সাহস এবং সংকল্পের প্রয়োজন জাতির উপর তাদের বিশ্বাস, জনগণের উপর আস্থা এবং সর্বোপরি সর্বশক্তিমানের উপর তাদের ঈমানের মাধ্যমেই আওয়ামী লীগ তা লাভ করেছে। তাই গণতান্ত্রিক উপায়ে বিপ্লব সাধনের জন্য এবং তা দিয়ে বর্তমানের অন্যায় অবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত কাঠামোর স্থলে অঞ্চলে অঞ্চলে ও মানুষে মানুষে ন্যায়বিচার রক্ষাকারী একটি নতুন শাসনতান্ত্রিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগের ঘোষণাপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। পাকিস্তানের প্রতিটি অঞ্চল ও প্রতিটি নাগরিকের ক্ষেত্রে সুবিচারের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য এই ঘোষণাপত্রে একটি ব্যাপক রূপরেখা প্রদান করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতাহারে যে সকল বিষয় ছিল-

১. শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে এমন একটি সজীব গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে যেখানে জনগণ স্বাধীনতা ও মর্যাদার সাথে জীবনযাপন করতে পারবে এবং ন্যায় ও সাম্য বিরাজ করবে। এছাড়া অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা এবং উপযুক্ত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কর্মসংস্থানের সুযোগসহ প্রতিটি নাগরিকের প্রাথমিক চাহিদা পূরণের মৌলিক দায়িত্ব থাকবে রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে এমন স্বীকৃতি থাকবে। আইনের ক্ষেত্রে সকল নাগরিক সমান এবং আইনগত অধিকার পাবে। ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, ভাষা নির্বিশেষে সকল মানুষ সমান এবং গণতান্ত্রিক সমাজের সর্বক্ষেত্রে পূর্ণ নাগরিক হিসেবে গণ্য হবে। বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, জনসভা সভা-সমিতি গঠনের স্বাধীনতা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকবে।

২. পাকিস্তান হবে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলোর প্রত্যেকটি ছয় দফা ফর্মূলার ভিত্তিতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদানকারী ফেডারেল যুক্তরাষ্ট্র। ফেডারেল সরকারের সকল শাখায় ও ফেডারেল সার্ভিসে জনসংখ্যার ভিত্তিতে পাকিস্তানের সকল অংশের মানুষের ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব লাভের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য সংবিধানে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা থাকবে। স্বল্প প্রতিনিধিত্বশীল অঞ্চলগুলো বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বর্ধিত হারে লোক নিয়োগের মাধ্যমে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বর্তমানের স্বল্প প্রতিনিধিত্বের অবসান করা হবে। প্রাথমিক সংশোধন মূলক পদক্ষেপ হিসেবে বর্তমানে করাচিতে অবস্থিত নৌ বাহিনীর সদর দপ্তর ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে চট্রগ্রামে স্থানান্তর করা হবে।

[১] *দৈনিক পাকিস্তান*, ৬ নভেম্বর ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

৩. শোষণমুক্ত ন্যায় ও সাম্যবাদী সমাজ গঠন করা অর্থনৈতিক কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। এটি একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রূপকল্প যাতে অর্থনৈতিক অবিচার দূরীকরণ ও দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা হবে এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ও সকল স্তরের মানুষের মধ্যে এ সমৃদ্ধির ফল যথাযথ বন্টনের বিধান থাকবে। সম্পদ পুঞ্জিভূতকরণ এবং অর্থনীতির প্রধান ক্ষেত্রগুলোর নিয়ন্ত্রণ অধিকার থেকে সুবিধাভোগী শ্রেণীকে বিরত রাখার জন্য অর্থনীতির প্রধান ক্ষেত্রগুলোকে জাতীয়করণ করা হবে। জাতীয়করণের ক্ষেত্রে যেসব বিষয় অগ্রাধিকার পাবে সেগুলো হল: ব্যাংকিং, বীমা, বিভিন্ন ভারী শিল্প যেমন লোহা ও ইস্পাত, খনি, মেশিন যন্ত্রপাতি, ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং, পেট্রো ক্যামিকেল, সার, সিমেন্ট, জ্বালানী ও বিদ্যুৎ ইত্যাদি, বৈদেশিক বাণিজ্য, পাট ব্যবসা, তুলা ব্যবসা, শিপিংসহ প্রধান যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি।

৪. পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকে ২৩ বছরের বেশি সময় ধরে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ক্রমাগত পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ পাচার এবং বৈদেশিক মুদ্রা ও সাহায্যের সিংহভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যবহারের ফলে আন্তঃআঞ্চলিক বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই ন্যায় বিচারের খাতিরে পাকিস্তানের অধিক উন্নত অঞ্চলগুলো থেকে স্বল্পোন্নত অঞ্চলে সম্পদ স্থানান্তর করা হবে। আন্তঃআঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস ও নির্মূল করার উদ্দেশ্যে ফেডারেশনের ইউনিট সরকারগুলোর মাধ্যমে নীতি গ্রহণ করা হবে।

৫. কৃষি ও গ্রামের জনগণের অবস্থার উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার দেয়া হবে। গ্রাম ও শহরের জীবনযাত্রার মধ্যকার বিদ্যমান বৈষম্য দূর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। জনগণের মধ্যকার বৈষম্য দূর করার জন্য কৃষিক্ষেত্রে সুদুরপ্রসারী বিপ্লব সাধনের জন্য ভূমি ব্যবহারের বর্তমান পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন সাধন ও বহুমুখী সমবায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে। এছাড়া কৃষিক্ষেত্রে উন্নতির জন্য সার ও উন্নত বীজ প্রদান, নলকূপ স্থাপন, পাওয়ার পাম্প স্থাপন, কীটনাশক ঔষধ ইত্যাদি কৃষকদের দেয়া হবে।

৬. জমির ব্যবহারিক পদ্ধতিতে যে সকল পরিবর্তন আনা হবে, সে সকল হলো (ক) পশ্চিম পাকিস্তানে বিদ্যমান জায়গিরদারী, জমিদারী ও সরদারী প্রথার বিলোপ সাধন করা হবে, (খ) জমির প্রকৃত চাষীদের স্বার্থে ভূমিব্যবস্থার পূর্নবিন্যাস করা হবে। যেমন- জমির সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারণ, নির্ধারিত জমির অতিরিক্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টন, স্থানীয় জনসাধারণের অবস্থা ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে অঙ্গরাষ্ট্রগুলির আওয়ামী লীগ জমির সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারণ করবে। (গ) সরকারি খাস জমি ভুমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্দোবস্ত দেয়া হবে, (ঘ) পাকিস্তানের সর্বত্র পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত ভূমির খাজনা ও বকেয়া খাজনা মওকুফ করা হবে।

৭. পূর্ব পাকিস্তানের কৃষি ব্যবস্থা পুর্ননির্মাণের যে কোনো পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে বন্যা নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। তাই অর্থনৈতিক পুর্নবিন্যাসের জন্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি ব্যবস্থার একটি ব্যাপক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করবে।

৮. আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ঘোষণা অনুযায়ী শ্রমিকদের অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৯. পাকিস্তানের দুইটি রাষ্ট্রভাষা বাংলা ও উর্দু যাতে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইংরেজির স্থলাভিষিক্ত হতে পারে তার ব্যবস্থা করা হবে। পাকিস্তানের সকল এলাকার ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নকে উৎসাহিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেয়া হবে। মোহাজেরদের স্থায়ী বসতি এবং অর্থনৈতিক পুর্নবাসনের সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। দেশের অন্যান্য নাগরিকের সঙ্গে সকল ব্যাপারে উপজাতীয় এলাকার জনসাধারণ যাতে সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারে সেজন্য উপজাতীয় এলাকাগুলোকে অন্যান্য অঞ্চলের সাথে সমউন্নয়ন পর্যায়ে আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১০. বৈদেশিক নীতিতে দেশের জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষার এবং রাষ্ট্রের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে একটি স্বাধীন জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করা হবে। বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণের এবং দেনার ভার লাঘবের জন্য অর্থনেতিক পরিকল্পনা ও বৈদেশিক সাহায্যের ক্ষেত্রে নতুন কৌশল অবলম্বন করা হবে। সকলের প্রতি বন্ধুত্ব এবং কারো প্রতি বিদ্বেষ নয় এ নীতি অনুসরণ করে ন্যায় ও পরস্পরের সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধার ভিত্তিতে প্রতিবেশি দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা হবে। মৌলিক আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের জন্য জম্মু ও কাশ্মীরের জনসাধারণের ন্যায্য সংগ্রামের প্রতি সমর্থন রয়েছে। সিয়াটো, সেন্টো এবং অন্যান্য সামরিক চুক্তি থেকে অবিলম্বে পাকিস্তানকে বের করে আনা হবে। সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ এবং বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের সংগ্রামের প্রতি আওয়ামী লীগের সমর্থন রয়েছে।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী ন্যাপ)[২]

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ওয়ালী গ্রুপ তাদের নির্বাচনী ঘোষণাপত্রে ঘোষণা করে যে, আসন্ন নির্বাচনে জনগণের সামনে দুটি প্রশ্ন উত্থাপিত হবে, একটি হল দেশের শাসনতন্ত্র সম্পর্কে এবং অন্যটি হল ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের গঠন ও এদের কর্মসূচি সম্পর্কে। গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র ও দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের জন্য ন্যাপ জনগণের সামনে নিম্নলিখিত কর্মসূচি পেশ করে।

১. পাকিস্তানকে একটি পূর্ণ স্বাধীন, সার্বভৌম জনকল্যাণমুলক ফেডারেল রাষ্ট্রে পরিণত করা হবে। ফেডারেল রাষ্ট্রের অধীনে পূর্ববাংলার পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী প্রদেশগুলির পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের স্বীকৃতি থাকবে। দেশরক্ষা, মুদ্রা ও পররাষ্ট্রনীতি থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে।

২. রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বময় ক্ষমতা জনগণ দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভার হাতে ন্যস্ত থাকবে। যুক্ত নির্বাচন, প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকার ও এক লোক এক ভোটনীতি ভিত্তিক প্রত্যক্ষ নির্বাচন থাকবে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের ব্যক্তি স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা, রাজনৈতিক সভা-সমিতি-শোভাযাত্রা পরিচালনা ও ধর্মঘট পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হবে। শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্র জনতা যাতে এ সকল অধিকার

[২] *দৈনিক পাকিস্তান*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

ভোগ করতে পারে তার ব্যবস্থা থাকবে। সকল প্রকার দমনমূলক আইন রহিত করা হবে। আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের সুযোগে বিশেষ একটি প্রদেশের উপর তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাতে কোনো কিছু চাপিয়ে না দেওয়া হয় তার জন্য শাসনতন্ত্রে একটি বিশেষ রক্ষাব্যবস্থা থাকবে। বিচার বিভাগ থেকে শাসন বিভাগ পৃথক করা হবে।

৩. বাংলা ও উর্দুকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়া হবে। এছাড়া সিন্ধী, পাঞ্জাবী, বেলুচ ও পশতু ভাষাকেও জাতীয় ভাষার মর্যাদা দেয়া হবে। প্রদেশগুলির নাম হবে বাংলা, পাঞ্জাব, পাখতুনিস্থান, সিন্ধু এবং বেলুচিস্তান। ধর্ম নির্বিশেষে দেশের সকল নাগরিক রাষ্ট্রের চোখে সমান বলে বিবেচিত হবে।

৪. কৃষকদের স্বার্থে পূর্ববাংলার ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার করবে। জমির সিলিং পরিবার প্রতি ১০০ বিঘায় সীমিত করে বাড়তি জমি ভূমিহীন ও গরিব কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করবে। কৃষকদের স্বার্থে বর্গাপ্রথা সংস্কার করা হবে। সেচ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পাট, আখ, তামাক ও অন্যান্য অর্থকরী ফসলের ন্যায্যমূল্য পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করা হবে। পাটের নিম্নতম মূল্য ৪০ টাকায় ধার্য্য করা হবে। খাদ্যের ব্যাপারে প্রদেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হবে। ১৫ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকদের খাজনা মওকুফ করে দেয়া হবে। পূর্ববাংলার বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৫. শ্রমিকদের জীবনধারণের উপযোগী নিম্নতম মজুরি, চাকুরির স্থায়ীত্ব, দৈনিক আট ঘন্টা এবং সপ্তাহে ৪৪ ঘন্টা কাজের সময় নির্ধারণ, বাসস্থান, চিকিৎসা, ছুটি, শিক্ষা ও উপযুক্ত বোনাস এবং সমাজ বীমার ব্যবস্থা করা হবে। ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, ন্যায্য দাবি দাওয়া আদায়ের জন্য ধর্মঘট পালন ও যৌথ দরকষাকষির স্বীকৃতি দেয়া হবে।

৬. দেশকে দ্রুত শিল্পায়িতকরণ ও সুষম অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হবে। এক্ষেত্রে যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে-

ক. দেশকে দ্রুত শিল্পায়িতকরণের উদ্দেশ্যে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

খ. মূল ও ভারী শিল্প জাতীয়করণ করা হবে এবং রাষ্ট্রীয় খাতে মূল ও ভারী শিল্প যথা ইস্পাত কারখানা স্থাপন, যন্ত্রপাতি নির্মাণ কারখানা, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও খনিজ সম্পদ এবং সর্বক্ষেত্রে অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দান করা হবে।

গ. রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে শিল্প গঠনের মূলধন সংগ্রহ ও অর্থনীতির উপর থেকে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের কর্তৃত্ব বিলোপের জন্য বৃহৎ শিল্প, ব্যাংক, বীমা জাতীয়করণ করবে।

ঘ. শিল্প ও ব্যবসা ক্ষেত্রে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি নিয়ন্ত্রণ করে জাতীয় পুঁজিকে অগ্রাধিকার দান করবে।

ঙ. পাকিস্তানের উভয় অংশ বিশেষ করে অনুন্নত এলাকাসমূহে শিল্প উন্নয়নের জন্য সমান ও ন্যায্য সুযোগ দান করা হবে। শিল্প উন্নয়নের জন্য পশ্চাৎপদ পূর্ববাংলায় অধিকতর অর্থ ব্যয় করে উভয় অংশের মধ্যে যে বৈষম্য রয়েছে তার অবসান ঘটাবে।

চ. দেশীয় শিল্পকে উৎসাহ দান এবং সমস্ত শিল্পকে অসম বিদেশি প্রতিযোগিতার কবল থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ছ. পাট ব্যবসা জাতীয়করণ করা হবে।

জ. সমাজ ব্যবস্থা নির্বিশেষে সকল দেশের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সাথে বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক প্রসার করা হবে।

৭. সেন্টো, সিয়াটো, পাক মার্কিন সামরিক চুক্তি ও অন্যান্য সকল দ্বিপাক্ষিক সামরিক চুক্তি বাতিল করবে। অন্যান্য যে সকল চুক্তি দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বিদেশি হস্তক্ষেপ ডেকে আনবে তা বাতিল করা হবে। স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও শান্তির স্বপক্ষে এবং সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ বিরোধী বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করবে। দেশের উন্নয়নের জন্য শর্তহীন বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করবে। বিশ্বের সকল রাষ্ট্র বিশেষ করে আফ্রো-এশীয় দেশগুলির সাথে বন্ধুত্বমূলক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপন করবে। সকল দেশের সাথে সমতার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলবে। ভারতসহ সকল প্রতিবেশী দেশের সাথে বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করে বিশ্বশান্তি রক্ষা ও বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি সমর্থন ও সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করবে।

৮. সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মীয় শিক্ষাকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে গণ্য করা হবে। ধর্মীয় শিক্ষার জন্য যথাযোগ্য পৃথক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৯. পূর্ববাংলা তথা পাকিস্তানের উভয় অংশকে দেশরক্ষা ব্যবস্থায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হবে এবং একটি নৌ দপ্তর পূর্ববাংলায় স্থানান্তর করা হবে। পূর্ববাংলায় প্যারা মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করা হবে। পাকিস্তানের উভয় অংশে সামরিক সাজ সরঞ্জামের কারখানা স্থাপন করা হবে।

১০. দেশের দুই অংশের বা অঞ্চল সমুহের মধ্যে যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বিদ্যমান রয়েছে তা স্বল্পসময়ের মধ্যে দূর করা হবে। পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মুলধন পাচার বন্ধ করা হবে।

১১. সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের অবসান ঘটিয়ে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক জীবনে সংখ্যালঘুদের সমানাধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা হবে। শত্রু সম্পত্তি আইন বাতিল করা হবে। মোহাজেরদের পশ্চিম পাকিস্তানের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সাথে সংযুক্ত করা হবে। কাশ্মীর ও ফারাক্কা বাঁধ সমস্যার সমাধান করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী গ্রুপ)[৩]

নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা নিয়ে ন্যাপ ভাসানী নিজেদের মধ্যে দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভুগতে থাকে। তারপরও ন্যাপ ভাসানী তাদের নির্বাচনী ইশতাহার ঘোষণা করে। ন্যাপ ভাসানীর নির্বাচনী ইশতাহারের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো হল:

১. পাকিস্তানকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সমাজতান্ত্রিক ফেডারেল রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠা করা হবে।

২. পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হবে।

৩. সকল দেশীয় রাজা, উপজাতীয় এলাকা, এজেন্সী ও এ ধরনের অন্যান্য বিশেষ এলাকাকে প্রদেশগুলোর সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৪. জাতিসংঘের মৌলিক অধিকার সনদ অনুযায়ী ধর্মীয় মতবাদ, বংশ, গোত্র নির্বিশেষে সবাইকে নিজ নিজ ধর্ম পালন করার অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা হবে।

৫. সকল নাগরিককে খাদ্য, কর্মসংস্থান, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, নিরাপত্তা ও ন্যায় বিচারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হবে।

৬. সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারী সমাজকে পুরুষের সমান অধিকার দেয়া হবে।

৭. বেকার, বৃদ্ধ ও অক্ষমদের সাহায্য করা হবে।

৮. গণভোটের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ নির্ধারণের অধিকার আদায়ের জন্য কাশ্মীরীদের সাহায্য করা, আজাদ কাশ্মীরে একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করা হবে।

৯. পূর্ব পাকিস্তানে ভূ-স্বামীদের কাছ থেকে বিনা ক্ষতিপূরণে জমি নিয়ে ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করা হবে। পশ্চিম পাকিস্তানে জমির মালিকানা একশ একর নির্ধারণ করা হবে। অতিরিক্ত জমি ক্ষুদ্র কৃষকদের মধ্যে বন্টন করা হবে। সেচ ও অসেচকৃত জমি সাড়ে চার একর ও পঁচিশ একর পর্যন্ত খাজনা মওকুফ করা হবে।

১০. শিল্পক্ষেত্রে ইজারাদারী ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসান করা হবে। বিদেশি পুঁজি বাজেয়াপ্ত করণ, বিদেশি ব্যবসা বাণিজ্য এবং সকল ব্যাংক, বীমা, শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হবে। পাট ব্যবসাকে জাতীয়করণ করা হবে। কুটির শিল্পকে উৎসাহিত করা হবে।

১১. শ্রমিক আইন সংস্কার করে উন্নত করে শ্রমিকদের কলকারখানার লভ্যাংশের অংশীদার করা, ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, ধর্মঘট ও সম্মিলিত দর কষাকষির অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হবে।

১২. দেশের উভয় অংশের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রতিরক্ষানীতির অনুকূল হলে নৌ বাহিনীর সদর দপ্তর পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তর করা হবে।

[৩] *দৈনিক পাকিস্তান*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৭০; *দৈনিক সংবাদ*, ৬-৮ নভেম্বর ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

১৩. স্বাধীন ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী পরারাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করা হবে। শর্তাধীন বিদেশি সাহায্যের পরিবর্তে শর্তহীন সাহায্য গ্রহণ করা হবে। সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে সম্পাদিত সকল প্রকার সামরিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক চুক্তি বাতিল করা হবে। সকল পরাধীন মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের চেষ্টা করা হবে।

জামায়াতে ইসলামি[৪]

জামায়াতে ইসলামি শান্তিপূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক পন্থায় রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তন আনতে ইচ্ছুক। এর লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানকে এমন একটি রাষ্ট্রে পরিণত করা যা কোরআন সুন্নাহর পূর্ণ অনুগত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শের অনুসারী। যেখানে ইসলামের মূলনীতি ও বিধি ব্যবস্থা পুরোপুরি বাস্তবায়িত হবে। জামায়াতে ইসলামি তাদের ইশতাহারে যে সকল বিষয় উল্লেখ করে সেগুলো হচ্ছে-

১. শাসনতান্ত্রিক ও স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে বলা হয়, ফেডারেল কেন্দ্রে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ গঠন করা হবে। নিম্নকক্ষ হবে জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে এবং উচ্চকক্ষ হবে সকল প্রদেশ থেকে সমান সংখ্যক প্রতিনিধিত্ব নিয়ে। প্রতিরক্ষা, মুদ্রা, বৈদেশিক বিষয় ও ফেডারেল, আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্য, আন্তঃপ্রাদেশিক যোগাযোগ এসব বিষয় কেন্দ্রের হাতে থাকবে। এসব বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয় শাসনতন্ত্র অনুযায়ী গঠিত সরকারগুলোর হাতে ন্যস্ত করা হবে এবং তাদের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন থাকবে। কোরআন ও সুন্নাহ আইনের প্রধান উৎস বলে স্বীকার করা হবে। সর্বস্তরে পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি চালু করা হবে। মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত ধারাগুলো থেকে সমস্ত অযৌক্তিক ও অসঙ্গত বিধিনিষেধ বাতিল করা হবে। সামরিক কর্মচারীসহ সকল সরকারি কর্মচারীদের কাছ থেকে এই শপথ নেয়া হবে যে, তারা কখনো দেশের শাসনতন্ত্র বাতিল করতে উদ্যোগী উর্ধ্বতন অফিসারদের নির্দেশ মানবেন না।

২. পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে জামায়াতে ইসলামির ঘোষণাপত্রে বলা হয়

ক. পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা দূর করা এবং সকল দিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের সমমানে উন্নীত করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপায় অবলম্বন সরকারের শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব হবে। এ উদ্দেশ্যে যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে-

ক.১. পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক বিষয়ের ব্যয় ও কেন্দ্রীয় সরকারের দেনায় পূর্ব পাকিস্তানের আনুপাতিক হিস্যা আদায়ের পর সম্পূর্ণ অর্থ পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় করা হবে। এছাড়া আর্থিক বৈষম্য দূর না হওয়া পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ বন্টনের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে অগ্রাধিকার দিবে।

[৪] *দৈনিক পাকিস্তান*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

ক.২. মুদ্রা, বৈদেশিক মুদ্রা, কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং, আঞ্চলিক বাণিজ্য ও যোগাযোগ এবং বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনার জন্য পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমসংখ্যক সদস্য নিয়ে একটি বোর্ড গঠন করা হবে।

ক.৩. পূর্ব পাকিস্তান থেকে পুঁজি পাচার প্রতিরোধ দূর করার জন্য সকল সম্ভাব্য উপায় অবলম্বন করা হবে। এছাড়া এখানে পুঁজি গঠন ও বিনিয়োগকে সর্বতোভাবে উৎসাহিত করা হবে।

ক.৪. প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে সকল সম্ভাব্য উপায়ে আত্মনির্ভরশীল করে তোলা কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব হবে।

ক.৫. স্থল ও বিমান বাহিনীর ডেপুটি প্রধান সেনাপতিদেরকে পূর্ব পাকিস্তানে নিযুক্ত করা হবে এবং তাদেরকে প্রয়োজনের সময় কার্যকর ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ গ্রহণের উপযোগী ক্ষমতা প্রদান করা হবে।

ক.৬. দেশের সকল সম্পদ এমনভাবে বন্টন করা হবে যাতে উভয় অঞ্চলের মাথাপিছু আয় সমপর্যায়ে উন্নীত হতে পারে।

ক.৭. পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা প্রতিরোধ, গঙ্গা ও তিস্তার উপর অবিলম্বে বাঁধ নির্মাণ, ব্রহ্মপুত্র বাঁধ ও পুল প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্র থেকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হবে। যাতে কৃষকরা খুব কম মূল্যে ব্যাপক পানি সেচের সুবিধা পেতে পারে।

ক.৮. ব্যাংক ও বীমা কোম্পানীগুলো পূর্ব পাকিস্তান থেকে যত আমানত ও কিস্তিমূল্য আদায় করবে, তা পুরোপুরিই পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় করা হবে।

৩. ইসলামের যেসব বিধান আইন হিসেবে একটি ইসলামী রাষ্ট্রে চালু থাকা উচিত সেগুলো প্রবর্তনের জন্য আইন প্রণয়ন করা হবে।

৪. মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে নামাজ কায়েমের জন্য সম্ভাব্য সকল উপায় ও সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। রমজানের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করা হবে। জনগণের মধ্যে ইসলামী শরিয়ত অনুযায়ী হুকুম আহকাম ও সাধারণ শিক্ষা প্রচারের জন্য সম্ভাব্য সকল উপায় অবলম্বন করা হবে।

৫. শিক্ষার প্রচলিত স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত ইসলামী জীবন দর্শন সংযুক্ত করা হবে।

৬. আর্থিক ক্ষেত্রে সম্পদের সুষম বন্টন, গুটিকয়েক লোকের হাতে সম্পদের কেন্দ্রীভূতকরণ প্রতিরোধ, অন্যায় জুলুম ও আর্থিক শোষণের মূলোচ্ছেদ, সকল নাগরিকের সমান সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হবে।

৭. অমুসলমান সংখ্যালঘুদের নাগরিক ও আইনানুগ অধিকার সংরক্ষণ করা হবে। তাদের জানমাল, ইজ্জত ও নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সরকার পুরোপুরি দায়িত্বশীল হবে।

৮. সরকারি উদ্যোগে যাকাত, সদকা এবং সাধারণ নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে ফি সাবিলিল্লাহ সাহায্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হবে। এ তহবিলের টাকা বৃদ্ধ, অচল, পঙ্গু, অক্ষম, এতিম গরিব শিশু, বেকার লোকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, গরিব লোকদের চিকিৎসা প্রদান, মসজিদের সার্বিক উন্নয়নে ব্যয় করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান পিপলস পার্টি[৫]

পাকিস্তান পিপলস পার্টির নির্বাচনী ইশতাহারের গুরুত্বপূর্ণ দিক গুলো হল–

১. ইসলামী মূল্যবোধ ও দেশের জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে একটি ভেদ বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। সমাজের সকল প্রকার অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার জন্য সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে।

২. গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য দেশে মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও সভাসমিতি অনুষ্ঠানের স্বাধীনতা, ভোটাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। জনগণের ইচ্ছানুযায়ী প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রথা প্রবর্তিত হলে সমাজে বর্তমান সকল ধরনের স্বজনপ্রীতি, তোষণ নীতি ও দুর্নীতি সমূলে উৎপাটিত হবে।

৩. পিপলস পার্টি দেশের প্রশাসন যন্ত্রের সকল স্তর থেকে দুর্নীতি নির্মূল করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তারা ক্ষমতায় গেলে নিম্নশ্রেণীর সরকারি কর্মচারী, ছোট দোকানদার তথা নির্যাতিত শ্রেণীর সকল সমস্যার সমাধান করবে। যেসব সুযোগ সুবিধা দেশের গুটি কতক লোকের হাতে সব সম্পদ ও ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করেছে, পিপিপি ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এ চাণক্য নীতির অবসান ঘটাবে। ভাষা, অঞ্চল, গোত্র নির্বিশেষে সকলকে সমান সুযোগ সুবিধা প্রদান করবে।

৪. জাতীয় সম্পদ আহরণকারী কৃষক শ্রমিকরা তাদের পরিশ্রমের ফল ভোগ করার ন্যায়ত অধিকার রাখে। এ অধিকার প্রবর্তিত হলে শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমীদের শোষণ নীতির অবসান ঘটবে। পার্টি শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার দেয়ার আশা পোষণ করে যাতে শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়নগুলোর মাধ্যমে নিজেদের সুসংহত করার সুযোগ পাবে।

৫. শিল্প কারখানার শ্রমিকদের কাজের বর্তমান অবস্থার অগ্রগতি সাধন করা হবে। আইএলও নীতিমালা প্রবর্তন করা হবে। শ্রমিকদের রুটি রুজির নিশ্চয়তা বিধান, বিনামূল্যে চিকিৎসা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। শ্রমিকদের কলকারখানার অংশীদার করা হবে। গ্রামের কুটির শিল্পীদের করভার থেকে অব্যাহতি দেয়া হবে এবং তাদের পেশার উন্নয়নে সাহায্য প্রদান করা হবে।

৬. শিক্ষা দীক্ষার অবাধ অধিকার দেয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিল করা হবে। সবার জন্য বিনা ব্যয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। বয়স্কদের শিক্ষার সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হবে। শিক্ষকদের বেতন বাড়ানো হবে। শিক্ষাজীবন থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে যোগ্যতা অনুসারে সবার কর্মসংস্থান করা হবে।

৭. বিদেশি হানাদারদের উপযুক্ত শিক্ষা দেয়ার জন্য গণবাহিনী গঠন করা হবে। কোনো প্রকার তাসখন্দ চুক্তি করা হবে না। নির্যাতিত কাশ্মীরীদের যে কোনো ত্যাগের বিনিময়ে মুক্ত করা হবে।

৮. দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক লুটতরাজ নির্মূল করার জন্য অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন করা হবে।

[৫] *দৈনিক পাকিস্তান*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)[৬]

পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম লীগ তাদের নির্বাচনী ইশতাহারে যে সকল বিষয় উল্লেখ করে সেগুলো হল–

১. প্রদেশসমূহের সমন্বয়ে পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেল রাষ্ট্র। প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রাব্যবস্থা থাকবে কেন্দ্রের হাতে। প্রদেশগুলো পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ভোগ করবে এবং কেন্দ্রের বিষয়গুলো ব্যতীত অন্য সকল বিষয় প্রদেশের হাতে থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনোভাবেই প্রদেশের ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করবে না। সরকার পার্লামেন্টারি পদ্ধতির হবে। আইন পরিষদ নির্বাচিত হবে প্রত্যক্ষ এবং বয়স্ক ভোটে এবং পরিষদে প্রদেশের প্রতিনিধিত্ব হবে জনসংখ্যাভিত্তিক।

২. নিম্নলিখিত কারণে পাকিস্তানের রাজধানী ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানাদি এখন থেকে পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করতে হবে।

ক. এ ব্যবস্থা কিছু সময়ের মধ্যে পাকিস্তানের দুই অংশের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার ব্যাপারে সহায়ক হবে।

খ. এককভাবে পশ্চিম পাকিস্তানে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থিতিই পাকিস্তানের দুই অংশের বর্তমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের জন্য বহুলাংশে দায়ী।

গ. পাকিস্তানবাসীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এই ব্যবস্থায় ফেডারেল রাজধানী ও কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠানাদির ফায়দা ভোগী হওয়ার সুযোগ পাবে।

৩. ক. সশস্ত্রবাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে এমন সংখ্যক অতিরিক্ত লোক নিয়োগ করা হবে। যাতে পাকিস্তানের পূর্ব পাকিস্তানী সৈন্য ও অফিসারদের মোট সংখ্যা প্রদেশের জন্যসংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী হয়।

খ. প্রদেশ থেকে বাইরের হামলা প্রতিহত করার উপযোগী প্রতিরক্ষা ইউনিট স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর এবং প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সজ্জিত সামরিক প্রতিষ্ঠানাদি প্রতিটি প্রদেশে মোতায়েন ও স্থাপন করা হবে।

৪. কেন্দ্রীয় চাকুরী ও রাষ্ট্রদূত পদে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব হবে জনসংখ্যাভিত্তিক এবং অনধিক পাঁচ বছরের মধ্যেই এই প্রতিনিধিত্ব হাসিলের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. ব্যবসা বাণিজ্যে ও শিল্পে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সরকারি বেসরকারি উভয় খাতের অর্থ বিনিয়োগ এবং প্রতিষ্ঠানাদি এমনভাবে ভাগ করে স্থাপন করা হবে যাতে পাকিস্তানের উভয় অংশই সমানভাবে উন্নত হয় এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনীতি গড়ে উঠে এবং অনধিক দশ বছরের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় পশ্চিম পাকিস্তানের সমান হবে।

[৬] *দৈনিক পাকিস্তান*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৭০

৬. দেশের অর্থনীতি এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে, যাতে সাধারণ স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর গুটিকয়েক হাতে সম্পদ জমা না হয়ে যায় এবং ব্যতিক্রমহীন ভাবে দেশের সকল লোকদের জীবনযাত্রার মান উন্নীত হয় এবং জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক জিনিসপত্র যেমন অন্ন, বস্ত্র, গৃহ, ওষুধপত্র ও শিক্ষা সবাই পায়।

৭. শিক্ষার সর্বস্তরে কোরআন ও দীনিয়াত শিক্ষা, কারিগরি ও সাধারণ শিক্ষা এবং পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানে নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত বাংলা ও উর্দু শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে।

পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কনভেনশন)[৭]

পাকিস্তান কনভেনশন মুসলিম লীগ ইসলামী মূল্যবোধ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতি ও বাস্তব বিধি ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দিয়ে তাদের নির্বাচনী ইশতাহার ঘোষণা করে। ইশতাহারের মূল বিষয়গুলি ছিল-

১. কোরআন ও সুন্নাহর বিধিকে দেশের চূড়ান্ত আইনরূপে গণ্য করা হবে। কোরআন ও সুন্নাহর সাথে সঙ্গতি রেখে প্রচলিত আইন সংস্কার করা হবে।

২. বিভিন্ন মতাবলম্বী আলেমদের মধ্যে গ্রহণযোগ্য বিষয়ে বিস্তৃত নীতি প্রণয়নের জন্য সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি, প্রবীন আইনজীবি ও খ্যাতনামা আলেম সমন্বয়ে একটি বোর্ড গঠন করা হবে।

৩. শরিয়তের বিধি মোতাবেক মহিলাদের অধিকার ও সুযোগ সুবিধার নিশ্চয়তা প্রদান করা হবে।

৪. মসজিদকে নামাজের কেন্দ্রের পাশাপাশি সমাজসেবা ও তাবলিগের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হবে। যাকাত, ফেতরা, ওয়াকফ, বদান্যতা ও বৃত্তিমূলক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এতিমখানা, অন্ধ, পঙ্গুসহ অক্ষম ব্যক্তিদের সাহায্যের জন্য প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এগুলো পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠিত কার্যালয় সমূহ পরিচালনার জন্য আলাদা বিভাগ প্রবর্তন করা হবে। এ বিভাগের কাজ সমাধার জন্য বায়তুল মাল পৃথক ভাবে সৃষ্টি করা হবে।

৫. পাকিস্তানে এমন একটি গণসরকার প্রতিষ্ঠা করা হবে যেখানে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা রূপ লাভ করবে। ফেডারেল পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার পাকিস্তানে প্রবর্তন করা হবে। কর্তব্য পালনে কেন্দ্রীয় সরকারকে বিশেষ দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রদান করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র, মুদ্রা ও কেন্দ্রীয় করব্যবস্থা, আন্তঃআঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং বৈদেশিক বাণিজ্য। সামরিক বাহিনীতে লোক নিয়োগ, সামরিক অফিসারদের ট্রেনিং, সামরিক অস্ত্রশস্ত্রের উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং সুসজ্জিত স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনী ইত্যাদি পরিচালনায় পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অংশের জনগণ সমানভাবে অংশগ্রহণ করবে।

[৭] *দৈনিক পাকিস্তান*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি[৮]

পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি তাদের নির্বাচনী ইশতাহারে যেসব বিষয় উল্লেখ করে সেগুলো হলো–

১. কোরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক সুবিচার, সমঅধিকার, স্বাধীনতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ ও মানবিক মর্যাদার নীতির ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলা হবে।

২. আইনের চোখে সমঅধিকার, বাক স্বাধীনতার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সংঘবদ্ধ হওয়ার অধিকার, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সহ সব রকমের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হবে। সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণ করা হবে।

৩. কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র, মুদ্রা ও ফেডারেল অর্থ দপ্তর, আন্তঃপ্রাদেশিক ও বৈদেশিক বাণিজ্য ও যোগাযোগ। কেন্দ্রীয় পরিষদ হবে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট। যুক্ত অধিবেশনের সময় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমতা বজায় রাখা হবে।

৪. পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন থাকবে। অবশিষ্ট অন্যান্য ক্ষমতা শাসনতন্ত্র অনুসারে দুই অংশের সরকারের হাতে থাকবে।

৫. আগামী ১০ বছরের মধ্যে দেশের দু'অংশের মধ্যেকার অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার জন্য পাকিস্তান সরকারের শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব থাকবে। এ সময়ের মধ্যে বৈদেশিক ঋণ আছে বা হবে তা কেন্দ্রীয় দায় পরিশোধে পূর্ব পাকিস্তান আনুপাতিক অংশ দিবে। পূর্ব পাকিস্তান কর্তৃক আয়কৃত বৈদেশিক মুদ্রা এ অংশে খরচ করা হবে। দু'অংশের আয়কৃত বৈদেশিক মুদ্রা নিজ নিজ সরকারের হাতে থাকবে। একটি মুদ্রানীতি করা হবে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা বাইরে যেতে না পারে।

৬. সকল দেশরক্ষা সার্ভিসে দুই অংশ থেকে সমসংখ্যক প্রতিনিধি গ্রহণের জন্য পূর্ব পাকিস্তানে মিলিটারী একাডেমী, অস্ত্র কারখানা, ক্যাডেট কলেজ ও স্কুল স্থাপন এবং নৌ বাহিনীর সদর দপ্তর স্থাপন করা হবে।

৭. পাকিস্তানের স্বার্থ ও সংহতি সংরক্ষণে সক্ষম স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতির অনুসরণ করা হবে।

৮. পূর্ব পাকিস্তানে ২৫ বিঘা পর্যন্ত চাষযোগ্য ভূমি এবং শহরাঞ্চল ব্যতীত সকল বসত ভাটির ভূমি রাজস্বের অবসান করা হবে।

প্রচারণা কার্যক্রম

১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অনুমতি দেয়া হয় যা এতদিন ধরে স্থগিত রাখা হয়েছিল। বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ এক দীর্ঘ নির্বাচনী অভিযান শুরু করে। নির্বাচন অভিযান চলেছিল এক বছর ব্যাপী। নির্বাচনে ১১টি

[৮] *দৈনিক পাকিস্তান*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক দল পাকিস্তানের উভয় অংশে তাদের প্রার্থী মনোনয়ন দেয়। নির্বাচনী প্রচারণার সময় দেখা যায় যে, আওয়ামী লীগ ও পাকিস্তান পিপলস পার্টির সবচেয়ে বেশি জনসমর্থন রয়েছে যেখানে জাতীয় ভিত্তিক দল যেমন জামায়াতে ইসলামি, পিডিপি, মুসলিম লীগের খুব কমই জনসমর্থন রয়েছে।[৯] নির্বাচনী প্রচারণার সময় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলি বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করে। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ছিল একমাত্র রাজনৈতিক দল যাদের সমালোচনায় লিপ্ত ছিল অন্য দলগুলো বিশেষ করে ডানপন্থীদের মধ্যে জামায়াতে ইসলামি, পিডিপি ও মুসলিম লীগের তিনটি গ্রুপ, অন্যদিকে বামপন্থীদের মধ্যে ছিল ন্যাপ ভাসানী ও ওয়ালী গ্রুপ।[১০]

নির্বাচনের পূর্বে পশ্চিম পাকিস্তানের সরকার সিদ্ধান্ত নেয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে তাদের দলের ইশতাহার ও নীতি যাতে সরকারি বেতার ও টেলিভিশনে প্রচার করতে পারে সে সুযোগ দিবে। এটি সর্বপ্রথম অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে রাজনীতিবিদদের সরকারি মালিকানার বেতার টেলিভিশনকে তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য ব্যবহারের সুযোগ দেয়া হয়। এই সিরিজ বক্তৃতা শুরু হয় ২৮ অক্টোবর ১৯৭০ সালে এবং ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। এ সময়ের মধ্যে ১৪টি দলের নেতৃবৃন্দ ভাষণ দেন। এটি শুরু হয় আওয়ামী লীগের শেখ মুজিবের মধ্য দিয়ে এবং শেষ হয় সংযুক্ত সিন্ধু ফ্রন্টের জি.এম. সাঈদ দ্বারা। প্রথম বক্তৃতার ভার পড়ে শেখ মুজিবুর রহমানের উপর। কারণ বর্ণমালা অনুসারে আওয়ামী লীগের 'আ' সকল দলের নামের প্রথমে আসে।[১১] সরকারের এই উদ্যোগের প্রশংসা করে আবুল মনসুর আহমদ বলেন,

> পাকিস্তনের ইতিহাসে শুধু পাকিস্তান কেন, পাক ভারত উপমহাদেশে, এমনকি আফ্রো এশিয়ায় এই সর্বপ্রথম নির্বাচন প্রতিযোগিতায় শরিক সব পার্টির নেতাদের রেডিও টেলিভিশনে নিজ নিজ পার্টির প্রোগ্রাম সম্বন্ধে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দিবার সুযোগ দেওয়া হইল। এটা করিলেন স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া। আফ্রো এশিয়ান গণতন্ত্রের জীবনে একটা নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করিলেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া।[১২]

আওয়ামী লীগ

১৯৭০ সালের জানুয়ারিতে রাজনৈতিক কার্যকলাপের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের অনেক আগেই আওয়ামী লীগ তার নির্বাচনী প্রচারাভিযান শুরু করে। নির্বাচনী এলাকাগুলির বৃহত্তম অংশের স্বার্থের দিকে খেয়াল রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়। পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সকল রাজনৈতিক দল যখন আলোচনা, জল্পনায় ব্যস্ত তখন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নির্বাচনের প্রস্তুতিতে সম্পূর্ণ মনোযোগ দেয়। এ জন্য শেখ মুজিব অন্য নেতাদের সঙ্গে নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জেলাগুলি সফর করেন। তিনি জেলা ও মহকুমা পর্যায়ে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। কেননা এ সময় সামরিক আইন বলবৎ থাকায় জনসভা অনুষ্ঠানের উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। শেখ মুজিবের ভাষণের মূল বক্তব্য ছিল ছয় দফার দলীয় দাবিগুলি পূরণ, সর্বজনীন বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের বিধান সম্বলিত

[৯] Wadud, *ibid*, pp 148-149
[১০] *Ibid*, p 150
[১১] মুকুল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৫
[১২] আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা, খোশরোজ কিতাবমহল, পুনমুদ্রণ ২০০৬, পৃ. ৫৩৯

Dhaka University Institutional Repository

শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য জনপ্রতিনিধিত্বশীল জাতীয় পরিষদ গঠন। শেখ মুজিব পরিস্কার ভাবে বলেন, আওয়ামী লীগের প্রথম ও সর্বাগ্রে লক্ষ্য হলো, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বায়ত্তশাসন অর্জন করা। পরে অন্যান্য পরিবর্তন আসবে। আর সেগুলি এর আগে যেমন ঘটবে না, তেমনি যুগপৎ স্বায়ত্তশাসনের সাথেও তা আসবে না। তিনি আরো স্পষ্ট করে বলেন, দ্বিতীয় দফায় পরিবর্তনগুলিকে ক্রমান্বয়ে খাপ খাইয়ে নিয়ে প্রবর্তন করা হবে।[১৩] শেখ মুজিব অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদের কথা বলেন এবং জয় বাংলা ছিল তাদের মূল স্লোগান। তিনি পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক বাঙালিদের শোষণের কথা তুলে ধরেন এবং বলতে থাকেন ছয় দফা দাবির মাধ্যমে এ শোষণ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। তিনি ইসলাম পছন্দ দলগুলির সমালোচনা করে বলেন যারা মনে করে ধর্মীয় বন্ধন পাকিস্তান রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি এবং ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে তারা পাকিস্তান রাষ্ট্রের শত্রু। তিনি ধর্মকে রাজনীতির উর্ধ্বে রাখার চেষ্টা করেন।[১৪] তিনি বলেন, 'I am a Muslim and I have firm faith in the Almighty God. . . none should utilize the name of Islam for any ulterior objective.[১৫] তিনি বলেন হিন্দু ও মুসলমান উভয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের অংশ। তিনি হিন্দুদের উদ্দেশ্যে আবেদন জানিয়ে বলেন তাদের দেশত্যাগ করে ভারতে যাওয়ার দরকার নেই। হিন্দুদের তাদের মুসলমান ভাইদের পাশাপাশি জন্মভূমিতে থাকার সমঅধিকার রয়েছে। আওয়ামী লীগের রাজনীতি বাঙালি পুর্নজাগরণের সংস্কৃতি থেকে গড়ে ওঠা যা ভাষা আন্দোলনের সময় থেকে গড়ে ওঠেছিল। বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও অসাম্প্রদায়িকতার পাশাপাশি আওয়ামী লীগ সংসদীয় গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করে।[১৬] এ সময় পূর্ব পাকিস্তানের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা হিসেবে শেখ মুজিবের রাজনৈতিক তৎপরতা পর্যবেক্ষক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এ সময়ে তাঁর জীবনে একটি অভাবিত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তিনি পূর্ববাংলার স্বাধীনতার সাথে সমাজতন্ত্রের কথাও বলতে শুরু করেন। সমসাময়িক রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল শেখ মুজিবের রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে সাধিত এ পরিবর্তনকে অভাবিত মনে করে তাকে ব্যঙ্গ করতে থাকেন। বিশেষ করে তৎকালীন পাকিস্তানে যারা নিজেদের সমাজতন্ত্রের একমাত্র 'সোল এজেন্ট' বলে ভাবতেন, শেখ মুজিব প্রধানত তাদের আক্রমণের শিকার হন। এনায়েতুল্লাহ খান সম্পাদিত সাপ্তাহিক হলিডে বঙ্গবন্ধুর সমাজতান্ত্রিক চিন্তাকে ব্যঙ্গ করে কার্টুনও প্রকাশ করে। ১৯৭০ সালে শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ঘোষণায় 'সমাজতন্ত্র' শব্দটি যোগ করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেন। এ সময়ের বিভিন্ন বক্তৃতা, বিবৃতি ও সাক্ষাৎকারে তিনি যে বক্তব্য রাখেন তা তাঁর নতুন রাজনৈতিক গতিধারার গুরুত্বপূর্ণ চিহ্নবাহী।[১৭] এ সমাজতন্ত্র কোনো মার্কসীয় সমাজতন্ত্র ছিল না। এটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাচে গড়ে ওঠা মতবাদ যা একান্ত শেখ মুজিবের সুযোগ্য চিন্তার ফসল। যশোরের এক জনসভায় শেখ মুজিব বলেন তাঁর দল যে সমাজতন্ত্রের ধারণা চালু করেছে তা দেশের জন্য প্রয়োজন। এটা বাইরের কোনো দেশ থেকে আমদানি করা হয় নি। তিনি বলেন এই দেশের ভবিষ্যৎ সমাজ হবে সমতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার এবং আইনের চোখে সবাই সমান

[১৩] শ্যামলী ঘোষ, হাবীব-উল-আলম অনুদিত, *আওয়ামী লীগ ১৯৪৯-১৯৭১*, ঢাকা, ইউপিএল, ২০০৭, পৃ. ১৮৩
[১৪] *দৈনিক মর্নিং নিউজ*, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯
[১৫] *ঐ*, ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯
[১৬] G.P. Bhattacharjee, *Renaissance and Freedom Movement in Bangladesh*, Calcutta, The Minerva Associates, 1973, p. 250
[১৭] মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, কলকাতা, এ হাকিম এন্ড সন্স, ১৯৯৪, পৃ. ১৯৭

Dhaka University Institutional Repository

হবে।[১৮] চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগের এক জনসভায় তিনি আওয়ামী লীগের সমাজতন্ত্র বলতে বুঝান শোষণমুক্ত সমাজ। এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন-

> 'We shall not import this socialism either from Russia or from China; The elected representatives of the people would build up this socialism according to the needs of the country and on the basic of national resources. By natural resources my party means environment, religion, social customs and attitude to the life, national health and genius of the people.'[১৯]

নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব কামরুজ্জামান লাহোরে পাঞ্জাব ছাত্রলীগের সমাবেশে বলেন, প্রত্যেক দেশের নিজস্ব কিছু অদ্ভুত সমস্যা রয়েছে যেটি তার নিজস্ব উপায়ে সমাধান করতে হয়। তিনি বলেন সমাজতন্ত্রের মূল ধারণা হচ্ছে সুপরিকল্পিত অর্থনীতির মাধ্যমে দেশের জাতীয় সম্পদের সুষম বন্টন। তিনি আরো উল্লেখ করেন আওয়ামী লীগের আন্দোলন হবে সামাজিক আন্দোলন যা পাকিস্তানের সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে যা এতদিন গুটিকয়েক পরিবারের হাতে নিয়ন্ত্রিত হতো।[২০] আওয়ামী লীগ শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সামাজিক উন্নয়ন ব্যাখ্যা করেনি। তারা বিশ্বাস করে যে একটি সামাজিক বিপ্লব ও সামাজিক অর্থনীতি যা গণতান্ত্রিক উপায়ে অর্জন করা যাবে। শেখ মুজিব দাবি করতেন তাঁর দল ডান বাম কোনো পন্থা নয় বরং মধ্যপন্থা নীতি অনুসরণ করে।[২১]

আওয়ামী লীগ শুরু থেকেই নির্বাচনকে আন্তরিকতার সাথে নিয়েছে। এটা দ্বারা বুঝায় না যে শেখ মুজিব মনে করতেন নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল সমস্যার সমাধান হবে। শেখ মুজিবের এ সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল যে শাসক শ্রেণী সহজেই আনন্দের সাথে জনগণের রায় মেনে নিবে না। যার কারণে তিনি জনগণকে আরেকটি সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেন। তিনি চেষ্টা করবেন নির্বাচনের মাধ্যমে ছয় দফার দাবি অনুযায়ী সমাধানের উপায় খোঁজা। তাই আওয়ামী লীগ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল অন্য কোনো দলের সাথে আতাঁত না করতে। ওয়ালী ন্যাপ আওয়ামী লীগের সাথে আতাঁত গড়ে তুলতে সবচেয়ে আগ্রহী ছিল। ওয়ালী ন্যাপের নেতা মোজাফফর আহমেদ তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা বিবৃতিতে বলেন, আওয়ামী লীগের ছয় দফা দাবি বাস্তবায়ন হওয়া জরুরী কিন্তু তা বড় কোনো শক্তিশালী আতাঁত ছাড়া সম্ভব নয়। শেখ মুজিব এর 'ছয় দফা' ও ছাত্রদের 'এগার দফা'র মধ্যে অভিন্ন বিষয়গুলি নিয়ে ঐক্য হতে পারে।[২২] শেখ মুজিব ছাত্রলীগকে বলেন, "যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমে জনগণের কোনো সত্যিকারের কল্যাণ নিশ্চিত করা যাবে না।" তিনি জোর দিয়েই বলেন, "আমরা দল বা নেতাদের ঐক্য চাই না, আমরা জনগণের ঐক্য চাই।" তিনি আরো বলেন, যদি অন্যান্য দলের সদস্যরা আওয়ামী লীগের আদর্শ বিশ্বাস করে তাহলে তাদের নিজ নিজ সাইনবোর্ড বদলে আওয়ামী লীগে যোগ দেওয়া উচিত। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট রাজনীতির উল্লেখ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তিনি আবার একই স্বাদ নিতে প্রস্তুত নন। তাঁর উল্লেখিত সমমনা দল

[১৮] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩১ আগস্ট ১৯৬৯
[১৯] *দৈনিক মর্নিং নিউজ*, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯
[২০] *ঐ*, ২ এপ্রিল ১৯৭০
[২১] *দৈনিক মর্নিং নিউজ*, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯
[২২] *দৈনিক সংবাদ*, ৮ জানুয়ারি ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

বলতে পূর্ব পাকিস্তান ন্যাপ মোজাফফর-ই ছিল স্পষ্টতই সেই দল। এ দলটি নির্বাচনের জন্য বারবার যুক্তফ্রন্ট গঠনের তাগিদ দিয়ে আসছিল। পূর্ব পাকিস্তান ন্যাপ মোজাফফর-ই ছিল একমাত্র রাজনৈতিক দল যা প্রায় সকল মৌলিক সমস্যার সমাধানের প্রশ্নে আওয়ামী লীগের মতবাদের সবচেয়ে কাছাকাছি।[২৩] কিন্তু শেখ মুজিব ১৯৬৯ সাল থেকে বলে আসছিলেন যে, যেভাবেই হোক যে পন্থায় হোক আওয়ামী লীগ ছয় দফা কর্মসূচি বাস্তবায়িত করবে। অবশ্য এর জন্য শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তা করা হবে। তবে জনপ্রতিনিধিরা পরিষদের ভিতরে যদি কাজটি করতে না পারেন তাহলে তা জনসাধারণকে পরিষদের বাইরেই করতে হবে। যদি রাজপথে এ ইস্যু সমাধান করতে হয় তাহলে এক বিশাল আন্দোলনের প্রয়োজন হবে যা কোনো বিশেষ একটি দলের সাংগঠনিক সামর্থে কুলাবে না। এ আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনে রূপ নিবে। তাই আওয়ামী লীগ কারো সাথে জোট না বাধলেও তাঁর তেমন কোনো ক্ষতি হবে না। অথচ নির্বাচনের পর স্বায়ত্তশাসনের দাবি যে প্রক্রিয়াতেই পূরণ হোক না কেন, তা হবে আওয়ামী লীগের নামে। এজন্য আওয়ামী লীগ কোনো ধরনের আতাঁতের ব্যাপারে উদাসীন থাকে।[২৪] যারা আতাঁত চেয়েছিল তারা এ বিষয়টি জানত। আর সে কারণে তারা সবচেয়ে আধিপত্যশীল দলের সাথে থাকতে চেয়েছিল।

১৯৭০ সালের ৬ জুলাই আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব ৯ দিন ব্যাপী পশ্চিম পাকিস্তান সফর শেষে ঢাকা ফিরে এক সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচনে অংশ নেয়ার কথা ঘোষণা করেন। তিনি জানান, আওয়ামী লীগ এককভাবে নির্বাচন করবে। কারণ দলের জাতীয় ও প্রাদেশিক কার্যনির্বাহী কমিটি কোনো প্রকার নির্বাচনী ঐক্যজোট গঠন করার বিরোধিতা করেছে।[২৫] নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক ভাবে অংশগ্রহণ করে। কোনো আতাঁত প্রশ্নে আওয়ামী লীগের অনাগ্রহ দেখে মনে হয় এটি একটি সুচিন্তিত মতের প্রতিফলন। ১৯৭০ সালের জুন মাসে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে সাধারণ সম্পাদকের এক রিপোর্টে পরিস্কারভাবে বলা হয় যে, অন্যান্য দলের সঙ্গে নির্বাচনী আতাঁত হলে তাতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে। তাই এখন জনসাধারণকে তাদের নিজ প্রতিনিধি ও দল বেছে নিতে হবে। এক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ যে ব্যাখ্যা দিয়েছে তাতে বলা হয়-এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, আমরা দেশের অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তির সাথে কোনোই যোগাযোগ রাখবো না, ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, যদি আগামীতে রাজনীতি গণতন্ত্রের পথে না এগিয়ে যায় এবং আমরা গণআন্দোলন গড়ে তুলতে ও সংগ্রাম শুরু করতে বাধ্য হই সেক্ষেত্রে আমরা দেশের অন্যান্য গণতান্ত্রিক দলের সহযোগিতাকে স্বাগত জানাবো।[২৬] প্রথম দিকের এক জনসভায় বক্তৃতায় শেখ মুজিব ঘোষণা করেন যে, "পাকিস্তান টিকে থাকার জন্যই এসেছে এবং কোন শক্তিই একে ধ্বংস করতে পারবে না।[২৭] রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দাবিগুলো ছিল প্রথমেই বাঙালিদের দাবিসমূহ যা শেখ মুজিব কর্তৃক উচ্চারিত হয়েছিল। প্রথমত- শেখ মুজিব অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ দাবি করেছিলেন, দ্বিতীয়ত- তিনি ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন কারণ এর প্রতি তাঁর প্রধান আপত্তি ছিল প্রতিনিধি নির্বাচনের

[২৩] শ্যামলী ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৬
[২৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০১
[২৫] *দৈনিক পাকিস্তান*, ৭ জুলাই ১৯৭০
[২৬] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৫ জুন ১৯৭০
[২৭] *বাংলাদেশ ডকুমেন্টস*, পাকিস্তান সরকারের বৈদেশিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত, পৃ. ৮২

Dhaka University Institutional Repository

পদ্ধতি এক ব্যক্তি এক ভোট এর ভিত্তিতে ছিল না। এছাড়া তিনি কেন্দ্র ও প্রদেশের সম্পর্কের ব্যাপারেও আপত্তি তুলেছিলেন। তিনি এক ইউনিট ভেঙ্গে দেয়ার পক্ষপাতি ছিলেন। এছাড়া তিনি দাবি করেন রাজনৈতিক দলগুলোর পূর্ণ কর্মতৎপরতা প্রতিষ্ঠার। কেননা ইয়াহিয়া খানের জারিকৃত সামরিক শাসনের ফলে ঘরোয়া রাজনীতির আলাপ আলোচনা, সম্মেলন ও সংবাদ মাধ্যমে বিবৃতি দেয়ার অনুমতি থাকলেও জনসভা, মিছিল ও জনসমাবেশের অনুমতি ছিল না। আওয়ামী লীগ তার ছয় দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে নির্বাচনী প্রচারাভিযান চালায়। এ দল আগাগোড়া এ কথাই বলে যে, তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে পাকিস্তানে শোষণমুক্ত এক জনসমাজের অভ্যুদয় ঘটানো। নির্বাচনী প্রচারাভিযানের প্রধান ভাষণ গুলিতে কোনো ঐতিহ্যগত বা চিরায়ত শ্রেণীহীন সমাজ কিংবা কোনো নাস্তিক সমাজ সম্পর্কে কোনো কোনো মহল যাতে কোনো প্রকার আশংকার উদ্রেক না হয় সেদিকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়।[২৮] আওয়ামী লীগ তাদের ছয় দফা যেভাবে জনগণের কাছে পেশ করেন তাতে পাকিস্তানের সার্বভৌম মর্যাদায় কোনোরকম পরিবর্তন সাধনের দাবি ছিল না। প্রথম দফায় বলা হয়, "সরকারের ধরণ হবে ফেডারেল ও পার্লামেন্টারি পদ্ধতির।" শেখ মুজিব তাঁর নির্বাচনী বক্তৃতাসমূহে বারবার জোর দিয়ে বলেন যে, তিনি কেবল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন চাচ্ছেন, দেশকে ভাগ করা কিংবা তার ইসলামী আদর্শকে দুর্বল করা তাঁর লক্ষ্য নয়। আবুল মনসুর আহমদের ভাষায় বলা যায়, জনপ্রিয় পার্টিসমূহের মধ্যে কার্যত একমাত্র আওয়ামী লীগই ছয় দফার ভিত্তিতে সে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। জনগণ তাদের অন্তরের প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়াছিল। তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সার্বভৌমত্বের সামনে সামরিক প্রেসিডেন্টের এলএফও ঝড়ের মুখে তৃণখণ্ডের মতো উড়িয়া গিয়াছিল।[২৯]

১৯৭০ সালের ২ সেপ্টেম্বর নারায়ণগঞ্জের এক বক্তৃতায় তিনি বলেন, "ছয় দফা কার্যক্রম বাস্তবায়িত করা হবে এবং তাতে পাকিস্তানের সংহতি কিংবা ইসলাম বিপন্ন হবে না।" ২৪ সেপ্টেম্বর আরেক নির্বাচনী জনসভায় শেখ মুজিব নির্বাচনকে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে একটি গণভোট বলে অভিহিত করেন। ৬ নভেম্বর ১৯৭০ সিলেটে এক ভাষণে তিনি বলেন, "আওয়ামী লীগের ছয় দফা কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে কেবল আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে শাসনতন্ত্রে পূর্ববঙ্গের স্বার্থরক্ষার নিশ্চয়তা বিধান করা।"

আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতারাও একই ধরনের কথা বলেন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ ১৯৭০ সালের ২১ সেপ্টেম্বর নারায়ণগঞ্জে বলেন যে, ছয় দফা আদায়ের প্রশ্নটি দেশের অখণ্ডতা ও সংহতির সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। নিখিল আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব এ.এইচ.এম কামরুজ্জামান ১৯৭০ সালে লাহোরে এক জনসভায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, পাকিস্তানকে খণ্ডবিখণ্ড করা তাদের দলের উদ্দেশ্য নয়। এর আগে ১৯৭০ সালের ২১ জুন রাজশাহীতে এক জনসভায় বক্তৃতায় তিনি বলেন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ।[৩০] নির্বাচনী প্রচারণা যতই তুঙ্গে উঠছিল ততই শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা প্রকট হচ্ছিল। ফলত অন্যান্য দলের প্রায়

[২৮] শ্যামলী ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৭
[২৯] আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২৪
[৩০] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২২ জুন ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

সকল নেতাই শেখ মুজিবকে ও তাঁর ছয় দফাকে পাকিস্তানের বিরোধী বলে প্রচার করছিলেন।[৩১] অতীতের সঙ্গে তুলনা করলে শেখ মুজিবের নির্বাচনী অভিযান ছিল ১৯৪৫-৪৬ সালে জিন্নাহর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অভিযানেরই অনুরূপ। প্রচারাভিযান যতই এগিয়ে চলছিল ততই এটা প্রতীয়মান হচ্ছিল যে, শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ-ই পূর্ব পাকিস্তানে একমাত্র প্রতিনিধিত্বশীল দল। ১৯৬৯ সালের ১৮ জুলাই শেখ মুজিব তাঁর বাসভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন-ই হচ্ছে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের সমস্যার ভদ্রজনোচিত সমাধান। তিনি বলেন, ভদ্রলোকের চুক্তিতে কখনো বিচ্ছিন্নতার সুর ধ্বনিত হতে পারে না। শেখ মুজিব বলেন দরিদ্র জনগণের ন্যায্য দাবির প্রতিষ্ঠার জন্য আমার সংগ্রাম। আমি একজন সমাজতন্ত্রী।[৩২] বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে শেখ মুজিবের এরকম কঠোর মনোভাবের কারণ পাকিস্তানের রাজনীতিতে তাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে অভিহিত করা হতো। পাকিস্তান এবং ইসলামকে যেসব রাজনীতিবিদ এক করে ফেলতেন এবং ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতেন শেখ মুজিব ১৯৬৯ সালের ২৪ আগস্ট ঢাকা জেলা বার সমিতির সম্মেলনের বক্তৃতায় বলেন, পাকিস্তানে ইসলাম টিকে থাকবেই। কিন্তু ইসলামকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। তিনি বলেন, স্বায়ত্তশাসন মানে আলাদা হওয়া নয়। শক্তিশালী কেন্দ্রের তুলনায় শক্তিশালী পাকিস্তান আরো বেশি প্রয়োজন।[৩৩] ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ সালে চট্টগ্রামে এক বক্তৃতায় ৬-দফা কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজতন্ত্র কায়েমের পক্ষপাতিত্বের কথা বলেন। তিনি বলেন, ইসলাম সমাজতন্ত্রের পরিপন্থী নয়। কারণ ইসলাম চায় সামাজিক ন্যায়বিচার। তিনি আরো বলেন, দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করার জন্যে কারো ইসলামের নাম ব্যবহার করা উচিত নয়। ইসলাম ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।[৩৪] শেখ মুজিব জনগণের মধ্যে যেভাবে সমাজতন্ত্র সংক্রান্ত বক্তব্য ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন, তা ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এতদিন ধরে প্রতিক্রিয়াশীলরা সমাজতন্ত্রীদের জব্দ করার জন্য প্রধানত ধর্মকেই ব্যবহার করেছে। কিন্তু সমাজতন্ত্রীরা তাদের বিরুদ্ধে কখনো পাল্টা জবাব দিতে পারেনি। ১৯৭০ সালের ৭ জুন রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় জামায়াতে ইসলামি ও ন্যাপ ওয়ালীর সমালোচনা করে বলেন, জামায়াতে ইসলামি ইসলামের ঠিকাদার হতে চায়। এ দলটি ৩ বছরে ১১টি পত্রিকার মালিক হয়েছে এবং প্রচুর বই পত্র ছাপিয়েছে, এরা এত টাকা কোথায় পায়? ন্যাপ ওয়ালী মোজাফফর এর সমালোচনা করে বলেন একটি দল ঐক্য ঐক্য করে তাদের মাথা খারাপ করে দিচ্ছে। তাদের তিনি আওয়ামী লীগে যোগদানের আহবান জানান।[৩৫] ডিসেম্বরে নির্বাচন পিছিয়ে যাওয়ার পর পরই পাকিস্তান জুড়ে নির্বাচনী তৎপরতা পুরোদমে শুরু হয়ে যায়। এ সময় কাইয়ুম পন্থী মুসলিম লীগের সহ সভাপতি ওয়াহিদুজ্জামান শেখ মুজিবের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলে শেখ মুজিব ঘোষণা করেন, তিনি ওয়াহিদুজ্জামানের ভরাডুবি ঘটাবেন। ২৮ আগস্ট ১৯৭০ সালে মুসলিম লীগ নেতা কাজী কাদের ও ওয়াহিদুজ্জামান এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের সাক্ষী রেখে বলেন, যদি আওয়ামী লীগের নেতারা নির্বাচনে জিততে পারেন তাহলে তারা হাতের কবজি

[৩১] কামরুদ্দীন আহমদ, *স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং অতঃপর*, ঢাকা, ধ্রুপদ সাহিত্যাঙ্গন, ২০০৬, পৃ. ১০৫
[৩২] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯ জুলাই ১৯৬৯
[৩৩] *ঐ*, ২৫ আগস্ট ১৯৬৯
[৩৪] *ঐ*, ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯
[৩৫] *ঐ*, ৮ জুন ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

থেকে কনুই পর্যন্ত চুড়ি পরে বেড়াবেন।[৩৬] ওয়াহিদুজ্জামান বলেন গোপালগঞ্জ কেন্দ্র থেকে তিনি যদি আওয়ামী লীগ প্রার্থীর কাছে পরাজিত হন তাহলে তিনি রাজনীতি ছেড়ে দেবেন। কাজী কাদের বলেন, রাজশাহী কেন্দ্র থেকে আওয়ামী লীগ নেতা কামরুজ্জামান জিতলে তিনিও রাজনীতি ছেড়ে দিবেন।[৩৭] জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের ১৬২ আসনে এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩১৩ আসনে দলীয় মনোনয়ন দেয়ার জন্য শেখ মুজিবকে প্রধান করে একটি পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠন করা হয়।[৩৮] ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব ঢাকায় তাঁর দলের মনোনীত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন। এদিন তিনি নির্বাচনের পূর্বেই রাজবন্দিদের মুক্তি দাবি করে বলেন, একমাত্র সিন্ধু যুক্তফ্রন্ট ব্যতীত আওয়ামী লীগ আর কারো সাথে নির্বাচনী জোট করবে না। আওয়ামী লীগ-ই একমাত্র দল যারা পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সকল আসনেই প্রার্থী দেয়। আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রার্থীর সংখ্যা ছিল বিপুল। ১৯৭০ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর পূর্ব পাকিস্তানে থেকে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের তালিকা ঘোষণা করার সময় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও যুগপৎ আওয়ামী লীগের সংসদীয় বোর্ডের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমদ উল্লেখ করেন যে, যথাক্রমে জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের ১৬২ ও ৩০০ আসনের জন্য ৩৫৯ ও ১৫৫৬টি আবেদনপত্র পাওয়া গেছে।[৩৯] আওয়ামী লীগ নির্বাচনী দৌড়ের প্রথম ধাপে অন্য দলগুলির তুলনায় অনেক এগিয়ে থাকে। আওয়ামী লীগে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সকল আসনে প্রার্থী দেয়। সে তুলনায় মাত্র একটি দল জাতীয় পরিষদের ও দুইটি দল প্রাদেশিক পরিষদের ৫০ শতাংশের বেশি আসনে প্রার্থী দিতে সক্ষম হয়। আওয়ামী লীগ ও অন্য দলগুলির মধ্যে এ ব্যবধান থেকে বুঝা যায় যে, অন্য দলগুলির কোনোটিই পূর্ব পাকিস্তানের রঙ্গমঞ্চে নতুন ছিল না। অনেক বেশি সংখ্যক আসন নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রার্থী দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অক্ষমতার কথা প্রমাণ করে যে, তাদের প্রভাব ছিল একান্ত স্থানীয় পর্যায়ে।

আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ইস্যুকে সামনে রেখে যা ছয় দফা দাবির মধ্যে গুরুত্ব পায়। বেশিরভাগ ইসলামিক দলগুলো মনে করে যে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কোনো দরকার নেই কারণ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঘোষণা দিয়েছেন পাকিস্তানের পরবর্তী শাসনতন্ত্র ঠিক করবে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি। তাই কোনো দলের এটিকে নির্বাচনের ইস্যু বানানো উচিত নয়। এ দাবি পুরোপুরি অগণতান্ত্রিক। একমাত্র জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা নির্বাচিত পরিষদ এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিবে। এ দাবি তোলা হয় আওয়ামী লীগের অবস্থানকে দুর্বল করার জন্য। এমনকি মওলানা ভাসানী ইসলামী দলগুলির সাথে একাত্মতা করে তাদের এ দাবির প্রতি সমর্থন জানান।[৪০] পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান বলেন, যদি প্রেসিডেন্ট প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে নির্বাচনের পূর্বে সিদ্ধান্ত নিতেন তাহলে ছয় দফা দাবি উত্থাপনকারী পূর্ব পাকিস্তানী নেতাদের দাড়াঁনোর আর জায়গা থাকত

[৩৬] ওয়াহিদুজ্জামান নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিলেন। যার ফলশ্রুতিতে জনগণ তাকে পরার জন্য চুড়ি পাঠায়।
[৩৭] *দৈনিক আজাদ*, ২৯ আগস্ট ১৯৭০
[৩৮] মিজানুর রহমান চৌধুরী, *রাজনীতির তিনকাল*, ঢাকা, হাফেজ মাহমুদা ফাউন্ডেশন, ২০০১, পৃ. ৯৯
[৩৯] *দৈনিক পূর্বদেশ*, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৭০
[৪০] G. P. Bhattacharjee, *ibid*, p.254

Dhaka University Institutional Repository

না।[৪১] নসরুল্লাহ খান তাঁর যুক্তির পক্ষে ব্যাখ্যা দেন যে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি যদি অমীমাংসিত থাকে তাহলে পূর্ব পাকিস্তানের এক ধরনের সংকীর্ণ মনের রাজনীতিবিদরা একে নির্বাচনের ইস্যু হিসেবে ব্যবহার করবে এবং তা পাকিস্তানের উভয় অংশের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবে এবং ১২০ দিনের মধ্যে শাসনতন্ত্র রচনা করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।[৪২] পিডিপি প্রধান নূরুল আমীনও নির্বাচনের পূর্বে স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন মীমাংসা করার কথা বলেন।[৪৩] পূর্ব পাকিস্তান পিডিপি সভাপতি আবদুস সালাম খান পরামর্শ দেন নির্বাচনের পূর্বে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কেমন হবে তা ঠিক করা উচিত।[৪৪] পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামির আমির অধ্যাপক গোলাম আযমও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে অনুরোধ করেন নির্বাচনের পূর্বে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি সুরাহা করার জন্য।[৪৫] কাইয়ুম পন্থী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক খান আবদুস সবুর খান দাবি করেন প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি প্রেসিডেন্টের নিজের সমাধান করা উচিত।[৪৬] মওলানা ভাসানীও একই দাবি করেন। তিনি টাঙ্গাইলের সন্তোষে কৃষক সমাবেশে দাবি করেন নির্বাচনের পূর্বে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী সমাধান হওয়া উচিত। তিনি আরো বলেন প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি যদি নির্বাচনী ইস্যুতে পরিণত হয় তাহলে তা দেশের উভয় অংশের জনগণের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি করবে। শেখ মুজিবুর রহমানের মতামত ছিল স্বায়ত্তশাসন সহ সকল সাংবিধানিক সমস্যা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা হওয়া উচিত।[৪৭] মওলানা ভাসানীর দাবির সমর্থনে তিনি বলেন স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি নির্বাচনের পূর্বেই প্রেসিডেন্টের সমাধান করা উচিত। তিনি বলেন, 'We are not beggars. We know how to establish the rights of the people'.[৪৮] পূর্ব পাকিস্তান ওয়ালী ন্যাপের সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেন এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলেন প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে একমাত্র নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সিদ্ধান্ত নিবেন। তারা বিস্ময়ের সাথে আরো বলেন যে, ভাসানীর মত বামপন্থী একটি দল কি করে ডানপন্থী দলের সাথে হাত মিলিয়ে সামরিক শাসনের পক্ষে কথা বলেন।[৪৯] পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার ভুট্টো উল্লেখ করেন যে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই সিদ্ধান্ত নিবে।[৫০]

সাধারণ নির্বাচনে শেখ মুজিব ও ভুট্টো প্রায় একই সংগ্রাম নীতি বা কৌশল গ্রহণ করেন। শেখ মুজিব পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী প্রচার আর ভুট্টোর ছয় দফা বিরোধী প্রচারের ফলে নির্বাচনের শুরু থেকেই দু'অঞ্চলের লোকদের মধ্যে অবিশ্বাস ও

[৪১] *দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার*, ২৮ জানুয়ারি ১৯৭০
[৪২] *দৈনিক সংবাদ*, ২৯ জানুয়ারি ১৯৭০
[৪৩] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ মার্চ ১৯৭০
[৪৪] *ঐ*, ১৪ মার্চ ১৯৭০
[৪৫] *ঐ*, ২৭ মার্চ ১৯৭০
[৪৬] *দৈনিক সংবাদ*, ৩১ জানুয়ারি ১৯৭০
[৪৭] *ঐ*, ২২ জানুয়ারি ১৯৭০
[৪৮] *দৈনিক মর্নিং নিউজ*, ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭০
[৪৯] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৭ মার্চ ১৯৭০
[৫০] *দৈনিক সংবাদ*, ২৭ জানুয়ারি ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

দুরত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। সাধারণ নির্বাচনের শুরুতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান প্রত্যেক দলের নেতাকে রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যম বেতার টেলিভিশনে তাদের দলের কর্মসূচি ঘোষণা করার জন্য অনুরোধ জানান। তখন সকল মহল প্রেসিডেন্টের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানায়। কিন্তু গন্ডগোল বাধলো ২৮ অক্টোবর শেখ মুজিবের বক্তৃতা নিয়ে। শেখ মুজিবের কথা হচ্ছে, এ ভাষণে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের জায়গায় বাংলাদেশ এবং জয় বাংলা বলবেন। এছাড়া তাঁর এ লিখিত ৩০ মিনিটের বক্তৃতার সবটুকু পড়তে দিতে হবে; না হলে বক্তৃতা দিবেন না। বহু দেন দরবার ও ঢাকা পিণ্ডি যোগাযোগ করেও তার কোনো সুরাহা হল না। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত সময়ের ঘন্টাখানেক আগে পিণ্ডি থেকে খবর আসে শেখ মুজিব বাংলাদেশ নয় পূর্ববাংলা বলতে পারেন। এরপর শেখ মুজিব দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দান কালে ছয় দফা দাবির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দান করেন এবং জয় বাংলা ও খোদা হাফেজ বলে বক্তৃতা শেষ করেন।[৫১] শেখ মুজিব তাঁর বেতার ও টেলিভিশন ভাষণে উল্লেখ করেন যে, আওয়ামী লীগের ছয় দফা ও অন্যান্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উদ্দেশ্য সকলের প্রতি ন্যায়বিচার। কাজেই এসব কখনো ইসলাম বিরোধী হতে পারে না। কেননা ছয় দফা কর্মসূচি ছিল আওয়ামী লীগের প্রধান অবলম্বন। ১৯৬৬ সাল থেকে পরবর্তীকালে এ দল একটানা এ কর্মসূচি বাস্তবায়নকেই তাঁর একমাত্র না হলেও সর্বাগ্রগণ্য উদ্দেশ্য হিসেবে প্রচার করেছে। ১৯৭০ সাল নাগাদ এ কর্মসূচি পূর্ব পাকিস্তানি জনগণের ভবিষ্যৎ অস্তিত্বের প্রতীক হয়ে ওঠে। তাই ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ঠিক আগে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের অন্য যে কোনো রাজনৈতিক গোষ্ঠীর চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল।[৫২] শেখ মুজিব ও তাঁর রাজনৈতিক দল পূর্ব পাকিস্তানে এগিয়ে ছিল। আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সালের জুন মাসে একটি মিছিল বের করে যেখানে প্রায় ৪ লক্ষ লোক বৃষ্টিতে ভিজে মিছিলে অংশ নেয়। শেখ মুজিব তখন ঘোষণা দেন আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে ৭০-৮০% ভোট পাবে। অন্য রাজনৈতিক দলগুলো তাদের সমালোচনায় বলতে থাকে, নির্বাচন যদি স্বায়ত্তশাসন অর্জনের ক্ষেত্রে রেফারেন্ডম হয় তাহলে তা পশ্চিম পাকিস্তানে কোনো সমর্থন পাবে না। ডানপন্থী ও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো যুক্তি দেখায় যে, শেখ মুজিবের ছয় দফা দেশে কার্যকরী হবে না এবং এতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার বিষয়টি ভেঙ্গে পড়বে। শেখ মুজিবের কাছে প্রধান চ্যালেঞ্জ ছিল ন্যাপ ভাসানী। কারণ মওলানা ভাসানী ইসলামিক সমাজতন্ত্র প্রচার করেন এবং দেশের কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর ওপর তাঁর অসাধারণ প্রভাব ছিল। যা শেখ মুজিবের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বি হিসেবে দাড়াঁয়।[৫৩] কম গুরুত্বপূর্ণ দলগুলি যেমন পিডিপি, জামায়াতে ইসলামি, মুসলিম লীগের তিনটি গ্রুপ এদের প্রায়ই জনসমাবেশ করতে পুলিশি নিরাপত্তার প্রয়োজন হতো। এজন্য শেখ মুজিব এদের সমালোচনা করে বলেন যে, এসব দল সবসময় সামরিক শাসনের ছাতার নিচে থাকতে বেশি পছন্দ করে এবং নির্বাচনের পরে এসব দলের পূর্ব পাকিস্তানে কোনো স্থান হবে না।[৫৪]

[৫১] মুকুল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৫
[৫২] শ্যামলী ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৬
[৫৩] Wadud, *ibid*, pp.151-152
[৫৪] *Ibid*, p.152

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামী লীগ এর প্রধান শেখ মুজিব নির্বাচনী কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে সমগ্র পূর্ববাংলায় ঘুরে বেড়ান। এরপর তিনি নির্বাচনী প্রচারণার কার্যে পশ্চিম পাকিস্তান যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কারণ পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে নির্বাচনী প্রচারে সেখানেও অংশ নেয়া তাঁর কাছে আবশ্যক বলে মনে হয়েছিল। ১৯৭০ সালের ২৭ জুন করাচিতে রওয়ানা হওয়ার মুহূর্তে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, উভয় অংশের দরিদ্র মানুষের হক আদায়ই আমার লক্ষ্য। করাচিতে পৌছে তিনি বলেন, পাকিস্তান ২২ পরিবার নয়, ১২ কোটি মানুষের, এবারের নির্বাচনে সে প্রশ্নের মীমাংসা হবে।[৫৫] শেখ মুজিব পশ্চিম পাকিস্তানের করাচি ও লাহোরে বেশ কয়েকটি জনসভায় ভাষণ দেন।

সকল রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আওয়ামী লীগ ও পিপলস পার্টি ছিল সবচেয়ে বেশি সক্রিয়। তারা একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বির নাম উচ্চারণ করত। সকল রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাদের মধ্যে শেখ মুজিব ও ভুট্টো ছিলেন সবচেয়ে তরুণ, উদ্যমী, ব্যবহারের দিক দিয়ে মার্জিত, শক্তিশালী প্রচারণা চালিয়ে জনসমাগম ঘটাতে পারতেন। এ দুটি দলের মিছিল মিটিংয়ে তাদের অনুসারীরা তাদের নেতাদের ছবিসম্বলিত পোস্টার বহন করতেন।[৫৬] নির্বাচনী প্রচারণার প্রাথমিক পর্যায়েই এটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছিল যে, জাতীয় ইসলাম পছন্দ দলগুলোর সামান্যই জনসমর্থন ছিল। সমর্থনের ধারা ছিল আঞ্চলিকতামুখী ও বামপন্থী। বামপন্থী দলগুলো সাংবিধানিক পন্থায় পুরোপুরি বিশ্বাস করত না। তারা মনে করত কেবল সংঘাত ও সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমেই বাঙালির অধিকার আদায় করা সম্ভব। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়ায় আওয়ামী লীগ বামপন্থী দলগুলোর চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল।[৫৭] পরবর্তীকালে অন্য দলগুলোও প্রদেশব্যাপী মিছিল ও সভা সমাবেশের আয়োজন করেছে। কিন্তু জনসমর্থনের দিক দিয়ে প্রথম থেকেই আওয়ামী লীগ ছিল অন্যান্য সকলের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রণী অবস্থানে। আওয়ামী লীগের জনসমর্থন দেখে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো এ সময় আওয়ামী লীগের নামে মিথ্যাচার করতে থাকে যে তারা ভারতের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে তাদের নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহ করছে। নেতা ও কর্মীদের সকলেই ছিলেন উদ্বুদ্ধ, ভাবাবেগে বাঙালি জাতীয়তাবাদের অনুরক্ত। এ প্রসঙ্গে রাও ফরমান আলী উল্লেখ করেন-

> দলের ছিল ভাল সাংগঠনিক কাঠামো এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো আওয়ামী লীগ নির্ভরযোগ্য আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল। আওয়ামী লীগের অর্থ সম্পদ সীমাহীন বলে মনে হয়েছে। জনগণের কাছে নেতৃবৃন্দকে এবং দলকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে এই অর্থ সম্পদ সাহায্য করেছিল। একটি উদাহরণ দেয়া যাক, আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতীক ছিল নৌকা, সকল শহরের মোড়ে মোড়ে এবং দেশের সর্বত্র কাঠের তৈরি শতশত কাঠের নৌকা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। কেবল এজন্যই দলটির খরচ হয়েছে অন্তত এক কোটি টাকা। আওয়ামী লীগ এই অর্থ কোথা থেকে পেয়েছিল তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। আওয়ামী লীগের সদস্যরা ধনী ছিল না, জনগণও তাদের প্রচুর অর্থ দেয়ার মতো অবস্থায় ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের প্রতি গভীরভাবে নিবেদিত কোনো বড় শিল্পপতিও ছিল না। গুজব শোনা গেছে যে, ভারত আওয়ামী লীগকে তার প্রয়োজনীয় সকল অর্থের যোগান দিয়েছিল।[৫৮]

---

[৫৫] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৮ জুন ১৯৭০

[৫৬] Wadud, *ibid*, p.155

[৫৭] রাও ফরমান আলী, *বাংলাদেশের জন্ম*, ঢাকা, ইউপিএল, ১৯৯৬, পৃ. ৩১

[৫৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২

Dhaka University Institutional Repository

তাই আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তার কারণে পাকিস্তান পন্থী দলগুলো নিজেদের নির্বাচনী ব্যয় মিটানোর জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছিল। তাদের যুক্তি ছিল ১৯৭০ সালের নির্বাচন পাকিস্তানের ভাগ্য নির্ধারণ করবে। পাকিস্তান অখণ্ড রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকবে না বাংলাদেশের সৃষ্টি হবে, তা নির্ভর করছে নির্বাচনের ফলাফলের উপর।[৫৯]

নির্বাচনী প্রচারাভিযান পূর্ণ বেগে চলতে থাকে। শেখ মুজিব এবং অন্য নেতৃবৃন্দ সড়ক ও রেলপথ, নৌকাযোগে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। আওয়ামী লীগের মূল প্রচার ছিল ছয় দফা দাবি আদায় করা। এই উদ্দেশ্যে দলটি বাঙালি জাতীয়তাবাদকে তুলে ধরে। পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক শোষণ, অবিচার, চাকরিতে বৈষম্য, মুলধন পাচার, অবজ্ঞা বঞ্চনার কথা তারা তুলে ধরে। অব্যাহত এই প্রচারণা ক্রমান্বয়ে সরকারি কর্মচারীদের ওপর প্রভাব ফেলতে শুরু করেছিল, এটা উপজাতীয়তাবাদের একটা বৈশিষ্ট্য। এটা একবার ছড়িয়ে পড়লে সাধারণত এটা ছড়াতে থাকে। এর ফলে সরকারি কর্মচারী ও সংস্থাসমূহের আনুগত্য, দক্ষতা ও বিশ্বস্ততা মারাত্নকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে। সরকার তার নির্বাহীদের ক্ষমতা হারায়। যার ফলে শাসন কাজ পরিচালনা করার এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষার সামর্থ্যের ওপর প্রতিকূল প্রভাব পড়ে। সরকারের সিনিয়র সচিবসহ সরকারি কর্মচারীদের বেশিরভাগই আওয়ামী লীগের চিন্তাধারার সমর্থকে পরিণত হয়েছিল। সরকারের চেয়ে শেখ মুজিবের প্রতি তাদের আনুগত্য বেশি ঝুঁকতে থাকে।[৬০]

জামায়াতে ইসলামি

মাওলানা আবুল আলা মওদুদীর জামায়াতে ইসলামি ছিল একটি গোড়া ধর্মভিত্তিক দল যারা মনে করত মুসলিম লীগ ইসলামের প্রকৃত প্রতিনিধিত্বকারী দল নয়। মাওলানা মওদুদী মনে করতেন মুসলিম লীগ ইসলামকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে। জামায়াতে ইসলামি মনে করে যে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের যে দুঃখ দুর্দশা তা সত্যি এবং জামায়াত ইসলামি বিশ্বাস করে যে, এসব দুঃখ দুর্দশা তৈরি হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের ভুল নীতির কারণে। সঠিক ইসলামিক শাসনের মাধ্যমে এসব দুঃখ দুর্দশা দূর করা যাবে। জামায়াত ইসলামি বিশ্বাস করে ইসলামি আদর্শ, সংসদীয় গণতন্ত্র এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন পাকিস্তানের সংহতি রক্ষা করবে।[৬১] মাওলানা মওদুদী মনে করেন ১২০ দিনের মধ্যে কখনো-ই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা সম্ভব নয়। তিনি মনে করেন আওয়ামী লীগের ছয় দফার মাধ্যমে কখনো ফেডারেল সরকার গঠন করা যাবে না এবং আওয়ামী লীগের মিথ্যা জাতীয়তাবাদের মূল লক্ষ্য ভারতীয় ও আমেরিকানদের সহযোগিতায় পৃথক একটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি।[৬২] মওদুদী ও তাঁর দল বিশ্বাস করে যে, ইসলাম হচ্ছে একমাত্র শক্তি যা পাকিস্তানের মুসলমানদের একত্রিত করবে।[৬৩] তারা আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষতার সমালোচনা করেন। অধ্যাপক

[৫৯] রাও ফরমান আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩
[৬০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪
[৬১] *দৈনিক মর্নিং নিউজ*, ২৪ জুলাই ১৯৭০
[৬২] G.P. Bhattacharjee, *ibid*, p. 282
[৬৩] *দৈনিক মর্নিং নিউজ*, ২৯ জুন ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

গোলাম আযম মনে করেন, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও পূর্ব পাকিস্তানের দুঃখ দুর্দশা দূর করার সাথে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের কোনো সম্পর্ক নেই।[৬৪] অধ্যাপক গোলাম আযম বিশ্বাস করেন, শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বাঙালি জাতীয়তাবাদ দ্বারা পূর্ব ও পশ্চিম বাংলাকে একত্রিত করার চেষ্টা করছেন।[৬৫] অন্যান্য ইসলামিক দলগুলির মতো জামায়াতে ইসলামিও পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের বিরোধী কারণ এগুলি অনৈসলামিক। গোলাম আযমের মতে সমাজতন্ত্র হচ্ছে পুঁজিবাদের একটি জঘন্য রূপ।[৬৬] জামায়াত ইসলামি বিশ্বাস করে যে,

> The problem of communism could not be solved by oppression. Its progress could be retarded only by an alternative ideology a comprehensive movement. According to it the evil of communism "can only be neutralized by an equally potent all-embracing and positive movement- a movement which could present an ideology in reply to the Communistic ideology."[৬৭]

জামায়াতে ইসলামি পাকিস্তানের প্রধান মাওলানা আবু আলা মওদুদী ৩ নভেম্বর বেতার টেলিভিশন ভাষণে বলেন, জামায়াত পাকিস্তানে এমন একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে চায় যা খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ অনুসরণ করবে।[৬৮]

ন্যাপ (ভাসানী গ্রুপ)

মওলানা ভাসানীর ন্যাপ কোনো ঐক্যবদ্ধ দল ছিল না। এখানে অনেকগুলি ধারা বা উপদল তৈরি হয়েছিল যারা সকলে মওলানা ভাসানীকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। যখন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া পাকিস্তানে নির্বাচনের ঘোষণা দিলেন তখন ভাসানী মাওপন্থী নীতি অনুসরণ করে ঘোষণা দেন তাঁর দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না এবং চেষ্টা করবেন সহিংস উপায়ে সামাজিক বিপ্লব করার। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর মনের পরিবর্তন ঘটে এবং নির্বাচনে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৬৯ সালে ভাসানী বলেছিলেন তাঁর দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না। কিন্তু ১৯৬৯ সালের ৫ অক্টোবর সাংবাদিকদের বলেন যে, পাকিস্তানের সমস্যাগুলি একমাত্র সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব, নির্বাচনের মাধ্যমে নয়। তিনি বিশ্বাস করেন যে নির্বাচনের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তিনি পরামর্শ দেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের উচিত সকল রাজনৈতিক দলের নেতাদের নিয়ে একটি গোলটেবিল বৈঠক আহবান করা এবং সেখানে স্থির হবে ভবিষ্যৎতের শাসনতন্ত্রের খসড়া কি হবে এবং তা গণভোটের মাধ্যমে নির্ধারিত হওয়া উচিত।[৬৯] মওলানা ভাসানী ছিলেন একজন কৃষক নেতা এবং তিনি ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কৃষক সমিতি গঠন করেন। কিন্তু আইয়ুব এর সময় এর কার্যক্রম খুব সীমিত ছিল। আইয়ুব খানের পতনের পর তিনি কয়েকটি কৃষক সম্মেলন করেন। এরকম একটি কৃষক সমাবেশে শেরপুরে তিনি

[৬৪] *দৈনিক আজাদ*, ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭০
[৬৫] *দৈনিক মর্নিং নিউজ*, ১৯ জুন ১৯৭০
[৬৬] *ঐ*,
[৬৭] G.P. Bhattacharjee, *ibid*, p. 283
[৬৮] *দৈনিক সংগ্রাম*, ৪ নভেম্বর ১৯৭০
[৬৯] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ অক্টোবর ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

দাবি করেন ভোটের আগে ভাত চাই।[৭০] ১৯৭০ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ভাসানী নির্বাচনে অংশ নেয়ার ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেন। তিনি বলতে থাকেন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তিনি জনগণের দুঃখ দুর্দশা দূর করবেন এবং ক্ষমতার জন্য নয় জনগণের অধিকারের জন্য পরিষদে যাবেন। ১৯৭০ সালের জানুয়ারিতে টাঙ্গাইলের সন্তোষে দ্বিতীয় কৃষক সমাবেশে তিনি বলেন, সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে জনগণের সমস্যার সমাধান করা যাবে এবং এটি অর্জন হবে বিপ্লবের মাধ্যমে।[৭১] মওলানা ভাসানীর নিজ দলের অনেকে তাঁর নির্বাচনে অংশ নেয়া ও ইসলামিক সমাজতন্ত্রের ধারণাকে সমর্থন করেননি। এর ফলে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দলের অভ্যন্তরে বিভাজন তৈরি হয়। ভাসানী ন্যাপ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে কিনা তা নিয়ে দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভুগতে থাকে। দলে অবস্থিত চরম বামপন্থীদের একটি উপদল নির্বাচন বর্জনের জন্যে চাপ দিলে ঢাকায় দলের জরুরি কাউন্সিল ডাকা হয়। শেষ পর্যন্ত জুন মাসে লাহোরে অনুষ্ঠিত দলের বৈঠকে গৃহিত নির্বাচনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত বহাল থাকে। দলের পূর্ব পাকিস্তান শাখার সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান যাদু মিয়া তৃতীয় আরেকটি প্রস্তাব এনে বলেছিলেন, ভাসানী ন্যাপ নির্বাচনে শুধু টোকেন অংশগ্রহণ করবে। কিন্তু তাঁর এ প্রস্তাব বৈঠকে পাশ হয়নি।[৭২] ১৯৭০ সালের ৫ নভেম্বর ন্যাপ প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বেতার টেলিভিশন ভাষণে বলেন যদিও আমাদের মধ্যে অনেক মতের পার্থক্য রয়েছে, তবুও আমরা পাকিস্তানকে ভালবাসি। এর মধ্যে ভাসানী ন্যাপের যারা নির্বাচন বিরোধী ছিলেন, তারা দেশের সর্বত্র নির্বাচন বয়কটের আহবান জানিয়ে মিছিল মিটিং করতে থাকে। ৯ নভেম্বর ঈশ্বরদীতে ভাসানী ন্যাপের মতিন আলাউদ্দিন গ্রুপ ও পূর্ব বাংলা ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা একটি নির্বাচন বিরোধী মিছিল বের করে। ইতিমধ্যে ১২ নভেম্বর পূর্ববাংলায় ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস হলে ২৪ নভেম্বর ভাসানী ন্যাপের জরুরি বর্ধিত সভা ডাকা হয়। মওলানা ভাসানী এতে যোগদান করা থেকে বিরত থাকেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে ভাসানী ন্যাপের যে ১৪ জন প্রার্থী জাতীয় পরিষদের এবং ২৫ জন প্রার্থী প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন, তাদের প্রতি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেয়া হয়। বস্তুত ভাসানী ন্যাপের একটি গ্রুপ অনেক আগে থেকেই নির্বাচনে অংশ নেয়ার বিরোধিতা করে আসছিল। শেষ পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড়ের ইস্যুতে তারা চরম রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে এবং শেষ মুহূর্তে আংশিক সফলতা অর্জন করে। মস্কোপন্থী ন্যাপের কোনো জনপ্রিয় নেতা ছিল না, মোজাফফর আহমদের জনগণের উপর প্রকৃত পক্ষে কোনো প্রভাব ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানের বামপন্থী শক্তিগুলোও ছিল দ্বিধাবিভক্ত এবং কোনো সুসংগঠিত ভিত্তি ছিল না তাদের। উপদলীয় ক্রোন্দলে তারা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ভাসানী গ্রুপ মোহাম্মদ তোয়াহার নেতৃত্বে একটি উপদল বেরিয়ে যাওয়ার কারণে দুর্বল হয়ে পড়ে। তোয়াহা ছিলেন নির্বাচন পদ্ধতির বিরোধী। তিনি গ্রামীণ জনগণের মাঝে রাজনীতি সচেতনতা সৃষ্টি করতে বেশি বিশ্বাসী ছিলেন। অন্যান্য পিকিংপন্থী দলগুলো ভাসানীর সাথে রয়ে যায়। মওলানা ভাসানীর অনেক কৃষক অনুসারী ছিল কিন্তু তোয়াহার পদত্যাগের পর ভাসানী ন্যাপ ক্রমাগত দুর্বল হয়ে পড়ে। আবদুল মতিনের নেতৃত্বেও উপদল ভারতের, বিশেষত পশ্চিম বাংলার নকশালীদের মত বিপ্লবী কৌশলের পক্ষপাতি ছিল।

---

[৭০] *দৈনিক মর্নিং নিউজ*, ৬ অক্টোবর ১৯৬৯

[৭১] G.P. Bhattacharjee, *ibid*, p. 262

[৭২] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৫ অক্টোবর ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

ন্যাপ (ওয়ালী গ্রুপ)

১৯৫৪ সালে পকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় এবং পরবর্তীতে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি কমিউনিস্ট আদর্শে গড়ে ওঠে। একসময় ন্যাপ দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। একটি মস্কোপন্থী ন্যাপ ও অন্যটি পিকিংপন্থী ন্যাপ। মস্কোপন্থী ন্যাপের নেতৃত্ব দেন খান আবদুল ওয়ালী খান এবং পূর্ব পাকিস্তানে নেতৃত্ব দেন অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ। আওয়ামী লীগের মতো ওয়ালী ন্যাপও নির্বাচনকে গুরুত্বের সাথে নেয়। এই দলের নেতারা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন, তারা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করে।[৭৩] তারা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের সমর্থন করে এবং দাবি করে যে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বিষয় ও মুদ্রা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে। তারা মনে করে পাকিস্তানের জনগণের মূল সংগ্রাম হওয়া উচিত সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ এবং একচেটিয়া পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে। অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ও অন্যান্য ন্যাপ ওয়ালীর নেতারা মনে করেন যে আওয়ামী লীগের যে স্লোগান 'জাগো জাগো বাঙালি জাগো' এটি দেশের জন্য ক্ষতিকার। কারণ এটি প্রদেশে বাঙালি পুঁজিবাদের উত্থান ঘটাবে। তাদের মতে স্লোগান হওয়া উচিত 'বাংলার কৃষক ও শ্রমিকরা জাগো'।[৭৪] মওলানা ভাসানীর ইসলামিক সমাজতন্ত্রের সমালোচনা করে অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ বলেন- "There is only one kind of socialism- it is scientific socialism. Any other kind of socialism is a hoax to the people."

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ওয়ালী গ্রুপ এর প্রধান খান আবদুল ওয়ালী খান ৬ নভেম্বর বেতার টেলিভিশন ভাষণে বলেন, তিনি ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করে কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র ও নিম্নবিত্তের দাবি পূরণ করার আহবান জানান।

পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি

পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি গঠিত হয় ১৯৬৯ সালে। চারটি রাজনৈতিক দলের ছোট অংশ যথা নূরুল আমীনের ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট, চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর নেজাম ই ইসলাম, নবাবজাদা নসরুল্লাহ খানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের একটি অংশ, জাস্টিস পার্টির আসগর খান এরা ১৯৬৯ সালের ২৪ জুন যৌথ ঘোষণার মাধ্যমে নতুন দল গঠন করে যাদের আটটি লক্ষ্য ছিল।[৭৫] পিডিপি শুরু থেকেই নির্বাচনকে গুরুত্বের সাথে নেয়। এর সভাপতি নসরুল্লাহ খান মনে করেন যে ১২০ দিনের মধ্যে পরিষদের পক্ষে শাসনতন্ত্র রচনা করা অসম্ভব। পিডিপি সংসদীয় গণতন্ত্র, একটি শক্তিশালী কেন্দ্র ও ইসলামী আদর্শের কথা প্রচার করে। পিডিপি পূর্ব পাকিস্তান প্রধান নূরুল আমীন উল্লেখ করেন পাকিস্তানের সংবিধান অবশ্যই ইসলামের মূল নীতির ভিত্তিতে রচনা করতে হবে। তিনি সকল ধরনের বিদেশি আদর্শের সমালোচনা করে বলেন পাকিস্তানকে তার গৌরবোজ্জ্বল আদর্শ অনুযায়ী চলতে হবে। নূরুল আমীন শক্তিশালী কেন্দ্রের সাথে প্রাদেশিক

[৭৩] *দৈনিক সংবাদ*, ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭০
[৭৪] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৭ এপ্রিল ১৯৭০
[৭৫] G.P Bhattacharjee, *ibid*, p. 278

Dhaka University Institutional Repository

স্বায়ত্তশাসনের কথা বলেন। পিডিপি পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করতে চায়। পিডিপি আওয়ামী লীগের ছয় দফা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের সমালোচনা করেন। পিডিপির সহ-সভাপতি মাওলানা ফরিদ আহমেদ ঘোষণা করেন যে ছয় দফা হচ্ছে পাকিস্তানকে ভাঙ্গার একটি ষড়যন্ত্র।[৭৬] পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রধান নূরুল আমীন ১০ নভেম্বর তাঁর বেতার ও টেলিভিশন ভাষণে বলেন, মুখরোচক চোখ বাধানো স্লোগান বা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে নয়, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পাকিস্তানের সমস্যার সমাধান করা হবে।[৭৭]

ন্যাশনাল প্রগ্রেসিভ পার্টি

আতাউর রহমান খানের ন্যাশনাল প্রগ্রেসিভ পার্টি একটি ধর্মনিরপেক্ষ দল কিন্তু রাজনীতিতে এ দলের তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনো প্রভাব ছিল না। আতাউর রহমান খানের মতে দেশে পাঁচটি আঞ্চলিক জাতি রয়েছে যারা বাঙালি, সিন্ধু, পাঞ্জাবি, পাঠান ও বালুচ নামে পরিচিত। তিনি দাবি করেন ফেডারেল শাসনের আওতায় এগুলিকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দেয়া উচিত।[৭৮] তিনি পরামর্শ দেন দেশকে পাকিস্তান ফেডারেল যুক্তরাষ্ট্র হিসেবে পরিণত করা এবং এর সংবিধান হওয়া উচিত ফেডারেল পদ্ধতির, প্রকৃতিগত দিক থেকে সাংবিধানিক এবং বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ধর্মনিরপেক্ষ। তিনি বলেন ইসলাম একটি ইহজাগতিক ধর্ম এবং দেশকে একটি আদর্শ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা উচিত।[৭৯] তিনি পাকিস্তানের শক্তিশালী কেন্দ্রের বিরোধিতা করেন এবং বলেন পাকিস্তানের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়বে যদি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনকে অবহেলা করা হয়। পাকিস্তানের সংবিধান লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী করা দরকার বলে তিনি উল্লেখ করেন।[৮০] তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন যে যদি ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান তৈরি করা হয় তাহলে তা জগাখিচুড়ি হয়ে পড়বে।[৮১] আদর্শগত দিক থেকে আওয়ামী লীগ ও ন্যাশনাল প্রগ্রেসিভ লীগের মধ্যে খুব সামান্য ব্যবধান রয়েছে। একসময় আতাউর রহমান আওয়ামী লীগে ছিলেন এবং সে দলের নেতা হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। তিনি সামাজিক অর্থনীতিতে বিশ্বাস করতেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের স্থলে বাংলাদেশ রাখার কথা সমর্থন করেন।[৮২] পরবর্তীতে তিনি আওয়ামী লীগ ত্যাগ করেন এবং শেখ মুজিবের সমালোচনা করে বলেন একনায়ক হিসেবে।[৮৩] আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি আমেনা বেগম যিনি পরবর্তীতে ন্যাশনাল প্রগ্রেসিভ লীগে যোগ দেন এবং আওয়ামী লীগ ছাড়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন যে, ন্যাশনাল প্রগ্রেসিভ লীগ অনেক বেশি গণতান্ত্রিক এবং সমষ্টিগত নেতৃত্বে বিশ্বাসী কিন্তু আওয়ামী লীগ ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং এখানে

[৭৬] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৮ মার্চ ১৯৭০
[৭৭] *ঐ*, ১১ নভেম্বর ১৯৭০
[৭৮] *দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার*, ১৩ মার্চ ১৯৭০
[৭৯] *দৈনিক মর্নিং নিউজ*, ২৪ জুন ১৯৭০
[৮০] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৪ মার্চ ১৯৭০
[৮১] *দৈনিক সংবাদ*, ৪ জানুয়ারি ১৯৭০
[৮২] *দৈনিক আজাদ*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৬৯
[৮৩] *দৈনিক মর্নিং নিউজ*, ৯ জুন ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

কোনো গণতন্ত্র নেই।[৮৪] কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায় আতাউর রহমানে খানের একনায়কতান্ত্রিক আচরণের কারণে দলটি অলি আহাদের নেতৃত্বে আরেকটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়।

মুসলিম লীগ

পাকিস্তানে অনেকগুলি ইসলামিক দল ছিল কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো ঐক্য ছিল না। তারা চেয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানে সামাজিক ন্যায়বিচার কিন্তু তারা আওয়ামী লীগের ছয় দফা বিরোধী ছিল। তারা মনে করত ছয় দফা পাকিস্তানের সংহতিকে নষ্ট করবে। তারা জাতীয় সংহতি ও ইসলামিক আদর্শের কথা বলতে থাকে। তারা মনে করত দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করা যাবে ইসলামিক নীতি অনুসারে। মুসলিম লীগের তিনটি ধারা ছিল কনভেনশন মুসলিম লীগ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ এবং কাইয়ুমপন্থী মুসলিম লীগ। তিনটি ধারাই নিজেদের পাকিস্তান মুসলিম লীগের অংশ বলে মনে করত। নির্বাচনের পূর্বে এ তিনটি ধারা একত্রিত হয়ে একটি জোট গঠন করতে চেয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের এ চেষ্টা ব্যর্থ হয়।[৮৫]

ক. কনভেনশন মুসলিম লীগ

কনভেনশন মুসলিম লীগের প্রধান ছিলেন আইয়ুব খান কিন্তু তাঁর পতন ও রাজনীতি থেকে পদত্যাগের পর চট্টগ্রামের ফজলুল কাদের চৌধুরী এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হন। তিনি নির্বাচনী প্রচারাভিযানে বলেন যদি জনগণ তাদের ভোট দিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ করে দেয় তাহলে তারা জনগণের চাহিদা পূরণ করবে।[৮৬] তিনি বলেন ব্যাংক বীমা সহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি ঢাকায় স্থানান্তর করা উচিত এবং সশস্ত্র বাহিনীতে ৫০ শতাংশ লোক পূর্ব পাকিস্তান থেকে নিয়োগ দেয়া হবে।[৮৭] ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে ফজলুল কাদের চৌধুরী বলেন, তাঁর দল পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে চায়, আর এজন্য নৌ বাহিনীর সদর দপ্তর প্রদেশে স্থানান্তর করা হবে।[৮৮] ফজলুল কাদের চৌধুরীর একথার প্রেক্ষিতে দৈনিক সংবাদ সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখে যে, জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী কি ভুলে গেছেন কিছুদিন আগে তাদের কনভেনশন মুসলিম লীগের প্রধান আইয়ুব খানের ১১ বছরের দুঃশাসনের কথা?[৮৯] ফজলুল কাদের চৌধুরী পরিষ্কার ভাবে জানান যে তাঁর দল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষপাতি এবং শক্তিশালী কেন্দ্রের পক্ষে।[৯০] চট্টগ্রামের এক জনসভায় তিনি হুমকি দিয়ে যারা জয় বাংলা স্লোগান তুলে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণার কথা বলেন।[৯১] তিনি জনগণকে

[৮৪] *দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার*, ১৫ মার্চ ১৯৭০
[৮৫] *দৈনিক আজাদ*, ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯
[৮৬] *দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার*, ৬ জুলাই ১৯৭০
[৮৭] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭০
[৮৮] *দৈনিক সংবাদ*, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭০
[৮৯] *ঐ*
[৯০] *ঐ*, ১৩ এপ্রিল ১৯৭০
[৯১] G.P. Bhattacharjee, *ibid*, p. 275

Dhaka University Institutional Repository

দুইটি বিষয় থেকে সাবধান থাকার জন্য বলেন, একটি হচ্ছে বাইরে থেকে আগত কমিউনিস্ট ও ন্যাপের প্রভাব এবং যারা ভারতীয়দের সাহায্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রপাগান্ডা করে।[৯২]

খ. কাউন্সিল মুসলিম লীগ

কাউন্সিল মুসলিম লীগের প্রধান মিয়া মমতাজ দৌলতানা ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য দূরীকরণে সাত দফা দাবি উত্থাপন করেন। এই সাত দফার অনেক দাবি বাঙালিদের কাছে পরিচিত ছিল যার কারণে জনগণের মাঝে বড় ধরনের কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। তাদের দুই অর্থনীতি আওয়ামী লীগের দ্বারা সমর্থিত হয়নি। আওয়ামী লীগ জনগণের মাঝে খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করে তাঁর বাঙালি জাতীয়তাবাদ কথা দ্বারা যা কাউন্সিল মুসলিম লীগ করতে পারেনি। নির্বাচনের সময় অন্যান্য ইসলামিক দলগুলির মতো কাউন্সিল মুসলিম লীগ পাকিস্তানের জন্য শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের দাবি জানায়। তারা আওয়ামী লীগের সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। পেশোয়ারে এক বক্তৃতায় দৌলতানা বলেন, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কাঠামোর ভিতরে পূর্ব পাকিস্তানের দুঃখ দুর করা হবে এবং পাকিস্তানের সংহতিকে টিকিয়ে রাখা হবে। তিনি বলেন আওয়ামী লীগের ছয় দফা দাবির মাধ্যমে দেশের সংহতি নষ্ট হবে।[৯৩] পাকিস্তান রাষ্ট্রের সমাজতন্ত্রের সমালোচনা করে তিনি বলেন-

> Daulatana condemned socialism and UN Islamic . . . country was not in need of any foreign 'ism' and those who propagated ideologies other than Islam were an enimies of Pakistan. Pakistan would become an Islamic Welfare State in which the rights of the workers, peasants and others would be safe-guarded according to the Islamic principles.[৯৪]

দৌলতানা অন্যান্য ইসলামিক দলগুলির মতো ভারতকে পাকিস্তানের বড় শত্রু বলে মনে করেন।[৯৫]

গ. কাইয়ুমপন্থী মুসলিম লীগ

কাইয়ুমপন্থী মুসলিম লীগের প্রধান কাইয়ুম খান ইসলামিক আদর্শের অনুসারী ছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন যে শক্তিশালী কেন্দ্রের মাধ্যমে জাতীয় সংহতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব। তিনি মনে করেন প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বিষয়, আন্তঃপ্রাদেশিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্য, মুদ্রা ব্যবস্থা সহ প্রদেশের রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে থাকবে।[৯৬] পূর্ব পাকিস্তানের খুলনাতে এক জনসভায় কাইয়ুম খান বলেন, শেখ মুজিবুর রহমান, লাল শার্টের নেতা খান আবদুল গাফফার খান, ন্যাপ ওয়ালীর নেতা ওয়ালী খান এবং সিন্ধুর জি.এম সাঈদ পাকিস্তানের স্বাধীনতাকে নষ্ট করার জন্য চক্রান্ত

[৯২] *দৈনিক মর্নিং নিউজ*, ২৭ জুন ১৯৭০
[৯৩] *দৈনিক সংবাদ*, ৬ জানুয়ারি ১৯৭০
[৯৪] *দৈনিক মর্নিং নিউজ*, ২১ জুন ১৯৭০
[৯৫] *দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার*, ১৩ মার্চ ১৯৭০
[৯৬] *দৈনিক মর্নিং নিউজ*, ২৯ জুন ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

করছে।[৯৭] তিনি পাকিস্তানের সংহতি ও আদর্শ রক্ষায় বিশ্বাসের জন্য ভাসানী, মওদুদী, ভুট্টো ও নসরুল্লাহ খানের প্রশংসা করেন।[৯৮] তিনি বলেন শেখ মুজিব, ওয়ালী খান এবং জি.এম সাঈদ ভারতীয়দের সহায়তায় পাকিস্তানকে অকার্যকর রাষ্ট্র হিসেবে পরিণত করার খেলায় লিপ্ত।[৯৯] তিনি সন্দেহ পোষণ করেন যে কাউন্সিল মুসলিম লীগ এবং ওয়ালী ন্যাপের মধ্যে গোপন বোঝাপড়া তৈরি হয়েছে।[১০০] তিনি মনে করেন ভারত পাকিস্তানের এক নম্বর শত্রু এবং সকল লোক তা মনে করে।[১০১] তিনি অভিযোগ করেন ভারত পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে দেশের ভেতরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করছে।[১০২] তিনি ইসলামি ব্যবস্থার পক্ষপাতিত্ব করে বলেন, তিনি পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্রের বিরোধী এবং তাঁর দল কৃষক, শ্রমিক ও সমাজের দরিদ্র জনগণের জন্য ইসলামের মূলনীতি অনুযায়ী ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে।[১০৩] খুলনার খান আবদুস সবুর খান কাইয়ুম মুসলিম লীগে যোগ দেন এবং তীব্রভাবে আওয়ামী লীগের সমালোচনা করে বলেন, যদি আওয়ামী লীগের ছয় দফা পাকিস্তানের জনগণের কল্যাণে করা হয় তাহলে ভারতীয় বেতার কেন এর সমর্থন করছে?[১০৪] জাতির উদ্দেশ্যে বেতার টেলিভিশন নির্বাচনী ভাষণে কাইয়ুম খান বলেন, তাঁর দল পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য জাতীয় বিষয়ের ব্যাপারে স্বার্থ রক্ষা করবে এবং তাঁর দল শক্তিশালী কেন্দ্রের বিপরীতে অধিকাংশ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করবে।[১০৫]

পাকিস্তান পিপলস পার্টি

পাকিস্তান পিপলস পার্টির জুলফিকার আলী ভুট্টো ইসলামিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন। ভুট্টোর সমাজতন্ত্রের সাথে দেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের কোনো সম্পর্ক নেই। সত্যিকার অর্থে পূর্ব পাকিস্তানে এ দলের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। পিপিপি'র পূর্ব পাকিস্তান শাখার সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদীন দল ছেড়ে কৃষক সমিতি দলে যোগদান করেন।[১০৬] পিপিপি পূর্ব পাকিস্তান শাখার চেয়ারম্যান মাওলানা নুরুজ্জামান ভুট্টোর দলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং নিজে আলাদা পিপলস পার্টি গড়ে তোলেন। তিনি এক বিবৃতিতে বলেন তাঁর দল পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে এবং পাকিস্তানের আইন পরিষদ হবে এককক্ষ বিশিষ্ট। তিনি ছাত্রদের এগার দফাকে সমর্থন জানান এবং বলেন যে ইসলাম হবে পাকিস্তানের সমাজ কাঠামোর মূল ভিত্তি। তিনি বলেন ভুট্টোর দল এসকল দাবি শর্তহীন ভাবে মেনে নিবে না এবং সত্যিকার অর্থে গ্রহণ করবে না।[১০৭] পিপলস পার্টির প্রধান ভুট্টো শেখ মুজিবের বাঙালি জাতীয়তাবাদের কঠোর সমালোচনা করেন। কিন্তু ভুট্টোর জন্য তেমন কোনো সহজ পথ ছিল না। কারণ পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালিরা ছিল সমভাবাপন্ন, তারা পশ্চিম পাকিস্তানীদের আর

[৯৭] *দৈনিক মর্নিং নিউজ*, ১২ এপ্রিল ১৯৭০
[৯৮] *দৈনিক সংবাদ*, ৩১ জানুয়ারি ১৯৭০
[৯৯] *দৈনিক মর্নিং নিউজ*, ২৮ মে ১৯৭০
[১০০] *দৈনিক সংবাদ*, ১৫ এপ্রিল ১৯৭০
[১০১] *দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার*, ২২ জুন ১৯৭০
[১০২] *দৈনিক সংবাদ*, ১৫ এপ্রিল ১৯৭০
[১০৩] *ঐ*, ৭ জানুয়ারি ১৯৭০
[১০৪] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ মার্চ ১৯৭০
[১০৫] *ঐ*, ১৪ নভেম্বর ১৯৭০
[১০৬] *দৈনিক সংবাদ*, ২ জানুয়ারি ১৯৭০
[১০৭] *ঐ*, ৩১ জানুয়ারি ১৯৬৯

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বাস করতে পারছিল না। অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে বিদ্যমান ছিল উপ-আঞ্চলিকতাবাদ। ভুট্টো তাঁর নির্বাচনী প্রচারণা কার্য চালাতে গিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে কয়েকটি সমস্যা অনুভব করেন। যেমন- এক ইউনিট ব্যবস্থা পাঞ্জাবিদের নিকট জনপ্রিয় হলেও পশ্চিম পাকিস্তানের যে সকল ছোট ছোট প্রদেশ ছিল তারা এক ইউনিট ব্যবস্থা মানতে পারেনি তখনও, ভুট্টো পাঞ্জাবে যেভাবে বক্তৃতা প্রচারণা চালাতে পারতেন সে হারে বেলুচিস্তান বা উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এমনকি নিজ নির্বাচনী এলাকা সিন্ধুতেও ভাল বক্তৃতা দিতে বা জনগণের মাঝে তেমন আবেদন সৃষ্টি করতে পারেননি, পশ্চিম পাকিস্তানের বড় বড় জোতদাররা তখন পর্যন্ত ছিল প্রেসার গ্রুপ যাদের সমর্থন তখনও ভুট্টো আদায় করতে পারেনি। এসব সমস্যা সত্ত্বেও ভুট্টো নির্বাচনী প্রচার কার্য চালিয়ে যান। ভুট্টোর প্রধান স্লোগান ছিল 'ইসলাম হচ্ছে আমাদের বিশ্বাস, গণতন্ত্র হচ্ছে আমাদের নীতি এবং সমাজতন্ত্র হচ্ছে আমাদের অর্থনীতি' তাঁর দলের ঘোষণাপত্রে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তনের, পুঁজিবাদের মুলোৎপাটন এবং ইসলামী সমাজতন্ত্রের অঙ্গীকার করেন।[১০৮] এছাড়া ভুট্টো শেখ মুজিবের ছয় দফার কঠোর সমালোচনা করেন। ভুট্টো পূর্ব পাকিস্তানে কোনো নির্বাচনী সভা, বক্তৃতা করেননি এমনকি পূর্ব পাকিস্তানে ভোট আদায়ের জন্য তেমন কোনো প্রচারণা কার্যে অংশ নেননি। তাঁর সকল আগ্রহ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানকে কেন্দ্র করে। তাঁর এ কৌশলকে জি ডব্লিউ চৌধুরী মন্তব্য করেছেন যে, ভুট্টো প্যাকিস্তানের ঐক্যের চেয়ে ক্ষমতার রাজনীতিতে বেশি আগ্রহী ছিলেন।[১০৯]

প্রথম দিকে পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের ডানপন্থী দলগুলির অবস্থা ভাল ছিল মধ্যপন্থীদল যেমন কাউন্সিল মুসলিম লীগ, পিডিপি এসব দলের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু এসব দলের বয়স্ক নেতারা ছিলেন পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বেকার মানুষ কিন্তু ১৯৭০ সালের নির্বাচনের অধিকাংশ ভোটারের জন্ম পাকিস্তান রাষ্ট্রে। তাই এ সকল বয়স্ক নেতৃবৃন্দ নির্বাচনী অঙ্গীকার হিসেবে যে সকল কথা প্রচার করেন যেমন ইসলামী আদর্শ, কেন্দ্রীয় সরকার এসব তরুণ ভোটারদের মন আকৃষ্ট করতে পারেনি। এদিক থেকে ভুট্টোর কর্মসূচি ও নীতি ছিল অনেক বেশি সফল। যদিও নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবের সফলতার চেয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের ভুট্টোর সফলতা ছিল কম, কিন্তু অধিকতর প্রচণ্ড শক্তিসমূহ, পাকিস্তানের জটিল সমস্যাসমূহ এবং উপ আঞ্চলিকতাবাদ ও ভাষাগত উত্তেজনা যা তাকে মোকাবেলা করতে হয়েছে সেদিক থেকে বিচার করলে ভুট্টোর সফলতাও ছিল উল্লেখযোগ্য।[১১০]

মূলত পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৭০ সালের নির্বাচনী অভিযান ছিল মাত্র এক ব্যক্তির প্রদর্শনী বিশেষ। ১৯৪৫-৪৬ সালে ভারতের মুসলমানদেরকে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে বলে দেওয়া হয় যে, যদি তারা ল্যাম্পপোস্টকেও মনোনয়ন দেয় তাহলে তাকে যেন ভোট দেয়া হয়। আগের বেলায় এ নির্দেশ আসে কায়েদ ই আজমের কাছ থেকে, পরবর্তীতে এ নির্দেশ আসে শেখ মুজিবের কাছ থেকে। শেখ মুজিবের নিজের নির্বাচনী আবেদনের সাথে ছিল একটি আবেদনময়ী পোস্টার যার শিরোনাম ছিল 'সোনার বাংলা শশ্মান কেন?' অবশ্য কোনো কোনো মহল আওয়ামী লীগের কার্যকারিতাকে তেমন আমল

[১০৮] Z. A. Bhutto, *The Great Tragedy*, Karachi, 1971, pp. 13,75
[১০৯] জি. ডব্লিউ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৯
[১১০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৯-১২০

Dhaka University Institutional Repository

দেয়নি। যেমন রাজশাহীর একজন ধনী ও প্রভাবশালী কনভেনশন মুসলিম লীগ প্রার্থীর বিশ্বাস ছিল যদি তিন মুসলিম লীগ ও জামায়াতে ইসলামির মতো ডানপন্থী দলগুলো তাকে সমর্থন দেয় তাহলে আওয়ামী লীগ, পিডিপি, ন্যাপ ভাসানী ও ন্যাপ ওয়ালীর মধ্যে বিরোধীদলীয় ভোট ভাগাভাগির ফাঁকে তিনি সুনিশ্চিতভাবেই নির্বাচনে জয়ী হবেন। ঐ একই জেলায় নির্বাচনী প্রচারাভিযান চলাকালে অনেকের মনে এ ধারণা জন্মে যে, শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তার ভাটার টান পড়েছে কেননা তিনি সকল গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে একত্রিত করার মতো দুরদর্শিতা দেখাতে পারেননি। আরো মনে করা হয় জয় বাংলা স্লোগান জনপ্রিয় হয়নি।[১১১]

নির্বাচনী স্লোগান

যে কোনো নির্বাচনে স্লোগান একটি প্রচার মাধ্যম। ১৯৭০ সালের নির্বাচনেও তেমনি কিছু স্লোগান লক্ষ্য করা যায়। স্লোগানগুলি দ্বারা একদিকে যেমন নিজ দলের প্রার্থীদের গুণকীর্তণ করা হয় তেমনি অন্যদিকে প্রতিদ্বন্দ্বিদেরও সমালোচনা করা হয়। নির্বাচন যত এগিয়ে আসছিল নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দল ও প্রার্থীর স্লোগান তত জমে উঠেছিল। রাজনৈতিক দলগুলোর পরিচিত স্লোগানগুলির পাশাপাশি নির্বাচনের সময় প্রার্থীদের নিয়ে ও তাদের নির্বাচনী প্রতীক নিয়ে নিত্য নতুন স্লোগান তৈরি হয়। আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামি কিংবা ন্যাপের মতো যেসব রাজনৈতিক দলের কোনো পেটেন্ট স্লোগান নেই তাদের সমর্থকেরাও নির্বাচন এগিয়ে আসার সাথে সাথে পেটেন্ট জাতীয় স্লোগান তৈরি করেছেন। নির্বাচনে নিত্য নতুন প্রতিদ্বন্দ্বিদের ঘায়েল করার জন্য ছোড়া হতো স্লোগানের বাণ। এক স্লোগানের জবাবে তৈরি হতো পাল্টা স্লোগান। স্লোগান তৈরিতে একদিকে যেমন ভাবের প্রকাশ ঘটে, তেমনি ঘটে ছন্দের ও ধ্বনির কারুকাজ। এর সাথে থাকত অপর পক্ষকে নাজেহাল করার প্রতিযোগিতা। এসব স্লোগানের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রতীকের নতুন নতুন তাৎপর্য আবিষ্কার করা হতো। যেসব প্রতীক এই তাৎপর্য ধারণে ততটা সম্ভব নয় সেসব প্রতীকের বাহকেরাও স্লোগানের বিষয় বৈভব যতটা সম্ভব তুলে ধরার চেষ্টা করছে। কোনো কোনো স্লোগান হয়েছে প্রার্থীর কার্যক্রম ও আচার আচরণের প্রতি প্রত্যক্ষ আক্রমণমূলক কোনো কোনো স্লোগানে আবার নির্বাচনী এলাকার বিশেষ স্বার্থের কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হয় যা অনেক ক্ষেত্রেই একবারে সংকীর্ণ এলাকাভিত্তিক।

পুরনো ঢাকার ২১১ নির্বাচনী এলাকা থেকে হারিকেন বনাম নৌকার পাল্টাপাল্টি স্লোগান লক্ষ্য করা যায়। যেসব স্লোগান লক্ষ করা যায়-

১. হারিকেন তেল নাই, নৌকা ছাড়া উপায় নাই।
২. নৌকা ডুবিল হায় হায় করিল; আলো যদি পেতে চাও হারিকেনে ভোট দাও।
৩. নৌকাতে বৈঠা আছে, বঙ্গবন্ধুর ভোট আছে।
৪. নৌকা যাইবে ভাইস্যা, ভোট দেন ঠাইস্যা।

[১১১] শ্যামলী ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৬

Dhaka University Institutional Repository

৫. নৌকাতে দিলে ভোট, তা পাবে দেশের লোক।

৬. পদ্মা-মেঘনা-মধুমতি, নৌকা ছাড়া নাইকো গতি।

৭. নৌকার মাঝি মুজিব ভাই, আপনাদের কাছে দোয়া চাই।

৮. আওয়ামী লীগে দিয়া ভোট, বীর বাঙালি বাধোঁ জোট।

৯. স্বাধীনতার শপথ নিন, নৌকা মার্কায় ভোট দিন।

১০. গাছের আগায় পক্ষী, মুজিব ভাই লক্ষী।

এছাড়া আওয়ামী লীগের কিছু পরিচিত স্লোগান ছিল-

১. জয় বাংলা

২. তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা।

৩. জাগো জাগো বাঙালি জাগো।

৪. জেগেছে জেগেছে বাঙালি জেগেছে।

কাউন্সিল মুসলিম লীগের কিছু স্লোগান ছিল। যথা-

১. নৌকাতে বৈঠা নাই, বঙ্গবন্ধুর উপায় নাই।

২. শেখ মুজিবের ভাঙ্গা নাও, গাব দাও মাটি দাও।

৩. নৌকা ডুবিল হায় হায় করিল।

৪. আলো যদি পেতে চাও, হারিকেনে ভোট দাও।

৫. ফরিদপুর না ঢাকা- ঢাকা ঢাকা।

৬. নিজের পথ বেছে নাও, ঢাকাবাসী এক হও।

আওয়ামী লীগের কর্মীরা সব দলের বিরুদ্ধেই ছড়া আকারে স্লোগান দেয়। সদরঘাট ও স্টেডিয়াম এলাকায় ছয় দফা ব্যাজ ও নৌকার প্রতীক বিক্রিকারী কয়েক ব্যক্তি আবার সব দলকে ঘায়েল করে স্লোগান দেয়। এসব স্লোগানের মাধ্যমে তারা তাদের জিনিস ফেরী করার চেষ্টা করছে। তারা যে সকল স্লোগান দেয়-

১. ভোট দিলে পাল্লায়, দেশ যাবে গোল্লায়।

২. কুঁড়ে ঘরে চাল নাই, মোজাফফরের ভোট নাই।

৩. সাইকেলের পাম্প নাই, কনভেনশনের ভোট নাই।

৪. ছাতা হলো ফুটা, পিডিপিরা হলো জুটা।

৫. হারিকেনে তেল নাই, দালালদের ভোট নাই।

৬. নৌকাতে বৈঠা আছে, বঙ্গবন্ধুর ভোট আছে।

জামায়াতে ইসলামির বিরুদ্ধে রমনা-মিরপুর-মোহাম্মদপুর এলাকায় আওয়ামী লীগ কর্মীরা ছড়া কেটে স্লোগান দেয়-

Dhaka University Institutional Repository

দাঁড়িপাল্লার পইরন নাই, জামাতীদের ভোট নাই।

তাদেরকে চিনেন কি কথায় কথায় বুজুরকী।

হাতে ছুরি মিঠা জবান বাঙালীরা সাবধান।

ঢাকার মিরপুর ও মোহাম্মদপুর এলাকায় জামায়াতে ইসলামির কিছু স্লোগান লক্ষ্য করা যায়-

১. যা করে আল্লায় ভোট দিব পাল্লায়।

২. দাঁড়িপাল্লা মার্কায় ভোট দিলে ইনসাফ হবে তিলে তিলে।

৩. হাদিসকো কোরআনকো ভোট দো মীজানকো।

৪. কায়েম করো ইসলামকো ভোট দো মীজানকো।

৫. দাঁড়িপাল্লা হাতে নিয়ে পাওনা গন্ডা নিন ছিনিয়ে।

৬. অধিকার আদায়ের শপথ নিন, দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিন।

এছাড়া জামায়াতে ইসলামির কিছু পেটেন্ট স্লোগান ছিল-

১. পাকিস্তানের উৎস কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

২. আমার নেতা তোমার নেতা বিশ্বনবী মোস্তফা।

৩. ইসলামী মুক্তির একই পথ ইসলামী বিপ্লব।

খিলগাঁও এলাকায় জামায়াত কর্মীদের তাদের মিছিলে যেসব স্লোগান দেয়-

হুজুগে বাঙাল হবেন না লোভের কাঙাল হবেন না।

দীনের দাবি ভুলবেন না ন্যায়ের পথে পা দিন।

দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিন।

এগুলি ছাড়াও জামায়াতে ইসলামির কর্মীরা জায়গায় জায়গায় আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে স্লোগান দেয়। যেমন-

নৌকা উঠছে গাছের আগায়

আওয়ামী লীগ হায় হায়।

পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগের ইকবাল আনসারীদের একটি স্লোগান ছিল-

দেশবাসীর মঙ্গলে ভোট দেবেন লাঙ্গলে।

ওয়ালী ন্যাপের স্লোগান ছিল-

১. তোমার ঘর আমার ঘর কুঁড়েঘর কুঁড়েঘর।

২. কুঁড়েঘরে থাকে কারা কৃষক শ্রমিক সর্বহারা।

৩. দিকে দিকে একি শুনি কুঁড়েঘরের জয়ধ্বনি।

Dhaka University Institutional Repository

ওয়ালী ন্যাপের পেটেন্ট স্লোগান ছিল-

জয় বাংলার জবাবে জয় সর্বহারা।

তোমার আমার ঠিকানা ক্ষেত খামার কারখানা।

নির্বাচনী প্রচারে এসব স্লোগান যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে তেমনি এসময় বিভিন্ন বাড়ির দেয়ালে শোভা পায় বিভিন্ন দলের আকর্ষণীয় সব পোস্টার ও দেয়ালিকা। এসব পোস্টার ও দেয়ালিকার মাধ্যমেও নির্বাচনী প্রচারণা জোরে শোরে করা হয়। পুরনো ঢাকার লক্ষ্মীবাজার এলাকায় পৌরসভা ভবনের অদূরে বাড়ির দেয়ালে কয়েকটি মজাদার পোস্টার চোখে পড়ে। পোস্টারের ভাষা ছিল পদ্যে। সে পদ্যে রয়েছে আবার ছন্দের গোজাঁমিল, ভাবের অসঙ্গতি ও বানানে ভুল। এ পোস্টারগুলি ছিল কাউন্সিল মুসলিম লীগের। এরকম একটি পোস্টারে লেখা ছিল-

সহসা মন

নিয়া ছুটে চল

হারিকেন এর বন্দুগন

ছুটে চল এগিয়ে চল।

আরেকটি পোস্টারে লেখা ছিল-

সিংহ বীর

উর্ধ্বে শির

কভু হুংকার

হবে ঝংকার

নাহি ভয়

হবে জয়।

একই এলাকায় কাউন্সিল মুসলিম লীগের আরেকটি অভিনব পোস্টার চোখে পড়ে। এ পোস্টারের ছবিতে আঁকা ছিল একটি ট্যাংকের কামানের মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি সিংহ, তার থাবায় রয়েছে একটি হারিকেন, তার মাথায় লেখা সিংহবীর খাজা খয়েরউদ্দিন।

দেয়ালে কাগজের যে পোস্টার ছিল তাতে লেখা ছিল-

১. জয় বাংলার গোপন কথা আকাশ বাণী কলকাতা।

২. হালত খারাপ জয় বাংলা।

৩. ফরিদপুরে ভাত নাই ঢাকা এসে বাহাদুরী।

৪. জয় বাংলা জয় হিন্দ লুঙ্গি ছেড়ে ধুতি পিন্দ।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকার নওয়াব বাড়ির গেটে একটি পোস্টারে লেখা ছিল-

শুন শুন ঢাকাবাসী
বাঁচতে যদি চাও
হারিকেনে ভোট দিয়ে
নৌকা ডুবাও।

পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগ যাদের প্রতীক লাঙ্গল তাদের একটি ফেস্টুনে লেখা ছিল-

১. যদি চাও মঙ্গল কষে ধরো লাঙ্গল।
২. মাটির সাথে চুকতি লাঙ্গল দেবে মুকতি।

তাদের অপর আরেকটি ফেস্টুনে লেখা ছিল- লাঙ্গলই মঙ্গল।

নির্বাচনী প্রচারণার ক্ষেত্রে দেয়ালিকাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ঢাকা শহরের দেয়াল লিখনে আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামি উভয় দলই সমান জোরদার ভূমিকা রাখে। জামায়াতে ইসলামি দেয়ালে দেয়ালে আলকাতরা দিয়ে একে রেখেছে দাঁড়িপাল্লা। দাঁড়িপাল্লার মাঝখানে সাদা জায়গায় কোথাও লিখে রেখেছে ১. ইসলাম। কোথাও লিখেছে ২. ইনসাফ। ৩. ন্যায়ের প্রতীক। ৪. ভোট দিন।

দেয়ালের গায়ে আরো লিখেছে-

১. গোলাম আজমকে ভোট দিন।
২. আমার স্থান তোমার স্থান পাকিস্তান পাকিস্তান।
৩. ন্যায়ের পথ বেছে নিন গোলাম আজমকে ভোট দিন।
৪. জাগো জাগো মুসলিম জাগো।

আওয়ামী লীগের সমর্থনে বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকার বাড়িঘরের দেয়াল লিখনে ছেয়ে ফেলা হয়েছে। এসব দেয়াল লিখনে লেখা ছিল-

১. ৬ দফা ১১ দফা কায়েম করো।
২. নৌকা মার্কায় ভোট দিন।
৩. তোমার নেতা আমার নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।
৪. শেখ মুজিবের উকতি পূর্ব বাংলার মুকতি।
৫. নৌকায় উড়েছে পাল বঙ্গবন্ধুর হাতে হাল।
৬. বাংলার মীরজাফর সাবধান সাবধান।
৭. আমার টাকা ফিরিয়ে দাও নিজের সম্পদ নিজেই ভোগ করতে চাই।

পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগের দেয়াল লিখনে তাদের নেতা ও দলীয় প্রার্থীদের নিন্দাবাদই বেশি চোখে পড়ে। তাদের দেয়াল লিখনে যেসব বিষয় লেখা থাকে-

১. জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা খর্ব করা চলবে না।

২. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন চাই।

মোহাজের প্রার্থী দেওয়ান ওয়ারাদাতের পক্ষে একটি স্লোগান দেওয়া হয়-

পাল্লা কো তোড় দো হাতী কো ভোট দো।[১১২]

পূর্ব পাকিস্তানের মতো পশ্চিম পাকিস্তানেও এসময় নির্বাচনী স্লোগান দেখা যায়। বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাব নির্বাচন উপলক্ষ্যে উৎসব মুখর হয়ে ওঠে। রাস্তাঘাট, দোকানপাট, ঘরের ছাদ, দলীয় পতাকা, প্রার্থীর পরিচিতি সহ পোস্টার, নির্বাচনী স্লোগান ও নির্বাচনী প্রচারণামূলক কবিতা সহ ব্যানার চোখে পড়ে। এছাড়া কোনো কোনো প্রার্থী নিজ দলের প্রচারকার্যে মাইক ব্যবহার করত। পশ্চিম পাকিস্তানে পিপলস পার্টি তুলনামূলক ভাবে প্রচরণা কার্যে এগিয়ে ছিল। এ সময় পিপলস পার্টির যে সকল স্লোগান লক্ষ্য করা যায় সেগুলো হল:

১. ভুট্টো জিয়ে হাজার সাল।

২. সাডা ভুট্টো আওয়েই আওয়ে (আমাদের ভুট্টো আসবেই আসবে)।

৩. লালটান (লণ্ঠন) কো তোড় দো, তলোয়ারকো ভোট দো, চামচাগিরি (দালালগিরি) ছোড় দো।

পিডিপির স্লোগান ছিল-

১. মারেঙ্গে, মারজায়েঙ্গে মেজর কো কামিয়াব বানায়াঙ্গে।

২. মাহফুজে লাহোরকো ভোট পায়েঙ্গে।

মাহফুজে লাহোর অর্থাৎ লাহোর রক্ষাকারী অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল সরফরাজ খানকে জয়যুক্ত করার জন্য পিডিপি মারেঙ্গে ধ্বনি তুলেছে।[১১৩]

নির্বাচনী ইশতাহার ও প্রচারণা কার্যক্রমের মূল্যায়ন

১৯৭০ সালের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর ইশতাহার পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, সকল রাজনৈতিক দলগুলো অভিন্ন কিছু বিষয়ে একই মত ব্যক্ত করে। যেমন রাষ্ট্রের কাঠামো কি হবে সে প্রশ্নে সকল দল ফেডারেল পদ্ধতির কথা বলে, দেশের অর্থনীতি কেমন হবে সে প্রশ্নে আওয়ামী লীগ সমাজতন্ত্রের কথা বললেও পাকিস্তান পিপলস পার্টি, ভাসানী ন্যাপ ইসলামিক সমাজতন্ত্রের কথা বলেন কিন্তু ওয়ালী ন্যাপ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কথা বললেও ইসলাম পন্থী দলগুলো সমাজতন্ত্রের বিরোধীতা করে। বরং ইসলাম পন্থীদলগুলো দেশের অর্থনীতি ইসলামের আদর্শ মোতাবেক হবে বলে প্রচার

[১১২] এসব স্লোগান সংগ্রহ করা হয়েছে *দৈনিক পাকিস্তান* ২৯ ও ৩১ অক্টোবর ১৯৭০, *দৈনিক পূর্বদেশ* ৮ নভেম্বর ১৯৭০।
আবু সাঈদ খান, *শ্লোগানে শ্লোগানে রাজনীতি*, অংকুর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮। পৃ. ৪২

[১১৩] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩ ডিসেম্বর ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

করে। আওয়ামী লীগ তার নির্বাচনী ইশতাহারে ফেডারেল পদ্ধতির সরকার, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, কৃষক শ্রমিকদের অধিকার, জনগণের ন্যায্য অধিকার, আঞ্চলিক বৈষম্যের কথা, বৈদেশিক নীতি কেমন হবে, অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছে। সকল দল সরকার কাঠামো ফেডারেল পদ্ধতির, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, পূর্ববাংলার ন্যায্য অধিকারের কথা, পূর্ববাংলায় নৌ বাহিনীর সদর দপ্তর স্থানান্তর, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের বিষয়সমূহ, পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ, শিল্প কারখানার শ্রমিকদের অধিকার, কৃষকদের দাবিদাওয়ার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে তাদের নির্বাচনী ইশতাহার তৈরি করেছে। মুসলিম লীগের বিভিন্ন গ্রুপ, জামায়াতে ইসলামি, নেজামে ইসলামি, পিডিপি প্রভৃতি ডানপন্থী ইসলামি দলগুলো শক্তিশালী কেন্দ্রের পক্ষপাতি ছিল। এসব ধর্মমনা ও উগ্রপন্থী দলগুলো ১৯৭০ সালের নির্বাচনী প্রচারণায় স্বায়ত্তশাসনের কথা না বললেও পূর্ব পাকিস্তানে আরও বেশি বিনিয়োগ এবং রাজস্ব ব্যয়ের দাবি জানায়। ইসলামি দলগুলো নির্বাচনী প্রচারণায় ইসলামকে একমাত্র ইস্যু হিসেবে উল্লেখ করে এবং তারা দাবি করে যে, একমাত্র ইসলামই পারে সকল সমস্যার সমাধান করে দিতে। এরা আওয়ামী লীগ, ন্যাপ প্রভৃতি ধর্ম নিরপেক্ষ দলগুলোকে ইসলাম বিরোধী বলে নিন্দা করে। এরা নিজেরা পাকিস্তানকে একটি ইসলামি সংবিধান উপহার দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। এরা সমাজতন্ত্রকে ইসলামি আদর্শের পরিপন্থী বলে ঘোষণা দেয় এবং সমাজতন্ত্রীদের ধর্মহীন নাস্তিক বলে কঠোর সমালোচনা করে। ওয়ালী ন্যাপ তার নির্বাচনী ইশতাহারের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি এবং নিজের প্রদেশের আঞ্চলিক সমস্যাদির উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করে। এছাড়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকে চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করে। ভাসানী ন্যাপ তাদের ইশতাহারে শ্রমিক কৃষক দরিদ্র জনগণের অধিকারের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেয়। অপরদিকে পাকিস্তান পিপলস পার্টি পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের ও সেখানকার সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন।

বিভিন্ন দল জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি লক্ষ্য রেখে যে নির্বাচনী কার্যক্রম হাতে নেয় তার মধ্যে দুটি দল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নির্বাচনের মূল লড়াই দেখা যায় আওয়ামী লীগ ও পাকিস্তান পিপলস পার্টির মধ্যে। দু'দলের দুই নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ও জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানের দুই অংশে ব্যাপক ভাবে জনপ্রিয় ছিলেন। একই সাথে তারা দু'জনে ছিলেন অন্য রাজনৈতিক দলগুলির নেতাদের চেয়ে বয়সে তরুণ, উদ্যমী এবং সুবক্তা। দুজনেই জনগণকে তাদের দল ও কর্মসূচির প্রতি আকৃষ্ট করতে পেরেছেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব পশ্চিম পাকিস্তানে কিছু সংখ্যক আসনে প্রার্থী দেয়ার পাশাপাশি সেখানে নির্বাচনী প্রচারণা কার্যক্রমেও অংশ নেন। কিন্তু ভুট্টোর পিপলস পার্টি পূর্ব পাকিস্তানে কোনো আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি এমনকি তিনি কখনো পূর্ব পাকিস্তানের কোনো নির্বাচনী কার্যক্রমে অংশ নেননি। দু'নেতাই আঞ্চলিক নেতা হিসেবে আর্বিভূত হন। আওয়ামী লীগ তাদের নির্বাচনী ইশতাহারের পাশাপাশি তাদের প্রচারণা কার্যক্রমে ঐতিহাসিক ছয় দফার বাস্তবায়ন, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, বাঙালির প্রতি বৈষম্য দূর, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ, পাটের ন্যায্য মূল্য প্রদান, জনসংখ্যার ভিত্তিতে কর্মসংস্থানে সমান সুযোগ সুবিধা, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ন্যায্য অধিকার,

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানের ভাষা প্রশ্ন ইত্যাদি সকল বিষয় জনগণের মনে ব্যাপক ভাবে আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। এর ফলে পূর্ববাংলায় আওয়ামী লীগের পক্ষে ব্যাপক জনসমর্থন তৈরি হয়। এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জি. ডব্লিউ চৌধুরী মন্তব্য করেন-

> তাঁর (মুজিব) বক্তব্যের একমাত্র বিষয়বস্তু পশ্চিম পাকিস্তানীদের দ্বারা বাংলার শোষণের ব্যাপারে এবং তাঁর আদর্শ ছিল সোনার বাংলা। এটি ছিল সাড়ে সাত কোটি দারিদ্রক্লিষ্ট জনগণের সবচেয়ে সার্থক আবেদন। যেমনটা অবিভক্ত ভারতের মুসলমানরা এক সময় আস্থাবান হয়েছিল যে, তাদের একটি পৃথক রাষ্ট্র তাদের জন্য সুযোগের এক ক্ষেত্র সৃষ্টি করবে, তেমনি গ্রামাঞ্চলের বাঙালিরা যাদের কাছে মুজিবের আবেদন ছিল প্রচণ্ড, তারা মুজিবের সোনার বাংলার কথায় কর্ণপাত করে।[১১৪]

অপরদিকে পাকিস্তান পিপলস পার্টি প্রধান জুলফিকার ভুট্টো পূর্ব পাকিস্তানে তেমন জনসমর্থন আদায়ে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হন। তিনি যা জনমসমর্থন পেয়েছেন তা পশ্চিম পাকিস্তানে। তিনি যে এক ইউনিট ব্যবস্থার কথা বলেন তা শুধুমাত্র পাঞ্জাবে জনপ্রিয় হলেও অন্যান্য প্রদেশগুলি তাঁর এ দাবির প্রতি তেমন সমর্থন জানায়নি। সকল রাজনৈতিক দল পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যকার বৈষম্য ও তা দূর করার কথা বললেও ভুট্টো এ সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেননি। বরং তিনি পাকিস্তানের উভয় অংশের মেরুকরণকে তাঁর বক্তৃতা বিবৃতির মাধ্যমে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি তাঁর নির্বাচনী প্রচারণায় শেখ মুজিব ও তাঁর ছয় দফার সমালোচনা করেন কিন্তু পাকিস্তানের দু'অংশের মধ্যে বিদ্যমান সমস্যা সমূহের কোনো কার্যকরী সমাধানের পথ দেখাতে ব্যর্থ হন। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁর জনপ্রিয়তা থাকলেও পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর কোনো গ্রহণযোগ্যতা ছিলনা। তিনি ইসলামি সমাজতন্ত্র নামে একটি নতুন ধারণার কথা বলেও জনগণের মধ্যে আবেদন সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন কিন্তু এক্ষেত্রেও তিনি ব্যর্থ হন।

আওয়ামী লীগ ও পিপলস পার্টির মধ্যকার নির্বাচনী প্রচারাভিযানের কাছে অন্যান্য দল তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেনি। তারা তেমন ভাবে জনসমর্থন আদায় করতে পারেনি। এ দু'দলের তুলনায় তাদের নির্বাচনী কার্যক্রম ছিল ম্লান। বিশেষ করে ইসলামপন্থী দলগুলো শুরু থেকেই নিজেদের মধ্যে জোট গঠন করা নিয়ে মতবিরোধ তৈরি হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা কোনো জোট গঠন করতে পারেনি। এছাড়া ইসলামি আদর্শভিত্তিক দলগুলো পরস্পরের বিরুদ্ধে নির্বাচনী প্রচারণা চালায়। যা তাদের ঐক্যের পথ সুগম না করে তাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে। আবার অন্যদিকে বামপন্থী দলগুলো শুরু থেকেই নির্বাচনে অংশ নেয়া নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগতে থাকে। ওয়ালীপন্থী ন্যাপ নির্বাচনে অংশ নিয়ে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের নির্বাচনী কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ দলটি আওয়ামী লীগের সাথে আতাঁত করে একটি শক্তিশালী জোট গঠন করে নির্বাচনে জয়ী হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ কারো সাথে জোট গঠনে অস্বীকৃতি জানালে ওয়ালী ন্যাপ একক ভাবে নির্বাচনে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। আবার ন্যাপ ভাসানী নির্বাচনে অংশ নেয়া নিয়ে শুরু থেকেই দোদুল্যমান অবস্থায় ছিল। কারণ ন্যাপ ভাসানীর বিবদমান গ্রুপগুলির মধ্যে একপক্ষ নির্বাচনে অংশ নিতে ইচ্ছুক থাকলেও আরেক গ্রুপ নির্বাচনে অংশ নেয়ার পরিবর্তে গণআন্দোলনের মাধ্যমে পরিবর্তন আনার পক্ষপাতি ছিল। কিন্তু ভাসানী ন্যাপ নির্বাচনী ইশতাহার ঘোষণার মাধ্যমে তাদের কর্মসূচি পেশ করলেও মওলানা ভাসানী ঘূর্ণিঝড়ের প্রশ্নে নির্বাচন

[১১৪] জি. ডব্লিউ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৫

Dhaka University Institutional Repository

বয়কট করেন। সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে, ১৯৭০ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলো পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে পরিবর্তনের অঙ্গীকার করে তাদের নির্বাচনী ইশতাহারে বিশদভাবে কর্মসূচি গ্রহণ করে। একই সাথে জনগণের মধ্যে তাদের কর্মসূচিকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করে। প্রত্যেক রাজনৈতিক দল নিজেদের আত্মবিশ্বাস নিয়ে নির্বাচনে জয়ী হওয়ার স্বপ্ন দেখতে থাকে এবং সে লক্ষ্যে নির্বাচনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত নির্বাচনী প্রচার কার্য চালিয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল

১৯৬৯ সালের ২৬ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঘোষণা দেন যে, যত শীঘ্র সম্ভব প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। সে মোতাবেক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালের ২৮ মার্চ জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণে নির্বাচনের আইনগত কাঠামো আদেশ ঘোষণা করে ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ধার্য করেন। ১৯৭০ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবল বন্যা হয়। এর ফলে তখন ডানপন্থী দলগুলো নির্বাচন পিছিয়ে দেয়ার দাবি জানাতে থাকে। মূলত তাদের উদ্দেশ্য ছিল নির্বাচন পিছিয়ে দিয়ে তা থেকে ফায়দা আদায় করা। নিজেদেরকে আরো সুসংগঠিত করে প্রচারণা কাজ চালিয়ে নিজেদের জয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া। কিন্তু মধ্যপন্থী দল ও বামদলগুলি নির্বাচন পিছিয়ে দেয়ার বিরোধিতা করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বন্যার কারণে ভোটারদের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে নির্বাচন পিছিয়ে দিয়ে নতুন তারিখ ঘোষণা করেন। ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের এবং ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের নতুন তারিখ ঘোষণা করা হয়। ইতিমধ্যে ১২ নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসে ঘটে যায় ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস যা পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলীয় দক্ষিণাঞ্চলকে রাতারাতি ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে। এ প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিপ্রেক্ষিতে সকল রাজনৈতিক দল নির্বাচন পিছিয়ে দেয়ার দাবি জানাতে থাকে। একমাত্র আওয়ামী লীগ নির্বাচন পিছানোর বিরোধিতা করে। শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সাথে আলোচনা করে নির্বাচনের তারিখ অপরিবর্তিত রাখেন। শুধুমাত্র প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত অঞ্চলগুলির জন্য নতুন তারিখ নির্ধারণ করা হয় ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে।

নির্দিষ্ট সময়ে পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথম প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সর্বত্র নির্বাচন সুশৃঙ্খল ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এদেশের জনগণ বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে তারা তাদের রাজনৈতিক অধিকার তথা ভোটদানের অধিকার প্রয়োগ করে। মানুষ তাদের পছন্দের প্রার্থীদের ভোট দিয়ে জয়ী করার জন্য ভোটকেন্দ্রে ছুটে যায়। আবার একই সাথে পাকিস্তানের এ নির্বাচন নিয়ে দেশে বিদেশে সকল মহলেরও আগ্রহের কমতি ছিল না। জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের দীর্ঘ ২৩ বছর পর বাঙালি জাতি ব্যালটের মাধ্যমে তাদের অধিকার আদায়ের জন্য রায় দেয়।

এ অধ্যায়ে নির্বাচনের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের ফলাফল, নির্বাচন পরবর্তী রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিক্রিয়া এবং আওয়ামী লীগের বিজয়ের পিছনে যে সকল কারণ রয়েছে তা মূল্যায়ন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনের ফলাফল

পাকিস্তানের ২৩ বছরে প্রত্যক্ষ ভোটে প্রথম দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচনে হয় ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর এবং ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে। ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনের আগে শুধু প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন হয় এবং সামরিক শাসনের অধীনে সব নির্বাচন হয় পরোক্ষ ভোটে। নির্বাচনের পূর্বে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ৩ ডিসেম্বর এক বেতার ভাষণে বলেন[১]- Many doubts were expressed regarding the sincerity and intention of this regime but despute this, we remained stead fast in our aim of bringing back democracy in our land.

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের এবং ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় পরিষদের ৩০০ আসনের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের উপজাতীয় এলাকার ১টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়নি। এছাড়া বাকি ২৯৯টি আসনে মোট ১৫৭০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের ১৬২টি আসনে ৭৬৯ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। পূর্ব পাকিস্তানে প্রার্থীদের গড় হচ্ছে ৯.৭৫। অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রার্থীদের গড় হচ্ছে ৫.৬ জন। পশ্চিম পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের ১৩৮টি আসনে স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মোট ৮০১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সংখ্যা পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে বেশি। এখানে ২১০ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। অপরদিকে পূর্ব পাকিস্তানে স্বতন্ত্র প্রার্থী ১০৯ জন।[২]

৭ ও ১৭ ডিসেম্বরের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের পর ঘূর্ণিদুর্গত নির্বাচনী আসনগুলিতে ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৯টি জাতীয় পরিষদ ও ১৮টি প্রাদেশিক পরিষদ এবং অন্যান্য স্থানে তিনটি প্রাদেশিক পরিষদ আসনে নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এসব আসনগুলিতেও আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। বাংলার মানুষ তাদের স্বাধিকার আদায়ের জন্য আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়।[৩]

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য সংরক্ষিত ১০টি আসনে আওয়ামী লীগ থেকে জাতীয় পরিষদে ৭ জন নির্বাচিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংরক্ষিত মহিলা আসন সহ ১৬৭টি আসন লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে বিজয়ী হয়। বাকি দুইটি আসনের একটি পায় স্বতন্ত্র প্রার্থী পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজা ত্রিদিব রায় এবং পিডিপির নূরুল আমীন। স্বতন্ত্র সদস্য রাজা ত্রিদিব রায় পরবর্তীতে আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। কিন্তু আওয়ামী লীগের পক্ষে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে একটি আসনও না থাকায় দলটি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও আঞ্চলিক মর্যাদার বাইরে ফিরে আসতে সক্ষম হয়নি। কারণ পশ্চিম পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশ নিয়ে যে বিশাল ভূখণ্ড সেখানে আওয়ামী লীগের হয়ে কথা বলার কেউ থাকে না।

---

[১] কামরুদ্দীন আহমদ, *স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং অতঃপর*, ঢাকা, ধ্রুপদ সাহিত্যাঙ্গন, ২০০৬, পৃ. ১০৫

[২] *দৈনিক পাকিস্তান*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৭০

[৩] *দৈনিক ইত্তেফাক*, *দৈনিক আজাদ*, ১৮ জানুয়ারি ১৯৭১

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ১- ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদের প্রদেশ অনুসারে ফলাফল

দলের নাম	পূর্ব পাকিস্তান	পাঞ্জাব	সিন্ধু	উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	বেলুচিস্তান	কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল	সংরক্ষিত আসন	মোট
আওয়ামী লীগ	১৬০	৬৪					৭	১৬৭
পাকিস্তান পিপলস পার্টি		১	১৮	১			৫	৮৮
কাইয়ুম পন্থী মুসলিম লীগ		৭	১	৭				৯
কাউন্সিল মুসলিম লীগ								৭
জমিয়তে উল উলামায়ে ইসলাম (হাজারভী গ্রুপ)				৬	১			৭
মারকাযী জমিয়ত উল উলেমায়ে ইসলাম		৪	৩					৭
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী)				৩	৩		১	৭
জামায়াতে ইসলামি		১	২	১				৪
কনভেনশন মুসলিম লীগ		২						২
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি	১							১
স্বতন্ত্র	১	৩	৩			৭		১৪
মোট	**১৬২**	**৮২**	**২৭**	**১৮**	**৪**	**৭**	**১৩**	**৩১৩**

সুত্রঃ *Report on General Election in Pakistan*,1970-71, Election Commission, Islamabad,1972, pp 204-205

সারণি ২- পূর্ব পাকিস্তানের ৩১০টি আসনের ফলাফল

রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত আসন	সংরক্ষিত আসন	মোট আসন
আওয়ামী লীগ	২৮৮	১০	২৯৮
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক	২		২

পার্টি			
পাকিস্তান পিপলস পার্টি			
কাউন্সিল মুসলিম লীগ			
কনভেনশন মুসলিম লীগ			
কাইয়ুম পন্থী মুসলিম লীগ			
ন্যাপ ওয়ালী	১		১
জামায়াতে ইসলামি	১		১
নেজামে ইসলামি	১		১
জামায়াতে উল উলামায়ে ইসলাম			
মারকাযে আহলে হাদীস			
জমিয়তে উল উলামায়ে ইসলাম (হাজারভী গ্রুপ)			
জমিয়তে উল উলামায়ে ইসলাম (নূরানী গ্রুপ)			
স্বতন্ত্র	৭		৭
মোট	**৩০০**	**১০**	**৩১০**

সূত্র: *দৈনিক দি ডন*, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭০

অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশের ফলাফলও এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। ৪টি প্রদেশের ফলাফল নিম্নরূপ-

সারণি ৩- পাঞ্জাবের ৮২টি আসনের ফলাফল

রাজনৈতিক দল	**প্রাপ্ত আসন**
পাকিস্তান পিপলস পার্টি	৬৪টি
কাইয়ুমপন্থী মুসলিম লীগ	১
কাউন্সিল মুসলিম লীগ	৭
জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম থানভী গ্রুপ	৪
জামায়াতে ইসলামি	১
কনভেনশন পন্থী মুসলিম লীগ	২
স্বতন্ত্র সদস্য	৩

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ৪- সিন্ধুর ২৭টি আসনের ফলাফল

পিপলস পার্টি	১৮
কাইয়ুম পন্থী মুসলিম লীগ	১
জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম থানভী গ্রুপ	৩
জামায়াতে ইসলামি	২
স্বতন্ত্র সদস্য	৩

সারণি ৫- উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ১৮টি আসনের ফলাফল

পিপলস পার্টি	১
কাইয়ুম পন্থী মুসলিম লীগ	৭
জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম থানভী গ্রুপ	৬
ন্যাপ ওয়ালী	৩
জামায়াতে ইসলামি	১

সারণি ৬- বেলুচিস্তান প্রদেশের ৪টি আসনের ফলাফল

ন্যাপ ওয়ালী	৩
জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম হাজারভী গ্রুপ	১

সূত্রঃ সারণী ৩-৬ করা হয়েছে *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫৮৬ অনুযায়ী। *দৈনিক দি ডন*, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭০

পশ্চিম পাকিস্তানে ৪টি প্রদেশের মধ্যে পাঞ্জাবে ৬৪টি, সিন্ধুতে ১৮টি ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ১টি আসনসহ মোট ৮৩টি জাতীয় পরিষদের আসনে জয়ী হয়ে পাকিস্তান পিপলস পার্টি দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ওয়ালী ন্যাপ উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে জাতীয় পরিষদের ১৮টি আসনের ৩টিতে এবং বেলুচিস্তানের ৪টি আসনের মধ্যে ৩টিতে জয় লাভ করে, পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে জাতীয় পরিষদের কোনো আসনে জয়ী হয়নি। ১০ দিন পর অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে। তার আগে থেকেই অর্থাৎ জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের ফলে সকলের মনে ধারণা তৈরি হয়েছিল যে নির্বাচনের ফলাফল কি হতে পারে। দৈনিক আজাদ এ ব্যাপারে 'নির্বাচনী উষ্ণতা নাই মন তাই নিস্তেজ' শিরোনামে সংবাদ পরিবেশন করে[৪]–

> প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের আর মাত্র একদিন বাকী। কিন্তু সেই তুলনায় নির্বাচনী উষ্ণতা এক প্রকার নাই বললেই চলে। গত ৭ই ডিসেম্বরের অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক সাফল্যই ইহার প্রধান কারণ; তাহাতে সন্দেহ নাই।

[৪] *দৈনিক আজাদ*, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

> কেননা, প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের ফলাফলও যে অনুরূপই হইবে তাহা সকল দলই কমবেশী অনুমান করিয়া লইয়াছে। তার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী অন্যান্য দলের প্রার্থীগণ কিছুটা হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। বহু প্রার্থী ইতিমধ্যেই রণক্ষেত্র ত্যাগও করিয়াছেন। অন্যান্য যাহারা এখনও আছেন তাহারাও কমবেশী প্রাণ পাইতেছেন না।
>
> আওয়ামী লীগ মহলেও ইহার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। নিশ্চিত বিজয়ের সম্ভাবনায় প্রোজ্জল আওয়ামী লীগ কর্মীরাও এখন আর প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন লইয়া এতটা মাথা ঘামাইতেছেন না।

পশ্চিম পাকিস্তানে নির্বাচনের ফলাফল ছিল ভিন্ন রকমের, কোনো দলই সেখানে ম্যান্ডেট পেল না। পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে পিপলস পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে দেখা দিল। ভুট্টোর ব্যক্তিগত আকর্ষণ, তাঁর ভারতবিদ্বেষী বিষোদগার এবং 'রুটি কাপড়ে মাকানে'য় আহবান তাকে প্রতিষ্ঠা করলো।[৫] জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে পাকিস্তান পিপলস পার্টি পশ্চিম পাকিস্তানে ১৪৪টি আসনের মধ্যে ৮৮টি আসন লাভ করে। সাংগঠনিক দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের প্রায় সবগুলো আসন লাভ করলেও পশ্চিম পাকিস্তানে তারা কোনো আসন পায়নি। পক্ষান্তরে জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি পূর্ব পাকিস্তানে কোনো প্রার্থী মনোনয়ন দিতে না পারলেও পশ্চিম পাকিস্তানে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ভুট্টো দাবি করলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানে তার দল সংখ্যাগরিষ্ঠ। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান এই দুটি প্রদেশের প্রথমটিতে ১টি ও দ্বিতীয়টিতে কোনো আসনেই পিপলস পার্টি জয়ী হয়নি। সুতরাং পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁর দল সংখ্যাগরিষ্ঠ এ কথা যুক্তিসিদ্ধ ছিল না। এক ইউনিট বাতিল করার পর পশ্চিম পাকিস্তানকে এভাবে প্রদেশ হিসেবে গণ্য করে সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবি অযৌক্তিক। পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে পিপলস পার্টি ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু ভুট্টো বিষয়টা এমনভাবে উপস্থাপন করতে লাগলেন যে, মনে হতে লাগলো, পূর্ব পাকিস্তানে আছে আওয়ামী লীগ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে আছে কেবল পিপলস পার্টি অর্থাৎ সমানে সমান।[৬] পাকিস্তান ব্যাপী কেন্দ্রীয় দল ওয়ালী ন্যাপ একমাত্র বেলুচিস্তান প্রদেশেই সরকার গঠন করার মত আসন পায়। যদিও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তারা হাজারভী গ্রুপের সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠনের মতো অবস্থায় পৌছেছিল। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে তারা ১টি মাত্র আসন লাভ করতে সমর্থ হলেও পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে তারা কোনো আসন লাভ করতে সমর্থ হয়নি। ডানপন্থী ধর্মীয় দল সবখানে ব্যর্থ হলো। জামায়াতে ইসলামি করাচীর মোহাজের মহলে সমর্থন পেল কিন্তু তাদের প্রধান ঘাঁটি পাঞ্জাবে তারা ব্যর্থ হলো।

পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের এই ফলাফল ছিল অভাবিত। পূর্ব পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা ও গোয়েন্দা বিভাগের নির্বাচন সম্পর্কিত পূর্ববর্তী যে রিপোর্ট ছিল, তার সাথে নির্বাচনী ফলাফলের শুধু গড়মিলই হল, তা নয়, হলো সম্পূর্ণ বিপরীত। ধারণা করা হয়, গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্টের ভিত্তিতেই পাকিস্তানের সামরিক জান্তা এমন একটি নিরপেক্ষ সাধারণ নির্বাচন দিতে সাহস করেছিল। তাদের ধারণা ছিল, পাকিস্তানের দক্ষিণপন্থী দলগুলো যথা পিডিপি, মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামি ও আসগর খানের গ্রুপ প্রমুখ নির্বাচনে আশাতীত ফল লাভ করবে। এমনকি আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানও সত্যিকার অর্থে ফলাফল এত বেশি তাঁর অনুকূলে যাবে সেটা তিনি ধারণা করতে পারেননি। তিনি পূর্ব

---

[৫] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *বাংলাদেশ: জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব*, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ২০০০, পৃ. ১৭৩

[৬] সালাহউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস (১৯৪৭-১৯৭১)*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭, পৃ. ১৯৭
মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, কলকাতা, এ হাকিম এন্ড সন্স, ১৯৯৪, পৃ. ২০৮

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানে তাঁর সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন, কিন্তু সে সংখ্যাগরিষ্ঠতা শুধু নিরঙ্কুশ নয়, একেবারে দু'একটি আসন বাদে পুরো গরিষ্ঠতা অর্জন এতোটা হয়তো তিনি কল্পনায়ও আনেননি। শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানে ৯০% আসন লাভের কথা ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু তিনি পেয়েছিলেন প্রায় ৯৯.৯৯% ভাগ আসন।[৭] পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর মনোভাব ও তাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে আবুল মনসুর আহমদ উল্লেখ করেছেন[৮]-

> প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া সহ পশ্চিমা নেতারা আশা করিয়াছিলেন যে, সব দল না হইলেও বেশিরভাগ দলই কিছু কিছু আসন পাইবে, যতই জনপ্রিয় হোক আওয়ামী লীগ ন্যাশনাল এসেম্বলীর পূর্ব পাকিস্তানের ভাগের ১৬৯টি আসনের মধ্যে একশ'র বেশি আসন পাইবে না, বাকি আসনগুলোর অধিকারী জামাতে ইসলামী নিযামে ইসলাম ও দুই তিনটা মুসলিম লীগের সকলেই স্ট্রং সেন্টারের শাসনতন্ত্র রচনার ব্যাপারে পশ্চিমা পার্টিগুলির সাথে থাকিবেন। এমনকি সরকার গঠনের ব্যাপারে তারা আওয়ামী লীগের চেয়ে পশ্চিমা দলগুলোর সাথেই কোয়ালিশন করিবেন।. . . এদের যে পার্টিই যত আসন দখল করুন, সবাই শেষ পর্যন্ত পশ্চিমা নেতৃত্বের স্ট্রং সেন্টারের সমর্থক দলের পুষ্টিসাধন করিবেন। ফলে তিনশ' আসনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান হইতে একশ আসনও যদি আওয়ামী লীগ পায়, তবে বাকী দুইশ আসনের 'অধিকারী' ইসলাম পছন্দ দলসমূহই কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে মেজরিটি হইবে। এতে আর কোনও সন্দেহ থাকিতেছে না। আওয়ামী লীগের পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে মেজরিটি পাইবার সম্ভাবনা ছিল খুবই বেশি। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার নেতৃত্বে পশ্চিমা নেতারা এটার আওয়ামী লীগকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন।. . . আওয়ামী লীগ একক মেজরিটি হওয়ায় ইয়াহিয়াসহ সব পশ্চিমা নেতাদের মাথায় আসমান ভাংগিয়া পড়িল। সুফলের আশা যতটা উচ্চ হয়, বিফলের পতনটা হয় তেমনি গভীর খাদে। এটা শুধু পশ্চিমাদের নির্বাচনে হারার ব্যাপার ছিল না। তাদের জন্য এটা ছিল ভেস্টেড ইন্টারেস্টের বিপদ-সংকেত। তাই তারা স্তম্ভিত, ক্রুদ্ধ ও দিশাহারা হইয়া পড়িলেন, অথচ মার্শাল ল'র ছাতার বলে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলিয়া এই নির্বাচনে নকল ভোট ইত্যাদি দুর্নীতির আশ্রয় নেওয়া হইয়াছিল। এ কথাও বলা গেল না।

নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে জি ডব্লিউ চৌধুরী মন্তব্য করেন[৯]–

> নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর এবং যে কোনো মানদন্ডেই তা ছিল অবাধ ও নিরপেক্ষ। ভাগ্যের পরিহাস এটাই ছিল অখণ্ড পাকিস্তানের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ প্রকৃত নির্বাচন। নানা মহলে ব্যক্ত অভিমতের বিপরীতে নির্বাচনী ফলাফল অন্ততঃ পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে শাসক মহল কিংবা সেখানকার রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের যে কোনো ঐকান্তিক পর্যবেক্ষকের কাছেই কোনো বিস্ময় উদ্রেককারী ছিল না।. . .কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের নির্বাচনী ফলাফল বিস্ময়ের উৎপাদন করে বিশেষ করে সেখানে ডানপন্থী ও ধর্মীয় দলগুলোর সম্পূর্ণ পরাজয়ে এবং একজন অপাঞ্জাবী ভুট্টোর পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা হিসেবে আরো সঠিকভাবে বললে পাঞ্জাবের নেতা হিসেবে উত্থানে।

দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৩ ভাগ ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় বাতিল করা হয়েছে। ১৫৩টি ভোটদান কেন্দ্রে ১ কোটি ৬৪ লাখ ৬০ হাজার ভোটার ভোটদান করেছে এবং ৪ লাখ ১৩ হাজার ৮০০রও বেশি ব্যালটপত্র বাতিল ঘোষিত হয়েছে। বেসরকারি হিসেব মতে মোট ভোটারের শতকরা ৫৫.৮ ভাগ ভোটার

---

[৭] মোহাম্মদ হান্নান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৯

[৮] আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা, খোশরোজ কিতাবমহল, পুনমুদ্রণ ২০০৬, পৃ. ৫৩৭-৫৩৯

[৯] জি.ডব্লিউ চৌধুরী, *অখণ্ড পাকিস্তানের শেষ দিনগুলি*, ঢাকা, হক কথা প্রকাশনী, ১৯৯১, পৃ. ১২২

পূর্ব পাকিস্তানে ভোট দিয়েছে।[১০] জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে মোট রেজিস্টার্ড ভোটারদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে শতকরা ৫৭ ভাগ, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে শতকরা ৪৮ ভাগ, পাঞ্জাবে ৬৯ ভাগ, সিন্ধুতে ৬০ ভাগ এবং বেলুচিস্তানে শতকরা ৬০ ভাগ ভোটার ভোটদান করেছেন। প্রধান নির্বাচন কমিশন সূত্র থেকে জানা যায়, সামগ্রিকভাবে দেশের সর্বমোট ভোটার সংখ্যার শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ ভোটদাতা ভোট প্রদান করেছেন।[১১]

সারণি ৭- জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার

রাজনৈতিক দল	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার
আওয়ামী লীগ	৭৫.১১
মুসলিম লীগ কাইয়ুম পন্থী	১.০৭
কনভেনশন মুসলিম লীগ	২.৮১
কাউন্সিল মুসলিম লীগ	১.০৬
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি	২.৮১
ন্যাপ ওয়ালী	২.০৬
জামায়াতে ইসলামি	৬.০৭
জমিয়তে উল উলামায়ে ইসলাম	০.৯২
নেজামে ইসলাম	২.৮৩
অন্যান্য দল	১.২৫
স্বতন্ত্র	৩.৪৭

সূত্র– *Report on General Election,1970-71,* Election Commission, Islamabad, pp 232-233

ভোটদানে উৎসাহ ছিল প্রচুর। পূর্ব পাকিস্তানে ৫৭, পাঞ্জাবে ৬৯, সিন্ধুতে ৬০, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ৪৮ এবং বেলুচিস্তানে ৪০ শতাংশ ভোট প্রদত্ত হয় এবং ৩ শতাংশ ভোট বাতিল হয় যায়।[১২] সফদার মাহমুদের মতে মোট ভোটের মধ্যে আওয়ামী লীগ আনুমানিক ২২.৩৯% ভোট পেয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের ভোট ছিল শতকরা ১০০ ভাগ। নির্বাচন কমিশনের মতে আওয়ামী লীগ ৭৫% ভোট পেয়েছে। আবার অন্য ভাবে বলা হয় যে, মোট ভোটারের মাত্র ৪২% ভোট আওয়ামী লীগ পেয়েছে। এর মধ্যে হিন্দু ভোটারের সংখ্যা ছিল ১৫% এবং পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম ভোটের ১৭% লাভ করে।[১৩]

নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় যে, জাতীয় পরিষদের আসনে বিজয়ী আওয়ামী লীগ প্রার্থী আশরাফ আলী চৌধুরী সর্বাপেক্ষা অধিক ভোট পেয়েছেন। অধিক সংখ্যক ভোট লাভের ক্ষেত্রে পার্টি প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান দ্বিতীয় স্থান

[১০] *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭০
[১১] *ঐ*, ২০ ডিসেম্বর ১৯৭০
[১২] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭২
[১৩] Safdar Mahmood, *Pakistan Divided,* New Delhi, Alpha Bravo. p. 90

Dhaka University Institutional Repository

অধিকার করেন। আশরাফ আলী চৌধুরী ১৮১৭৪৪ ভোট পেয়েছেন। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় স্থান অধিকারী শেখ মুজিবুর রহমান ১৬৪০৭০ ভোট পেয়েছেন। অপর একটি আসনেও তিনি ১২২৪৩৩ ভোট লাভ করেছেন।[১৪] আবার প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে চূড়ান্ত সরকারি ফলাফল ঘোষণার পর জানা যায় যে, পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ রহমান ৮৯২১৩ বৈধ ভোটের মধ্যে ৮৬৬০১টি ভোট পেয়েছেন।[১৫]

সারণি ৮- জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে বিভিন্ন দলের জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়ার শতকরা হার

রাজনৈতিক দলের নাম	জামানত বাজেয়াপ্তের শতকরা হার
কাইয়ুম পন্থী মুসলিম লীগ	৯৬.৯২
পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগ	৯২.৮৫
কনভেনশন মুসলিম লীগ	৯২.৪৭
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি	৮৯.৭৪
কাউন্সিল মুসলিম লীগ	৮৮.০০
ন্যাপ ভাসানী	৮৬.৬৬
ন্যাপ ওয়ালী	৭৬.৩১
নেজামে ইসলাম	৭৩.৪৬
জামায়াতে ইসলামি	৫২.৭৭

সূত্র– *Report on General Election,1970-71,* Election Commission, Islamabad, p 171

নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের ৮২ শতাংশ আওয়ামী লীগ পাওয়ায় বেশির ভাগ প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়।[১৬] জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীরা একচেটিয়াভাবে অপর সকল প্রার্থীকে বিরাট ব্যবধানে পরাজিত করার ফলে প্রায় ৫০০ নির্বাচন প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হবে বলে মনে করা হয়েছে। বিভিন্ন দলের ও স্বতন্ত্র প্রার্থী মিলে মোট ৭৪৬ জন প্রার্থী ১৫৩টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বিজয়ী আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের সঙ্গে অপরাপর প্রার্থীর ভোটের ব্যবধান এত বেশি যে, নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বিগণের জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। যাদের স্থান তৃতীয় ও তারও পরে তাদের জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। যে প্রার্থী প্রদত্ত ভোটের এক অষ্টমাংশ পাবেন না তার জামানত বাজেয়াপ্ত হবে। প্রার্থী পিছু এক হাজার টাকা হিসেবে নির্বাচন কমিশন জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়ার কারণে ৫ লক্ষ বা ততোধিক টাকা পেতে পারে।[১৭] পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে মোট ১৭৪৪ জন প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। প্রাদেশিক নির্বাচন কমিশন সূত্র থেকে জানা যায় যে, প্রার্থীদের জামানত বাজেয়াপ্ত করার ফলে বাজেয়াপ্ত মোট

[১৪] *দৈনিক আজাদ*, ১০ ডিসেম্বর ১৯৭০
[১৫] *ঐ*, ২১ ডিসেম্বর ১৯৭০
[১৬] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭২
[১৭] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ ডিসেম্বর ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

টাকার পরিমাণ হচ্ছে প্রায় ৬ লক্ষ টাকা।[১৮] আনুমানিক ৬৬ শতাংশ প্রার্থী তাদের জামানত হারিয়েছেন। জামানত সবচেয়ে বেশি বাজেয়াপ্ত হয়েছে মুসলিম লীগ কাইয়ুম পন্থী, এরপরে রয়েছে কনভেনশন মুসলিম লীগ ও প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগ। যে সব দল জামানত হারিয়েছেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে কম ক্ষতিগ্রস্থ হয় জামায়াতে ইসলামি।[১৯] জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে যারা আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের নিকট পরাজিত হয়েছেন তাদের মধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ সকল রাজনৈতিক দলের বিপুল সংখ্যক প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এর মধ্যে যারা বিশিষ্ট তারা হচ্ছেন- সাবেক প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য এবং কনভেনশন মুসলিম লীগের প্রার্থী সমিরুদ্দিন প্রধান ৪৩৯৯ ভোট, প্রাদেশিক ন্যাপের ওয়ালী গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেন ৪৯১৩ ভোট, পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সভাপতি মি. মনোরঞ্জন ধর ২৪৫১ ভোট, সাবেক প্রাদেশিক পরিষদের ডেপুটি স্পীকার ও কনভেনশন মুসলিম লীগের প্রার্থী মসিহুল আজম খান ১১০৩০ ভোট, সাবেক পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী ও কাইয়ুম পন্থী লীগের প্রার্থী নুরুল ইসলাম, পনিরুদ্দিন আহমদ, আজিজুর রহমান মোল্লা, ইব্রাহিম খান, আফাজুদ্দিন ফকির, মিয়া মনসুর আলী, সাবেক জাতীয় পরিষদ আহমদ আলী সর্দার, আলহাজ্ব সায়দুর রহমান, বেগম খালেদা হাবিব, মইনুদ্দিন চৌধুরী, সাবেক পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী রইসুদ্দিন, নুরুল হুদা কাদের বক্স ভাসানীপন্থী ন্যাপ (৪০৪২ ভোট) পিডিপি নেতা আলতাফ হোসেন, দরদী সংঘের এটি সাদী (৪২১০ ভোট)। অন্যান্য যে সকল বিশিষ্ট প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে তারা হলেন সাবেক কেন্দ্রীয় উজির আবদুল্লাহ আল মাহমুদ ১৫৫৪ ভোট, তিনজন সাবেক পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী আবদুর রহমান বিশ্বাস, এ কে এম শাসসুল আল আমিন, আফজালুল হক, সাবেক জাতীয় পরিষদ সদস্য ও কনভেনশন লীগের জয়েন্ট সেক্রেটারী এম এ মতিন ৮৩৫ ভোট এবং ওয়ালী ন্যাপের আহমেদুল কবির ৮২৮৪ ভোট।[২০]

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিক্রিয়া

নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে পিপলস পার্টি এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে যে[২১]– দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অবিস্মরনীয় বিজয়ে গণমনের প্রতিক্রিয়া লিখিতভাবে প্রকাশের অবকাশ রাখেন। সংক্ষেপে এতটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার পরপর হইতেই শহরের সকল মহলেই পারস্পরিক সাক্ষাৎলগ্নে প্রথম সম্বোধনসূচক কথাটি হইয়া দাঁড়াইয়াছে 'জয় বাংলা'।

নির্বাচন পরবর্তী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি বিভিন্ন বক্তৃতা বিবৃতির মাধ্যমে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। এসব বক্তৃতা বিবৃতির মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলি এ ফলাফলকে কিভাবে গ্রহণ করেছে তা জানা যায়।

[১৮] *দৈনিক আজাদ*, ২০ ডিসেম্বর ১৯৭০
[১৯] শ্যামলী ঘোষ, *আওয়ামী লীগ ১৯৪৯-১৯৭১*, হাবীব-উল-আলম অনুদিত, ঢাকা, ইউপিএল, ২০০৭। পৃ. ২১৮
[২০] *দৈনিক আজাদ*, ৯ ডিসেম্বর ১৯৭০
[২১] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ ডিসেম্বর ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের প্রতিক্রিয়া

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ৭ ডিসেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে অসাধারণ সাফল্যের জন্য আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ও পিপলস পার্টি প্রধান জনাব ভুট্টোকে অভিনন্দন জানান। দুই নেতার নিকট প্রেরিত একই ধরনের দুইটি অভিনন্দন বাণীতে প্রেসিডেন্ট বলেন, 'আপনার দলের অসাধারণ সাফল্যের জন্য আমি আপনাদের অভিনন্দন জানাই। নির্বাচনী ফলাফলে প্রকাশিত হয় যে, পাকিস্তানের জনগণের অতি বৃহৎ অংশ জাতীয় জীবনের এই ক্রান্তিলগ্নে আপনাদের দলের উপর আস্থা স্থাপন করেছে। আমাদের মাতৃভূমির ঐক্য ও সংহতি রক্ষা এবং জনগণের রাজনৈতিক আকাংখা পূরণ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমৃদ্ধি বিধানে সক্ষম একটি শাসনতন্ত্রের আশায় দেশবাসী এখন সাগ্রহে অপেক্ষা করিবে।' আমি আশা ও প্রার্থনা করি, আপনাদের নেতৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তাদের উপর আরোপিত শাসনতন্ত্র প্রণয়নের গুরু দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করতে সমর্থ হবেন।' [২২] পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বিজয়ী প্রার্থীদের অভিনন্দন জানান। তিনি এক বিবৃতিতে জানান যে. গত ৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত আমাদের ইতিহাসের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে যেসব প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন, আমি তাদের অভিনন্দন জানাই। বিজয়ী প্রার্থীরা এখন তাদের রায়ের মাধ্যমেই বিনম্র আর মহানুভবতা প্রদর্শন করবেন বলেই আমার বিশ্বাস। তিনি আরো বলেন, এ প্রথমবারের মতো পাকিস্তানের জনগণ প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ ভোটে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচনের অবাধ সুযোগ পেয়েছে। উত্তেজনা ছিল অত্যন্ত প্রবল কিন্তু জাতি যে সুশৃঙ্খলার পরিচয় দিয়েছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় আর তাই তা সর্বমহলে প্রশংসাও লাভ করেছে। এতে জাতির রাজনৈতিক সচেতনতার প্রমাণ পাওয়া গেছে। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মূল পরিকল্পনা সামরিক সরকারের রয়েছে। নির্বাচন হচ্ছে তার প্রথম পর্যায় মাত্র। দ্বিতীয় পর্যায় হচ্ছে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন। এ জন্যই নবনির্বাচিত প্রার্থীদের আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, জনগণ তাদের ভোট দিয়ে তাদের উপর বিরাট আস্থা স্থাপন করেছে। দেয়া নেয়া ও সহনশীলতার ভিত্তিতে এখনই তারা শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজে লেগে যান। জাতি এখন তাদের কাছে এই চাচ্ছে। জাতি তাদের উপর যে আস্থা স্থাপন করেছে তারা তা রক্ষা করবেন এ বিশ্বাস আমার আছে। তাদের প্রচেষ্টা সফল হোক এটাই আমার কামনা।[২৩]

পাকিস্তান পিপলস পার্টি

পাকিস্তান পিপলস পার্টি প্রধান জনাব ভুট্টো নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর টেলিফোনে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনা করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের একচেটিয়া জয় লাভের জন্য শেখ মুজিবুর রহমানকে অভিনন্দন জানান।[২৪] পাকিস্তান পিপলস পার্টির করাচী জোনের চেয়ারম্যান জনাব আবদুল হাফেজ পীরজাদা বলেন, গণপরিষদে আওয়ামী লীগ ও পিপলস পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ নির্ধারিত ১২০ দিনের শাসনতন্ত্র রচনার পথ সহজ করে তুলেছে।[২৫]

---

[২২] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১১ ডিসেম্বর ১৯৭০
[২৩] *দৈনিক পাকিস্তন*, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১২ ডিসেম্বর ১৯৭০
[২৪] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১০ ডিসেম্বর ১৯৭০
[২৫] *দৈনিক* আজাদ, ১০ ডিসেম্বর ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান আওয়ামী লীগ

জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান সাংবাদিক সম্মেলনে এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেন যে, আমাদের জনগণ এক ঐতিহাসিক রায় প্রদান করেছে। তারা এক অবিরাম সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাদের এ রায় প্রদানের অধিকার অর্জন করেছে। আমাদের লক্ষ্য ৬-দফা এবং তা বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। তিনি দেশবাসীকে এ আশ্বাস দেন যে, ৬-দফা ভিত্তিক পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা সম্বলিত শাসনতন্ত্র প্রণীত হবে এবং ছয় দফাকে সামগ্রিকভাবে বাস্তবায়িত করা হবে।[২৬] আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে বিজয়ী হওয়ায় পাকিস্তান পিপলস পার্টির প্রধান জনাব ভুট্টোকে অভিনন্দন জানান। তারযোগে প্রেরিত এক ফিরতি অভিনন্দন বার্তায় শেখ সাহেব তাঁর নিকট অভিনন্দন বাণী প্রেরণ করার জন্য জনাব ভুট্টোকে ধন্যবাদ জানান।[২৭] জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের মতো প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান আরেকবার ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগের প্রতি পূর্ণ সমর্থনের পরিচয় দান করায় জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। জনতার উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের এই বিজয় আসলে বাংলাদেশের শোষিত জনগণের বিজয়।[২৮]

পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগ

পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগের প্রেসিডেন্ট জনাব আতাউর রহমান খান নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর শেখ মুজিবকে আওয়ামী লীগের বিরাট সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানান। তিনি তাঁর বিবৃতিতে বলেন, আপনি যে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের জন্য সংস্থান করিতেছেন, পূর্ববাংলার জনগণ তাহা অর্জনের জন্য সুস্পষ্ট রায় দান করেছে। আমিও এ ব্যাপারে আমার সামান্য শক্তি দ্বারা যথাসম্ভব সংগ্রাম করিতেছি। আপনার ভবিষ্যৎ কর্মসূচি সফল করার জন্য আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করুন।[২৯]

কৃষক শ্রমিক পার্টি

কৃষক শ্রমিক পার্টির সভাপতি জনাব এ এস এম সোলায়মান দুই নেতার নিকট প্রদত্ত বাণীতে বলেন যে, দেশে জনগণের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা কায়েমের জন্য গুরুদায়িত্ব তাদের ওপর অর্পণ করেছে। তিনি তাঁর অভিনন্দন বাণীতে শেখ মুজিব ও জনাব ভুট্টোকে বলেন যে, লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য তাঁর দল পূর্ণ সহযোগিতা দান করবে। জনগণের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার ও গণতান্ত্রিক সমাজ কায়েমের জন্য তাদের দলকে গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছে।[৩০]

---

[২৬] *দৈনিক সংবাদ*, *দৈনিক আজাদ*, ১০ ডিসেম্বর ১৯৭০
[২৭] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭০
[২৮] *ঐ*, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৭০
[২৯] *ঐ*, ১০ ডিসেম্বর ১৯৭০; *দৈনিক সংবাদ*, ১১ ডিসেম্বর ১৯৭০
[৩০] *দৈনিক সংবাদ*, ১১ ডিসেম্বর ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান ইসলামিক প্রজাতন্ত্র দল

পাকিস্তান ইসলামিক প্রজাতন্ত্র দলের সভাপতি মওলানা নুরুজ্জামান সমগ্র প্রদেশের জনগণের রায়ের প্রতি শ্রদ্ধার প্রতীক হিসেবে প্রাদেশিক পরিষদের আসন্ন নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের সমর্থনে অন্য সকল প্রার্থীদের প্রত্যাহার করার জন্য আবেদন জানান। জনগণ যে রাজনৈতিকভাবে, সামাজিকভাবে সচেতন এবং তারা যে দুর্দশাগ্রস্থ কোটি কোটি মানুষের কল্যাণের জন্য রাষ্ট্রকে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব পুরোপুরি বুঝতে পেরেছে সে রায় ব্যালটের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে, সুষ্ঠুভাবে এবং অত্যন্ত গণতান্ত্রিক উপায়ে পুরো বিশ্বের নিকট প্রমাণ করার জন্য জাতিকে তিনি অভিনন্দন করেন। ছয় দফা কর্মসূচির উপর রায় নয়া সূচনার ভিত্তি এবং এ লক্ষ্য সম্পন্ন করার কাজ ব্যালটের মাধ্যমেই করতে হবে।[৩১]

কাউন্সিল মুসলিম লীগ

কাউন্সিল মুসলিম লীগ প্রধান মিয়া মমতাজ মোহাম্মদ দৌলতানা নির্বাচন পরবর্তী তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেন যে, আমরা জনগণের রায় মাথা পেতে নিয়েছি। যে সকল দল ও প্রার্থী জয়লাভ করেছে তিনি তাদের মোবারকবাদ জানিয়েছেন।[৩২] কাউন্সিল মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আতাউল হক খান বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের রায় যে শেখ মুজিবের পক্ষে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। জনগণ তাদের নিজের ইচ্ছামত ভোট প্রদানের জন্য গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে পাওয়ায় আমরা পরাজয় বরণ করে নিয়েছি। আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের নিকট সকল দলের পরাজয় আমলাদের সৃষ্ট দুই অংশের মধ্যকার প্রতিবাদ ব্যতীত অন্য কিছু নয়।[৩৩] আবার প্রাদেশিক মুসলিম লীগ প্রধান জনাব খাজা খয়েরউদ্দিন, জনাব মীর সাইফুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক জনাব আতাউল হক খান এক যুক্ত বিবৃতিতে উল্লেখ করেন যে, কাউন্সিল মুসলিম লীগ আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের অনুসৃত যে কোন পদক্ষেপকে প্রয়োজন বোধে সমর্থন অথবা বিরোধিতা করবে। কাউন্সিল মুসলিম লীগ জাতীয় স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে শাসনতন্ত্র রচনার ব্যাপারে শেখ সাহেবের কর্মপন্থার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। তারা আরো বলে যে, আমরা কেবল বিরোধিতার স্বার্থেই বিরোধিতা করব না। বিবৃতিতে আরো বলা হয় যে, জনসাধারণ যেভাবেই হোক ধারণা করে নিয়েছিল যে, শেখ সাহেবের মাধ্যমেই পূর্ব পাকিস্তানিদের সত্যিকার মুক্তি আসবে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে পাকিস্তানের আদর্শ ও সংহতি বিরোধি কোনো কাজ করবে না। এছাড়া শেখ সাহেব তাঁর ছয় দফা বাস্তবায়নের সময় পাকিস্তানকে একটি শক্তিশালী ফেডারেশনে পরিণত করার জন্য ছয় দফার কোনো দফা বাদ দিবেন।[৩৪] আবার কাউন্সিল মুসলিম লীগের সহসভাপতি জনাব এ বি এম শফিকুল ইসলাম ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, গত সোমবারের সাধারণ নির্বাচনে বাঙালিরা হুজুগে ভোট দিয়েছে। জনগণ ছয় দফার পক্ষে রায় দেয় নাই। এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে আবেগ অনুভূতির তাড়নায় তারা শেখ সাহেবকে এ আশায় ভোট দিয়েছে যে, তিনি তাঁর কর্মসূচির খারাপ দিকগুলি শোধরে নিবেন। ছয় দফা পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে কেন্দ্র বলে কিছু থাকবে না এবং এর ফলে দেশই খণ্ড

[৩১] *দৈনিক সংবাদ*, ১১ ডিসেম্বর ১৯৭০
[৩২] *দৈনিক আজাদ*, ১১ ডিসেম্বর ১৯৭০
[৩৩] *দৈনিক সংবাদ*, ১১ ডিসেম্বর ১৯৭০
[৩৪] *দৈনিক আজাদ*, ১২ ডিসেম্বর ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

বিখণ্ড হয়ে যাবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।[৩৫] কাউন্সিল মুসলিম লীগের নেতা এয়ার মার্শাল (অব.) নূর খান সাধারণ নির্বাচনে জয় লাভের জন্য আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান এবং পিপলস পার্টি প্রধান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোকে অভিনন্দন জানান। সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন, জনগণ দেশের দুই অংশে আওয়ামী লীগ ও পিপলস পর্টির প্রতি একক ভাবে আস্থা জ্ঞাপন করে তাদের পরিপক্ক রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রমাণ দিয়েছেন। এজন্য তিনি পাকিস্তানের জনগণকে অভিনন্দন জানান।[৩৬]

পাকিস্তান কনভেনশন মুসলিম লীগ

পাকিস্তান কনভেনশন মুসলিম লীগের সভাপতি জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী বিগত দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ও পশ্চিম পাকিস্তানে পিপলস পার্টির চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য শেখ মুজিবুর রহমান ও জুলফিকার আলী ভুট্টোকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।[৩৭]

জামায়াতে ইসলামি

পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামির আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন, সাম্প্রতিক নির্বাচনে পাকিস্তানের রাজনীতি যুক্তির চেয়ে ভাবাবেগ দ্বারাই অধিক পরিচালিত হয়েছে। এমনকি আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃপক্ষ বিগত এক বছরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে স্বাধীন ভাবে কাজ করার যথাযথ নিশ্চয়তা দানে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি বলেন নির্বাচনের ফলাফল যাই হোক না কেন, গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর দলের অকুণ্ঠ বিশ্বাস রয়েছে। গণতন্ত্রই দেশে রাজনৈতিক নেতৃত্ব পরিবর্তনের একমাত্র মাধ্যম বলে তিনি দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করেন।[৩৮] একদিন পর গোলাম আযম শেখ মুজিবকে অভিনন্দন জানিয়ে পূর্ণ সহযোগিতা দান ও গঠনমূলক বিরোধিতার আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করার ফলে আওয়ামী লীগের কাঁধে এখন গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। নির্বাচনের ফলাফলের দিক হতে জামায়াতে ইসলামির প্রার্থীদের দ্বিতীয় স্থান অর্জন কৃতিত্বের দাবীদার। এতে প্রমাণিত হয় যে পূর্ব পাকিস্তানে তার দলের মূল গভীরে রয়েছে।[৩৯] ঢাকায় গোলাম আযমের সভাপতিত্বে প্রাদেশিক জামায়াতে ইসলামির দুইদিন ব্যাপী কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় নির্বাচনী ফলাফলকে মেনে নিতে অস্বীকার করা হয়। সভায় বলা হয়, নির্বাচন নিরপেক্ষ হয়নি।[৪০] কিন্তু ১২ ডিসেম্বর জামায়াতে ইসলামির ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘের কার্যকরী পরিষদের জরুরি সভায় দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে সন্তোষ প্রকাশ করে প্রস্তাব গৃহিত হয়।[৪১] জামায়াতে ইসলামির নেতা অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল ওমরাও খান বিগত জাতীয় পরিষদে নির্বাচনে অনিয়মানুবর্তিতা ও দুর্নীতি সংক্রান্ত

[৩৫] *দৈনিক ইত্তেফাক*, *দৈনিক সংগ্রাম*, ১২ ডিসেম্বর ১৯৭০
[৩৬] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১০ ডিসেম্বর ১৯৭০
[৩৭] *দৈনিক আজাদ*, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭০
[৩৮] *দৈনিক সংগ্রাম*, ৯ ডিসেম্বর ১৯৭০
[৩৯] *দৈনিক সংবাদ*, ১১ ডিসেম্বর ১৯৭০
[৪০] *দৈনিক পাকিস্তান*, ১১ ডিসেম্বর ১৯৭০
[৪১] *ঐ*, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

অভিযোগের সত্যতা অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, নির্বাচনে দুর্নীতির অভিযোগ বানোয়াট এবং ভিত্তিহীন। ভোট গ্রহণকারী কর্মচারীদের আচরণ ছিল সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ এবং প্রশংসাযোগ্য।[৪২]

ন্যাপ ভাসানী

ন্যাপ ভাসানী পন্থীরা যদিও নির্বাচনে অংশ নেয়নি তবু ন্যাপ প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এক সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিম পাকিস্তান ন্যাপের সাথে পূর্ব পাকিস্তান ন্যাপের সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করেন। তিনি আওয়ামী লীগের এ ঐতিহাসিক বিজয়কে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার প্রশ্নে জনসাধারণের গণভোটের রায় বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন এ বিজয় কোনো ব্যক্তি বা দল বিশেষের নয় বরং এটি ৭ কোটি বাঙালির বিজয়।[৪৩]

ন্যাপ ওয়ালী

নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে ওয়ালী ন্যাপের সভাপতি খান আবদুল ওয়ালী খান বলেন যে, এক অর্থে এর গুরুত্ব তাৎপর্যপূর্ণ, দেশ রাজনৈতিকভাবে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে।[৪৪] তিনি রাওয়ালপিণ্ডিতে এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বলেন, পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে যে দু'টি রাজনৈতিক দল প্রধানত বিজয়ীর বেশে আর্বিভূত হয়েছে, সে দুটি দল হলো আওয়ামী লীগ ও পিপলস পার্টি। দু'টিই মূলত আঞ্চলিক দল। কারণ পশ্চিম পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের বুনিয়াদ নেই, পূর্ব পাকিস্তানে পিপলস পার্টির অস্তিত্বই নেই। এই ঘটনা এই দুই রাজনৈতিক দলের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক স্বরূপ। এক অর্থে এর গুরুত্ব তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ দেশ রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।[৪৫] পূর্ব পাকিস্তান ন্যাপ ওয়ালী পন্থী সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেন এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন যে, 'পূর্ববাংলা'র জনগণ গণতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসন ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ সংগ্রাম করে আসছে। তা বাস্তবায়নে দৃঢ় সংকল্পই ৭ ডিসেম্বরের নির্বাচনের মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। জনগণ পূর্ববাংলার পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে সুদৃঢ়ভাবে রায় দিয়ে এ আন্দোলনকে সাফল্যের পথে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে।[৪৬]

পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি

পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রধান জনাব নূরুল আমীন জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের পর তাঁর এক প্রতিক্রিয়ায় বলেন, গণতন্ত্রের আস্থাশীল হিসেবে আমি জনগণের রায়কে সম্মান করি।[৪৭] তিনি আরো বলেন, আওয়ামী লীগ ও পিপলস পার্টি যদি সমঝোতার মাধ্যমে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনায় এগিয়ে আসে তাহলে কোনো প্রতিবন্ধকতা দেখা দিবে না।[৪৮] পার্টির ভাইস প্রেসিডেন্ট মৌলবী ফরিদ আহমদ এক বিবৃতিতে ৭ ডিসেম্বরের নির্বাচনে প্রতিফলিত জনগণের রায়কে অভিনন্দন

[৪২] *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭০
[৪৩] *দৈনিক আজাদ*, ১০ ডিসেম্বর ১৯৭০
[৪৪] সালাহউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৭
[৪৫] *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৮ জানুয়ারি ১৯৭০
[৪৬] *দৈনিক আজাদ*, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৭০
[৪৭] *ঐ*, ১১ ডিসেম্বর ১৯৭০
[৪৮] *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

জানান। তিনি বলেন, জনগণের রায়ের মধ্যে যারা ভ্রান্তির সন্ধান করেন বা শেখ মুজিবের বিজয়কে যারা খাট করে দেখতে চান, তাদের মনোভাব গণতন্ত্রের অনুকূলে নয়।[৪৯] নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান বলেন, নির্বাচনে জনগণ ভুল রায় দিয়েছে। নসরুল্লাহ অভিযোগ করেন, আবেগ উত্তেজনার পরিবেশে দেশে এ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।[৫০] পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির ভাইস প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল (অব.) সরফরাজ খান জাতীয় পরিষদে নির্বাচনে বিপুল বিজয়ের জন্য শেখ মুজিব ও ভুট্টোকে অভিনন্দন জানান। তিনি এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেন, উভয় নেতাই এক বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের মাধ্যমে গৌরবের এক শীর্ষতম স্থানে আরোহণ করেছেন, জনগণের ব্যাপক সমর্থন লাভ করেছেন।[৫১]

অবিভক্ত বাংলা মুসলিম লীগ

অবিভক্ত বাংলার প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জনাব আবুল হাশিম সাধারণ নির্বাচনে বিরাট সাফল্য লাভের জন্য শেখ মুজিব ও ভুট্টোকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, ইসলাম কখনো বিপদাপন্ন হয় নি বা হবেও না। যারা নিজেদের ইসলাম পছন্দের দাবীদার বলে ঘোষণা করেছেন এবং ইসলামের অভিভাবক সেজে বসেছেন তারাই বিপদাপন্ন হয়েছেন। নির্বাচনে পাকিস্তানের জনসাধারণ যে উচ্চমানের রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় দিয়েছে তার জন্য অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পাকিস্তানের সকল প্রদেশের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের পক্ষে ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন সাধনের পক্ষে রায় ঘোষণা করেছে।[৫২]

পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস

পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি মি. ভবেশ নন্দী তাঁর বিবৃতিতে বলেন, কেন্দ্রীয় আসনের নির্বাচন হলো। নির্বাচনে বিপুল সাফল্যের জন্য আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে আমি অভিনন্দন জানাই। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মাত্র ২টি আসন বাদে সকল আসনেই জয়ী হয়েছে। ফলে কেন্দ্রীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত হয়েছে। দেশের লোক আজ খুশি এ ভেবে যে, নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের ফলে আওয়ামী লীগ কর্তৃক প্রদত্ত সকল ওয়াদা কার্যকরী করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে। ভোটের মাধ্যমে দেশবাসী তাদেরকে দেশের অসংখ্য সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য কাজ করার অধিকার ও সুযোগ দিয়েছে। আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার এবং দেশব্যাপী চূড়ান্ত আর্থিক দুর্গতি ও সামাজিক দুর্নীতি ও অব্যবস্থা দূর করার ব্যাপারে নবনির্বাচিত সদস্যদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সাফল্যের উপর তাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে।[৫৩]

---

[৪৯] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭০
[৫০] *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৭০
[৫১] দৈনিক আজাদ, ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭০
[৫২] *দৈনিক সংবাদ*, ১১ ডিসেম্বর ১৯৭০
[৫৩] *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

খিলাফতে রব্বানী পার্টি

খিলাফতে রব্বানী পার্টির চেয়ারম্যান জনাব এ এম এম মোফাখখার সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অপূর্ব সাফল্য অর্জনের জন্য শেখ মুজিবের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন জানান। সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে তিনি বলেন আঞ্চলিক রাজনৈতিক বৈষম্যের পটভূমিকায় আওয়ামী লীগের এ জয় আঞ্চলিক শোষণের বিরুদ্ধে জনগণের রায় স্বরূপ।[৫৪]

পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম

পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টির পার্লামেন্টারী বোর্ড জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে এবং আসন্ন প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে এসব অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধের কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী জানায়।[৫৫]

তাহরিক-এ ইশতেকলাল পার্টি

তাহরিক-এ ইশতেকলাল পার্টির নেতা এয়ার মার্শাল আসগর খান বলেন, নির্বাচনে তারা তাদের পরাজয়কে মেনে নিয়েছেন।[৫৬]

ছাত্র সমাজের প্রতিক্রিয়া

ক.পূর্ব পাকিস্তান ইসলামি ছাত্রসংঘ

পূর্ব পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘ দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে সন্তোষ প্রকাশ করেছে। কার্যকরী পরিষদের জরুরী এক অধিবেশনে গৃহীত এক প্রস্তাবে আরো বলা হয় যে, ৭ ডিসেম্বরের নির্বাচন সত্যিকার ভাবে অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু না হলেও গণতন্ত্রের উত্তরণের পথে এই প্রথম পদক্ষেপ আশাব্যঞ্জক।[৫৭]

খ. ডাকসু ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ

ডাকসু ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ এক যৌথ বিবৃতিতে আওয়ামী লীগের এই বিরাট সাফল্যকে অভিনন্দিত করে। বিবৃতিতে তারা বলেন, বাংলার মানুষ ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে ৬-দফা ও ১১-দফার সামান্যতম রদবদলও সহ্য করবে না।[৫৮] পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী আওয়ামী লীগের বিজয়কে বাংলার স্বাধিকার আদায়ের প্রশ্নে জনগণের ঐক্যবদ্ধ রায় বলে অভিহিত করেন।[৫৯]

---

[৫৪] *দৈনিক আজাদ*, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭০
[৫৫] *ঐ*, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭০
[৫৬] *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭০
[৫৭] *ঐ*, ১২ ডিসেম্বর ১৯৭০
[৫৮] *ঐ*, ১০ ডিসেম্বর ১৯৭০
[৫৯] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ ডিসেম্বর ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

গ. পূর্ববাংলা ছাত্রশক্তি

পূর্ববাংলা ছাত্র শক্তি ১১ ডিসেম্বর প্রদত্ত এক বিবৃতিতে মওলানা ভাসানীর গণভোট অনুষ্ঠানের দাবির প্রতি সমর্থন করে। সংগঠনের সভাপতি জিয়াউদ্দীন খান ও সাধারণ সম্পাদক আশরাফ হোসেন স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান কায়েমের আহবান জানান।[৬০]

ঘ. পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন ২২ ডিসেম্বর নির্বাচনের সাফল্যকে যাতে গণবিরোধী গোষ্ঠী নস্যাৎ করে দিতে না পারে তার জন্য সবাইকে সর্তক থাকার আহবান জানিয়ে বিবৃতি দেয়। ছাত্র ইউনিয়ন জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রকে পরাজিত করার জন্যও জনগণকে অভিনন্দন জানায়।[৬১]

সুশীল সমাজ

রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি সুশীল সমাজ নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জনাব সাইদুর রহমান আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয় সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, এ গণভোটের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ প্রধান বাংলার স্বাধিকার ও ৬-দফার প্রশ্নে জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করেছেন। বিশিষ্ট মহিলা কবি বেগম সুফিয়া কামাল আওয়ামী লীগ প্রধানকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এ বিজয়ের ফলে জনগণের অবস্থার পরিবর্তন ও মঙ্গল সাধিত হবে।[৬২]

নির্বাচনের ফলাফলের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে অ্যান্থনী ম্যাসকারেনহাস উল্লেখ করেছেন[৬৩]–

> নির্বাচনের ফলাফল বিভিন্ন লোকের কাছে বিভিন্ন তাৎপর্য বহন করেছিল। আওয়ামী লীগের পতাকাতলে বাঙালিরা ছিল বিজয়োল্লাসে উল্লসিত। এই প্রথমবারের মতো তারা প্রকৃত ক্ষমতার আশায় উজ্জীবিত হয়েছিল। এর সঙ্গে অতীতের উপনিবেশিক শাসনপদ্ধতির অবসান ঘটানোর এবং দুই দশকের শোষণের প্রতিকার করার যোগ্যতা তারা অর্জন করেছিল। ভুট্টো কেবল পাঞ্জাবে এবং করাচীতে অপ্রত্যাশিত বিজয় লাভ করেও বিস্তৃত রাজনৈতিক ক্ষেত্র সম্পর্কে তার উল্লাসকে দমন করতে পারেননি। জামাতে ইসলামির মত ধর্মভিত্তিক দলগুলি তাদের পরাজয়কে সহজভাবে স্বীকার করে নিতে পারেনি। সর্বোপরি জামাত প্রকাশ্যভাবে সরকারি হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলেছে। জনগণ যেভাবে তাদের রায় দিয়েছে, সেকথা ভেবে সমগ্র দেশ চরম বিস্ময়বোধ করেছে।. . . নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে সরকার ছিল নিরপেক্ষ এবং সরকার নিজেকে কেবল পরিবর্তনশীল কর্তৃপক্ষ হিসেবে দাবি করেছিল যা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজে এবং যত শীঘ্র সম্ভব নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপার ছিল উৎসর্গীকৃত।. . .

[৬০] *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৭০
[৬১] *ঐ*, ২৩ ডিসেম্বর ১৯৭০
[৬২] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ ডিসেম্বর ১৯৭০
[৬৩] অ্যান্থনী ম্যাসকারেনহাস, মযহারুল ইসলাম অনূদিত, *বাংলাদেশ লাঞ্ছিতা*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩, পৃ. ৭২-৭৩

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামী লীগের বিজয়ের কারণ

নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় ছিল অভূতপূর্ব। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা বিবৃতির মাধ্যমে জনগণের সামনে নির্বাচনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলতে থাকেন যে, এ নির্বাচন বাঙালিদের বাঁচা মরার লড়াই। ছয় দফা দাবি আদায় তথা স্বাধিকার আন্দালনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নির্বাচনের রায় ছিল একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর শেখ মুজিব দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর সংগ্রাম চলবে। পাকিস্তানের তেইশ বছরের ইতিহাসে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে কিনা তা নিয়ে প্রথম দিকে সন্দেহ থাকলেও পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের আন্তরিকতা, প্রচেষ্টা, গৃহিত বিভিন্ন পদক্ষেপ দেখে সকল রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণও আশান্বিত ছিল যে, দেশে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন হবে। যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা জাতিকে আরো বেশি আশান্বিত করে তোলে। শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময়ে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন সকল মহলে গ্রহণযোগ্য হয়। কেউ কেউ নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুললেও আওয়ামী লীগের বিজয়কে স্বীকার করে নেয়। পাকিস্তানের বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলির ভরাডুবি তাদেরকে বাধ্য করে আওয়ামী লীগের বিজয়কে স্বীকার করে নিতে। আওয়ামী লীগের বিজয়ের পিছনে যেসব বিষয় কাজ করেছে সেগুলি হল–

আওয়ামী লীগ শুরু থেকেই নির্বাচনকে গুরুত্বের সাথে নেয়। আইয়ুব খানের সময় থেকে এ দলটি দাবি করতে থাকে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের। কিন্তু আইয়ুব খান সে দাবি পূরণ করেনি। বরং নিজের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার জন্য একের পর এক পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে এক দশক শাসন করেছে। পূর্ববাংলার মানুষের দাবি দাওয়াকে অস্ত্রের ভাষায় দমন করে রাখা হয়। পূর্ববাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি দমনের জন্য আশ্রয় নেন নির্যাতন, জেল জুলুমের। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে বিনা বিচারে মিথ্যা অভিযোগে কারাগারে পাঠানো হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গণঅভ্যুত্থানের মুখে ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা সমর্পন করে রাজনীতি থেকে বিদায় নেন। ইয়াহিয়া খান শুরু থেকেই ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন দিবেন। তিনি একই সাথে ঘোষণা করেন যথাসময়ে রাজনীতির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিবেন। আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্টের একথার প্রেক্ষিতে নির্বাচনে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ঘরোয়া রাজনীতির মাধ্যমে শেখ মুজিব তার নির্বাচনী কার্যক্রম চালিয়ে যান। ১ জানুয়ারি রাজনীতির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার পর তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন। কারণ শুরু থেকেই তার লক্ষ্য ছিল নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিজয় ছিনিয়ে আনা। ঈপ্সিত লক্ষ্য পূরণের জন্য তিনি নির্বাচনী ছক তৈরি করেন। নিজে সার্বক্ষনিক ব্যস্ত থেকে নির্বাচনী প্রচারণা কার্যক্রম চালান। সমগ্র পূর্ববাংলা চষে বেড়ান এবং একাধারে জনসভা, সমাবেশ করতে থাকেন। সকল বক্তৃতা বিবৃতির মাধ্যমে তাঁর ছয় দফা দাবির কথা দৃঢ় ভাবে ব্যক্ত করেন। তিনি বলতে থাকেন ছয় দফার মাধ্যমে বাঙালিদের মুক্তি আসবে। তাঁর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটে নির্বাচনী রায়ে। জনগণ আওয়ামী লীগকে বিপুল ভোটে বিজয়ী করে।

Dhaka University Institutional Repository

শেখ মুজিব তাঁর রাজনীতিক জীবনের শুরু থেকেই সাধারণ মানুষের অধিকার, দাবি দাওয়ার প্রতি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বারোপ করেন। তাঁর রাজনীতির হাতেখড়ি শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কাছ থেকে। মুসলিম লীগের রাজনীতি থেকে শুরু করে ছাত্র রাজনীতিতেও তিনি সবসময়ই ছিলেন সরব। তিনি ছিলেন একই সাথে সুবক্তা, সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল অসাধারণ, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। ১৯৪৯ সালে যখন পাকিস্তানের বিরোধী রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের উত্থান ঘটে তখন থেকে তিনি তাঁর যোগ্যতাবলে লব্ধ প্রতিষ্ঠ দলের যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। কয়েক বছর পর তিনি সাধারণ সম্পাদক হিসেবেও নির্বাচিত হন। রাজনৈতিক জীবনে তিনি শিক্ষা পেয়েছিলেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, ফজলুল হক ও মওলানা ভাসানীর মতো অভিজ্ঞ নেতাদের কাছ থেকে। যা তাঁর পরবর্তী রাজনৈতিক জীবনে একটি ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি করে। আইয়ুব শাসনামলে যখন আওয়ামী লীগে নেতৃত্বের অভাব দেখা দেয় তখন তিনি নিজ যোগ্যতা বলে আওয়ামী লীগের প্রধান হিসেবে দলটির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি নিজের ছয় দফা দাবিকে সমগ্র দেশব্যাপী প্রচার করেন। ছয় দফার ব্যাপারে তাঁর আপোষহীন মনোভাব, স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলনে নেতৃত্ব দান এসব কিছু তাকে পূর্ব পাকিস্তানের যোগ্য রাজনৈতিক ব্যক্তিতে পরিণত করে। আইয়ুব খান শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক মিথ্যা মামলা দায়ের করে কারাগারে অন্তরীণ রাখেন। কিন্তু ছাত্র জনতার আন্দোলনের ফলে শেষ পর্যন্ত শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। এ সময়ই শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেয়া হয় এবং তিনি পরিণত হন গণমানুষের নেতা হিসেবে। জনগণ তাকে কান্ডারী হিসেবে মেনে নেয়। তখন থেকেই শেখ মুজিব বুঝতে পারেন যে, বাঙালিদের মুক্তি আসবে স্বাধিকার আদায়ের মাধ্যমে। মানুষের অধিকার ও পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসনের জন্য তিনি সংগ্রাম করার ঘোষণা দেন। এ জন্য তিনি বেছে নেন নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা। তিনি তখন বলতে থাকেন যে, জনগণের মুক্তি আসবে ছয় দফা দাবি বাস্তবায়নের মাধ্যমে। তারাও উপলব্ধি করতে পারে যে, ছয় দফার মাধ্যমে তাদের দাবি দাওয়া পূরণ হবে এবং এ জন্য শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ এ পরিবর্তনের সূচনা করতে পারে। সেজন্য জনগণ তাদের দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য নিজেদের স্বায়ত্তশাসনের জন্য আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করে। আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দল হলেও দেশের দু'অংশে তার সমান জনপ্রিয়তা ছিল। পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রধান জনাব শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানসহ পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের এক সপ্তাহ পর পর্যন্ত তারযোগে প্রায় ৪ হাজার অভিনন্দন বার্তা পেয়েছেন। এ ৪ হাজার তারবার্তার মধ্যে অর্ধেকের বেশি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এসেছে।[৬৪] এসব অভিনন্দন পাওয়ার ক্ষেত্রে কাজ করেছে শেখ মুজিবের ব্যক্তিগত চরিত্র, সাংগঠনিক দক্ষতা, দলের সুযোগ্য নেতৃত্ব। জনগণ তখন বুঝতে পরে যদি আওয়ামী লীগকে দায়িত্ব দেয়া হয় তাহলে তাদের দাবি দাওয়া, তাদের অধিকার পূরণ হবে।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে মোট পঁচিশটি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। বৃহৎদলগুলির মধ্যে আওয়ামী লীগ ছিল অন্যতম। নির্বাচনে একমাত্র আওয়ামী লীগ একক ভাবে সমগ্র জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের আসনে মনোনয়ন দেয়।

[৬৪] *দৈনিক আজাদ*, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

বাকি কোনো দলই সকল আসনে প্রার্থী দিতে ব্যর্থ হয়। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব দলের প্রধান হিসেবে এবং পার্লামেন্টারী বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুসারে যোগ্য প্রার্থীদের মনোনয়ন দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে তরুণ নেতৃবৃন্দদেরকে প্রাধাণ্য দেয়া হয়। আওয়ামী লীগ একমাত্র দল যারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে প্রাধাণ্য দিত অর্থাৎ আওয়ামী লীগের বেশিরভাগ নেতা ছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তি। যারা দলের প্রতি আনুগত্যশীল ছিলেন তারাই মনোনয়ন পাওয়ার ক্ষেত্রে এগিয়ে ছিলেন। এ সকল তরুণ কর্মঠ নেতৃবৃন্দ দলের বিজয়ের ব্যাপারে ছিল আশাবাদী। তারা নির্বাচনী প্রচারণা কাজের জন্য দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে বেড়িয়েছেন। নিজের দল ও দলের কর্মসূচি জনগণের সামনে তুলে ধরেছেন। প্রচারণা কার্যে শেখ মুজিব নির্দিষ্ট কর্মসূচি তৈরি করেন এবং কেন্দ্রীয় নেতাদেরকে দায়িত্ব ভাগ করে দেন। নিজে নির্বাচনী প্রচারণার পাশাপাশি দলের সকল নেতাকে জনগণের কাছাকাছি গিয়ে তাদের অভাব অভিযোগ শোনার জন্য বলেন। তাদের সকলের প্রচারণার মূল কথা ছিল ছয় দফা দাবিকে কেন্দ্র করে। শেখ মুজিব দেশের সকল আসনকে সমান গুরুত্ব দিয়ে প্রচারণা চালান। এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানে মাত্র আটটি আসনে প্রার্থী মনোনয়ন দিলেও সেখানে শেখ মুজিব নিজে প্রচারণা কার্য চালিয়েছেন। এছাড়া শুরু থেকেই শেখ মুজিব এককভাবে নির্বাচন করার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। তিনি কোনো দলের সাথে আতাঁত করতে রাজি ছিলেন না। কারণ তিনি তাঁর দলের বিজয়ের ব্যাপারে আশাবাদী ছিলেন। শেখ মুজিবের দলের প্রতি ভালবাসা, সাংগঠনিক তৎপরতা, দলের সকল নেতাদের একযোগে কাজ করা এবং সুসংগঠিত প্রচারণার ফলে জনগণের মনে এই আশাবাদ জাগ্রত হয় যে, যদি তারা আওয়ামী লীগকে বিজয়ী করে তাহলে হয়তো তাদের এতদিনের দাবি দাওয়া, অধিকার তারা ফিরে পাবে। এ লক্ষ্য থেকেই তারা আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানকে তাদের একটি অংশ মনে না করে উপনিবেশ হিসেবে তাদেরকে শোষণ করতে থাকে। এ শোষণ চলতে থাকে দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে। অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা, চাকুরী, ব্যবসা বাণিজ্য, সামরিক সকল ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানকে বঞ্চিত করে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বৈষম্যের শিকার হয়। এমনকি রাজনৈতিক ভাবে সচেতন পূর্ববাংলার লোকদের নেতৃত্ব শূন্য করার জন্যও একের পর এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। শেখ মুজিব সর্বপ্রথম এ বৈষম্যের কথা তুলে ধরেন। তিনি তাঁর ছয় দফা দাবির মাধ্যমে পূর্ববাংলার সমঅধিকার ও স্বায়ত্তশাসনের দাবি করেন। নির্বাচনী প্রচারণার সময় আওয়ামী লীগ 'সোনার বাংলা শশ্মান কেন' এই শিরোনামে একটি পোস্টার প্রকাশ করে। যা জনমনে খুব আলোড়ন সৃষ্টি করে। জনগণ তখন বুঝতে পারে যে, শাসক গোষ্ঠী তাদের এতদিন কিভাবে শোষণ করেছে। আর এ শোষণের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তারা বেছে নেয় ১৯৭০ সালের নির্বাচনকে। ব্যালটের মাধ্যমে তারা তাদের রায় প্রদান করে এবং পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র নির্ভরযোগ্য রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের হাতে নতুন নেতৃত্ব তুলে দেয়।

আওয়ামী লীগ যেমন এককভাবে নির্বাচনে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এর সাথে সাথে নির্বাচনী ইশতাহারে তারা তাদের বিস্তারিত কর্মসূচি তুলে ধরে। আওয়ামী লীগের ইশতাহার ছিল অনেক বেশি জনকল্যাণমুখী। ছয় দফার বাস্তবায়ন,

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালির প্রতি বৈষম্য দূর, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, কৃষক শ্রমিকদের কল্যাণে গৃহিত কর্মসূচি এসব কিছু জনগণকে বেশি আকৃষ্ট করে। জনগণ বুঝতে পারে যে, অন্যান্য দলের নির্বাচনী ইশতাহারে পূর্ববাংলার স্বার্থের কথা তেমন বলা হয়নি। তাই তারা সেসব দলের মিথ্যা বুলিতে আকৃষ্ট হয়নি। নির্বাচনী ইশতাহারের ছয় দফার দাবির প্রতি তারা সমর্থন জানাতে আওয়ামী লীগকে ভোট দান করে।

নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় ছিল বাঙালিদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের চরম অবজ্ঞা ও উদাসীনতার বিরুদ্ধে রুদ্র রোষের বহিঃপ্রকাশ। এই নির্বাচনে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ছয় দফা দাবির পক্ষে সুস্পষ্ট রায় প্রদান করে। মূলত আওয়ামী লীগ পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে সারা বাংলাদেশে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। নির্বাচনী ফলাফলের লক্ষ্যণীয় দিক হলো যে সমস্ত দল দীর্ঘদিন ধরে পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়িয়ে এসেছে, পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষীর জাতির মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে অস্বীকার করে এসেছে এবং সাধারণ মানুষকে শোষণের জোয়ারে আবদ্ধ রাখতে চেয়েছে, সেই সমস্ত দক্ষিণপন্থী দলগুলিকে পাকিস্তানের জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে সরাসরি বর্জন করল। এই নির্বাচনে পাকিস্তানবাদী উগ্রপন্থী ধর্মান্ধ দলগুলির দারুণ পরাজয় ঘটে।[৬৫] পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর কাছে নির্বাচনের রাজনৈতিক ফলাফল ছিল ১৯৭০ সালের পূর্ববাংলায় ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছাসের কারণে প্রাকৃতিক ক্ষয়ক্ষতির চেয়েও অধিক ভয়াবহ।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে এটা স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন। ২৭ নভেম্বর ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তৃতাকালে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১২ নভেম্বরের প্রলংয়করী ঘূর্ণিঝড়ে বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলীয় অঞ্চলের সর্বশ্রান্ত ব্যক্তিদের সাহায্য দান ও উদ্ধারকার্যে সরকারি নিষ্ক্রিয়তার ব্যাপারে শেখ মুজিবের অভিযোগের জবাব দানের সময় তাঁর সম্পর্কে একটি প্রচ্ছন্ন ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন। ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের অকল্পনীয় ক্ষয়ক্ষতির প্রেক্ষিতে দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রশ্নে সৃষ্ট সকল প্রকার জল্পনা ও কল্পনার অবসান ঘটিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এ সাংবাদিক সম্মেলনে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন, নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ প্রধান দ্রুত ক্ষমতাসীন ও তাঁর স্থলাভিষিক্ত হোক এটা তিনি আশা করেন। যত শীঘ্র তিনি আমার স্থান অধিকার করতে পারবেন, আমি তত বেশি আনন্দিত হবো। আমি আমার ব্যারাক জীবনে ফিরে যেতে উদগ্রীব।[৬৬]

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব তাঁর ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি উত্থাপন করার পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী প্রচার করতে থাকে যে, ছয় দফা বাস্তবায়ন হলে দেশ খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যাবে এবং শেখ মুজিব ছয় দফার মাধ্যমে বিচ্ছিন্নতার কথা প্রচার করছেন বলে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি প্রচার করতে থাকে। কিন্তু পূর্ববাংলার জনগণ বুঝতে পারে

[৬৫] মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও শেখ মুজিব*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯১, পৃ. ১১২
[৬৬] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১১ ডিসেম্বর ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

স্বায়ত্তশাসন মানে আলাদা হয়ে যাওয়া নয়। ছয় দফার সাথে যখন ছাত্র সমাজের এগার দফা যুক্ত করা হয় এবং জনগণের মাঝে ছয় দফার যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয় তখন জনগণও বুঝতে পারে যে, একমাত্র ছয় দফার মাধ্যমে পূর্ববাংলার স্বাধিকার অর্জন করা সম্ভব। আর শেখ মুজিব যে বিচ্ছিন্নতার দাবি করছেন তা যে মিথ্যা তাও তারা উপলব্ধি করতে পারে। এমনকি নির্বাচনের পরে পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামির প্রধান অধ্যাপক গোলাম আযম লাহোরে বলেন যে, গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্য প্রায় অর্জিত হয়ে এসেছে এবং এখন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুষ্ঠু কার্যকারিতায় জাতিকে সহযোগিতা করতে হবে। জনগণ মাসওয়াত ই মোহাম্মদী পক্ষে ভোট দিয়েছে। শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অবিচার অবসানের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করলে পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণ তাঁর সাথে সহযোগিতা করা উচিত। শেখ মুজিব কখনো বিচ্ছিন্নতার আওয়াজ তোলেন নাই এবং তিনি কখনও এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন না।[৬৭] নির্বাচনে পূর্ববাংলার পূর্ণ সাফল্য লাভের অধিকারী আওয়ামী লীগের দাবি ছিল স্বায়ত্তশাসন, স্বাধীনতা নয়। উল্লেখ করার মতো ব্যাপার এই যে, নির্বাচনের পূর্বে বা নির্বাচনের সময় কিংবা নির্বাচনের পরে কখনো একবারও শেখ মুজিব স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করেননি।[৬৮]

আওয়ামী লীগের বিজয়ের পিছনে কাজ করেছে দলীয় শৃঙ্খলা, দলীয় প্রধানের নির্দেশ অনুযায়ী সকল কেন্দ্রীয় নেতার একযোগে নির্বাচনী প্রচারণা। কেননা শেখ মুজিবের প্রচারণার কৌশল ছিল নির্বাচনের আবেদন নিয়ে জনগণের কাছে পৌছতে হবে। আর সে কাজটাই করেছে আওয়ামী লীগ প্রধান সহ সকল কেন্দ্রীয় নেতা। তাজউদ্দিন আহমদ, এ এইচ এম কামরুজ্জামান, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এম মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক আহমদ, ড. কামাল হোসেন এমনকি ছাত্রলীগের নেতারাও আওয়ামী লীগের হয়ে ব্যাপক ভাবে প্রচারাভিযানে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে গিয়েছেন। আওয়ামী লীগই একমাত্র দল যারা সবচেয়ে বেশি প্রচারণা চালিয়েছে, সভা শোভাযাত্রা করেছে। তাদের সকলের প্রচারণার মূল কথা ছিল ছয় দফা। ব্যাপক মাত্রায় প্রচারাভিযানের কারণে আওয়ামী লীগ জনগণের কাছে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

আওয়ামী লীগের জয়ের পিছনে কাজ করেছে ভোটারদের ভোট দানের আগ্রহ ও উৎসাহ উদ্দীপনা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ তেইশ বছরে জনগণ কখনও সরাসরি তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি। যার কারণে এ প্রথম যখন তারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ পেলো তারা এটার সদ্ব্যবহার করে। অনেক ভোটার মনে করে যদি সে সময়মতো তার ভোট না দেয় তাহলে হয়তো তার ভোটের জন্য শেখ মুজিব জিততে পারবে না। এক্ষেত্রে মনে করা হয় যে জনগণ একান্তই নিজের দায়িত্ববোধের জায়গা থেকে তাদের প্রথম রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগ করেছে। আর এ প্রয়োগের ক্ষেত্রে এমন দলকে বেছে নিয়েছে যাতে তাদের ভোটটি নষ্ট না হয়। জনগণও হয়তো বুঝতে পেরেছিল যে এবারের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ম্যান্ডেট হবে।

---

[৬৭] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭০

[৬৮] অ্যান্থনী ম্যাসকারেনহাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনে শেখ মুজিবের ভোট চাওয়ার কৌশলও ছিল ভিন্নতর। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সহ সকল মুসলিম লীগের নেতারা জনগণের কাছে ভোট চাইতে গিয়ে বলেছিলেন যদি ল্যাম্পপোস্টকেও তারা যোগ্য প্রার্থী মনে করেন তবে তাহলে যেন সেটাকে ভোট দিয়ে জয়ী করে। একই কৌশল ছিল ১৯৭০ সালের নির্বাচনেও। শেখ মুজিব ভোট চাওয়ার ক্ষেত্রে বলে দিয়েছিলেন প্রার্থী কে তা বিবেচ্য নয়, যদি তারা উপযুক্ত প্রার্থী না পায় তাহলেও যেন নৌকা প্রতীককেও ভোট দেয়। জনগণ তাই ভোট দেয়ার ক্ষেত্রে প্রার্থী কে তা বিবেচনা করেনি। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল শেখ মুজিব ও নৌকাকে ভোট দেয়া। যার কারণে শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তান থেকে একক ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে।

অনেকে মনে করেন সত্তরের নির্বাচনের প্রাক্কালে 'ভোটের আগে ভাত চাই' স্লোগান উচ্চারণ করে মওলানা সাহেব যে সযত্নে ভাসানীপন্থী ন্যাপের বামপন্থী মহলকে দিয়ে নির্বাচন বয়কট করেছিলেন, সেটা শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগকে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেয়ার লক্ষ্যে একটি রাজনৈতিক কৌশল ছিল।[৬৯] মওলানা ভাসানী যদি নির্বাচনে অংশ নিতেন তাহলে ভাসানীপন্থী ন্যাপও কিছু আসন পেতো। সেক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না হলেও প্রথম স্থান অর্জিত হতো এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ভাসানী পন্থী ন্যাপ নির্বাচন থেকে সড়ে দাঁড়ানোর কারণে ভাসানী পন্থী ন্যাপের ভোটগুলিও শেখ মুজিবের বাক্সে পড়ে।

রাও ফরমান আলীর মতে, যে রাজনৈতিক দলগুলো দায়সারা ভাবে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছিল, নির্বাচনে পরাজয়ের আশংকা করছিল বা প্রচারাভিযানে পিছিয়ে পড়ছিল, তাদের জন্য ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসে সৃষ্ট বিপর্যয় এক আর্শীবাদ হয়ে দেখা দিয়েছিল। এ ধরণের নেতৃবৃন্দ নির্বাচনকে স্থগিত করার দাবি তুললেন। আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের বিরুদ্ধে জয় লাভের ব্যাপারে তারা কোনো ভাবেই নিশ্চিত ছিলেন না। যাদের সামান্য হলেও পরিষদে যাওয়ার আশা ছিল, তারাও আওয়ামী লীগের আধিপত্যাধীন পরিষদে গিয়ে বিচ্ছিন্ন হতে চাচ্ছিলেন না। উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা থেকে তারা বিরত হয়েছিলেন।[৭০] এর ফলে জনগণ যখন দেখলো যে, পাকিস্তানের অন্যান্য রাজনৈতিকদলগুলি নির্বাচনের পরাজয়ের ভয়ে নির্বাচনী অঙ্গন থেকে বিদায় নিচ্ছে তখন জনগণ তাদের করণীয় বুঝতে পারে। প্রত্যাহারের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচনটি এক তরফা বিষয়ে পরিণত হয়ে পড়ছিল। প্রথম থেকে এগিয়ে থাকা আওয়ামী লীগকে উল্লেখযোগ্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হয়নি। ধারণা করা হয়েছিল যে, নির্বাচনের প্রাক্কালে আওয়ামী লীগে বাঙালি জাতীয়তাবাদের অনুভূতি উস্কে দেয়ার এবং এর ফলকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে কতিপয় বিষয়কে সামনে নিয়ে আসবে। কিন্তু সে প্রচেষ্টা আর চালাতে হয়নি। তাদেরকে শুধু ঠোট নাড়তে হয়েছে, বাকি কাজ করে দিয়েছে প্রকৃতি, স্থানীয় সংবাদপত্র ও বিদেশি সাংবাদিকরা।[৭১] তাঁর মতে আওয়ামী লীগের বিজয়ের পিছনে এসব বিষয়গুলি কাজ করেছে।

---

[৬৯] এম আর আখতার মুকুল, *ভাসানী মুজিবের রাজনীতি*, ঢাকা, সাগর পাবলিশার্স, ১৯৮৯, পৃ. ১৯৬

[৭০] রাও ফরমান আলী, *বাংলাদেশের জন্ম*, ঢাকা, ইউপিএল, ১৯৯৬, পৃ. ৪১

[৭১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১-৪২

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের প্রতি এই বিপুল রায় ছিল প্রকারান্তরে ছয় দফা কর্মসূচির প্রতি গণরায়। এই গণরায় ছিল পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসনের জন্য পূর্ববাংলাবাসীর ম্যান্ডেট স্বরূপ। আওয়ামী লীগের প্রতি জনগণের দেয়া এই ঐতিহাসিক রায়ের মাধ্যমে জনগণ অন্যান্য রাজনৈতিক দলসমূহের কর্মসূচিকে প্রত্যাখ্যান করে। পাকিস্তানে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে ডানপন্থী দলসমূহের এই চিরাচরিত ভাওতাবাজিকে পূর্ববাংলার জনগণ প্রত্যাখ্যান করেন।[৭২]

সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ববাংলায় ভয়াবহ বন্যা হয়। ডানপন্থী দলগুলির দাবির মুখে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান নির্বাচন পিছিয়ে দেন। কিন্তু নির্বাচনী প্রচারণা যখন তুঙ্গে তখনি পূর্ববাংলার দক্ষিণের উপকূল অঞ্চলে আঘাত হানে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস। লাখ লাখ মানুষ প্রাণ হারায়। কিন্তু এ সময় পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী তাদের প্রতি সাহায্যের হাত না বাড়িয়ে বরং যে বিমাতা সুলভ আচরণ করে তা বাঙালিদের খুব ব্যথিত করে। দুর্যোগের ভয়াবহতা স্বীকারে সরকারের গড়িমসি, ত্রাণকাজে এগিয়ে আসতে অনীহা, সামরিক বাহিনীর লোকজনের দুর্বব্যহার এবং পদে পদে বাধাবিপত্তি বাঙালিদের খুব তিক্ত করে তোলে। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর মতো পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা এসময় পূর্ববাংলার লোকদের পাশে এসে দাড়াঁয়নি। ব্যতিক্রম শুধু খান আবদুল ওয়ালী খান। শাসকগোষ্ঠীর এমন কার্যকলাপে পূর্ববাংলার লোকেরা বুঝতে পারে যে, এখন থেকে তাদেরকে নিজেদের পথ বেছে নিতে হবে। কারো উপর নির্ভর করে নয় নিজেদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে। তাই এদেশের জনগণ নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য এবং শাসকগোষ্ঠীকে সমুচিত জবাব দেয়ার জন্য বেছে নেয় ব্যালট বাক্স। ব্যালটের মাধ্যমে তারা রায় দিয়ে আওয়ামী লীগকে বিজয়ী করে।

[৭২] মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*, ঢাকা, সময় প্রকাশন, ১৯৯৯, পৃ. ২২৫

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

গণমাধ্যম ও ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন

১৯৭০ সালের তফসিল অনুযায়ী ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের ও ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ও পশ্চিম পাকিস্তানে ভুট্টোর পিপলস পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পাকিস্তানের দীর্ঘ তেইশ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জনগণ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। পাকিস্তানের এই নির্বাচন নিয়ে এদেশের মানুষের যেমন আগ্রহের কমতি ছিল না তেমনি বর্হিঃবিশ্বেও এর প্রতি ছিল তুমুল আগ্রহ। নির্বাচনে জনগণের আগ্রহ তৈরিতে গণমাধ্যম সর্বাধিক ভূমিকা রাখে। গণমাধ্যম অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় বেতার টেলিভিশন, দেশে প্রচলিত সংবাদপত্রসমূহ একটি সমাজের দর্পন স্বরূপ। যে কোনো দেশের গণমাধ্যমে সে দেশের জনমতের প্রতিফলন পাওয়া যায়। স্বাধীন চিন্তা ও মত প্রকাশ আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের মৌলিক অধিকার। সে ক্ষেত্রে গণমাধ্যম স্বাধীন মতামত প্রকাশ ও খবরাখবর সংগ্রহ করে জনগণের মৌলিক অধিকার ও মুক্তির পথ নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। একই সঙ্গে যারা অগণতান্ত্রিকভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা কুক্ষিগত করে নানা নিপীড়ন ও বল প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষের মৌলিক অধিকার হরণ করার প্রয়াস চালায় তাদের বিরুদ্ধেও সংবাদপত্র নিরন্তর নির্ভীক সংগ্রাম চালিয়ে জনগণের মুখপাত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তাই গণমাধ্যমকে সমাজের দর্পন বলা হয়। কিন্তু দেশ কাল ভেদে গণমাধ্যমের এ ভূমিকা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। পাকিস্তান শাসনামলে পরিচালিত প্রতিটি গণআন্দোলনে গণমাধ্যমের ভূমিকা এবং রাজনীতির গতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রের চরিত্রও পরিবর্তন হয়েছে।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে গণমাধ্যমের ভূমিকা সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় পূর্ব পাকিস্তানে সবচেয়ে শক্তিশালী গণমাধ্যম ছিল দৈনিক সংবাদপত্র। তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিভিন্ন ধরনের, বিভিন্ন মতের সমর্থক পত্রিকা ছিল। পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলিতে সাধারণত পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলীকে প্রাধান্য দেয়া হতো বেশি। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত অনেক পত্রিকা এ সময় পূর্ব পাকিস্তানে প্রচলিত থাকলেও এসব সংবাদপত্রে সরকারি সংবাদ বেশি পরিবেশিত হতো। দেশের আপামর জনসাধারণ এসব গণমাধ্যমে শুধুমাত্র সরকারি কর্মকাণ্ডের বিবরণ খুঁজে পেতো। তাদের প্রকাশনায় পুর্ব পাকিস্তানের সংবাদ নেতিবাচকভাবে পরিবেশিত হতো। যদিও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা প্রকাশিত হতো তাও খুব ছোট করে। তেমনি নির্বাচন সংক্রান্ত সংবাদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। নির্বাচন সংক্রান্ত সরকার কি করছে শুধু তা পশ্চিম পাকিস্তানের গণমাধ্যমে ফলাও করে প্রকাশিত হতো।

Dhaka University Institutional Repository

এই অধ্যায়ে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ঘোষণার পর থেকে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা গ্রহণের পর আইনগত কাঠামো আদেশ ঘোষণা, নির্বাচনী কর্মকাণ্ড, নির্বাচনী ফলাফল এসব বিষয়ের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা কেমন ছিল তা আলোকপাত করা হয়েছে।

সমসাময়িক গণমাধ্যমগুলির বৈশিষ্ট্য

একটি দেশের সংবাদপত্র বা গণমাধ্যম সে দেশের প্রতিচ্ছবি। গণমাধ্যমের মাধ্যমে একটি দেশের সমাজের সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায়। তেমনি পাকিস্তানের ইতিহাসে গণমাধ্যমগুলো একদিকে যেমন রাজনৈতিক চিত্র তুলে ধরেছে অপরদিকে দেশের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক সকল দিক সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা তুলে ধরেছে। পাকিস্তান শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তানের গণমাধ্যমগুলি কোনো না কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করেছে। গণমাধ্যমসমূহের মালিক সম্পাদক যে শ্রেণীর মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন, গণমাধ্যম সেই শ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় বেশি কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে। তাই গণমাধ্যমকে সমাজের দর্পন বলা হলেও নানা মত বা স্বার্থে বিভাজিত সমাজ ও রাষ্ট্রে গণমাধ্যম শ্রেণী নিরপেক্ষ নয়। এজন্য গণমাধ্যমের নিরপেক্ষতা একটি বিতর্কিত বিষয়। তবে একথা বলা যায় যে, জাতীয় আন্দোলনে বা মুক্তি সংগ্রামে গণমাধ্যম সাধারণত দুটি গোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি হলো শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থবাহী গণমাধ্যম; যারা সরাসরি শাসকশ্রেণীর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয়টি হলো জাতীয়তাবাদী গণমাধ্যম যেগুলিতে জাতি বা নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর আশা আকাঙ্ক্ষার কোনো প্রতিফলন ঘটে এবং শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে জনগণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। পাকিস্তান শাসনামলে যে সকল গণমাধ্যম সংবাদ পরিবেশন করতো সেগুলি হচ্ছে- দৈনিক মর্নিং নিউজ, দৈনিক ডন, দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার, দৈনিক পাকিস্তান, দৈনিক আজাদ, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক পূর্বদেশ, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক সংগ্রাম। এছাড়া চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হতো দৈনিক জামানা, মিল্লাত এবং পয়গাম। এসব গণমাধ্যম উপরোক্ত দুটি শ্রেণীর চরিত্র ধারণ করে সংবাদ পরিবেশন করতো। এর মধ্যে বেশিরভাগ গণমাধ্যমের জন্ম ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর। ১৮৫৬ সালের পূর্বে ঢাকা থেকে কোন সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়নি।[১] ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা ইংরেজি সাপ্তাহিক দি ঢাকা নিউজ।[২] পূর্ব পাকিস্তান থেকে এতগুলি সংবাদপত্র প্রকাশ হলেও তখনকার রাজনীতির তথ্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় পত্রিকা ছিল দৈনিক মর্নিং নিউজ, দৈনিক দি ডন, দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার, দৈনিক আজাদ, দৈনিক পাকিস্তান, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক সংগ্রাম, দৈনিক পূর্বদেশ। এসব পত্রিকাগুলি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেছে। নিম্নে এ সকল পত্রিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো-

দৈনিক আজাদ

দৈনিক আজাদ বাংলা ভাষাভাষী পত্রিকা। ১৯৩৬ সালে এটি প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ১৯৯২ সাল পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে

[১] মোঃ এমরান জাহান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস ও সংবাদপত্র*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০৮, পৃ. ২৯
[২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০

Dhaka University Institutional Repository

এর প্রকাশনা অব্যাহত ছিল। দৈনিক আজাদ ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা পত্রিকা। ঔপনিবেশিক শাসনোত্তর কালে দৈনিক আজাদ পত্রিকার স্বত্বাধিকারী মাওলানা আকরাম খাঁ ক্ষমতাসীন পূর্ববাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ফলে পূর্ববাংলা সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ১৯৪৮ সালে দৈনিক আজাদ কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। ঢাকেশ্বরী রোডের নিজস্ব অফিস থেকে ১৯৪৮ সালের ১৯ অক্টোবর দৈনিক আজাদ প্রথম প্রকাশিত হয়।[৩] দৈনিক আজাদ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ঢাকায় স্থানান্তরের পর আবুল কালাম শামসুদ্দীন এর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া খায়রুল কবীর, মুজিবুর রহমান খান ও আবু জাফর শামসুদ্দীন এর সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেছেন। স্থানান্তরের অল্পকিছুদিনের মধ্যেই এ পত্রিকা পূর্ব পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় পত্রিকা হিসেবে পাঠকের মাঝে তার স্থান দখল করে নেয়। মাওলানা আকরাম খাঁর মৃত্যুর পর এ পত্রিকাটি তার জনপ্রিয়তা হারায়। শুরু থেকেই এ পত্রিকাটি মুসলিম লীগের স্বার্থবাহী পত্রিকা হিসেবে চিহ্নিত হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক

দৈনিক ইত্তেফাক প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর। এর প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালন করেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও ইয়ার মোহাম্মদ খান। শুরুতে এটি ঢাকার ৭৭ নং মালিটোলা থেকে সপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে এটি আওয়ামী লীগের মুখপাত্র হিসেবে আওয়ামী লীগের অর্থে প্রকাশিত হতো। মওলানা ভাসানী ও ইয়ার মোহাম্মদ খান রাজনীতিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ার কারণে তারা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে এর সম্পাদক হিসেবে নিয়োগ করে। প্রকাশনার পর থেকেই সাপ্তাহিক ইত্তেফাক হয়ে ওঠে কট্টর মুসলিম লীগ বিরোধী পত্রিকা।[৪] দৈনিক ইত্তেফাক শুরু থেকেই পাকিস্তানের সামরিক শাসনের বিশেষ করে আইয়ুব খান ও ইয়াহিয়া খানের বিরোধিতা করে। একই সাথে ১৯৬৬ সালে যখন ঐতিহাসিক ছয় দফা প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় তখন ইত্তেফাক একে সমর্থন করে। কিন্তু সামরিক সরকার তখন পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ রাখায় ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের সময়কাল পর্যন্ত পাঠক এর অনুপস্থিতি অনুভব করে।[৫] দৈনিক পত্রিকা হিসেবে আর্বিভূত হওয়ার পর পত্রিকাটি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কথা বলতে থাকে।

দৈনিক দি ডন

ডন পাকিস্তানের সবচেয়ে পুরনো ইংরেজি পত্রিকা। ১৯৪১ সালের ২৬ অক্টোবর কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ এটি দিল্লিতে প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম অবস্থায় এটি ছিল একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ এ পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মন্তব্য করেন[৬]-

---

[৩] মোঃ এমরান জাহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮

[৪] সুব্রত শংকর ধর, *বাংলাদেশের সংবাদপত্র*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, পৃ. ৪০

[৫] প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ১৯৬৬ সালের ১৭ জুন থেকে ১১ জুলাই পর্যন্ত এর প্রকাশনা বন্ধ রাখে। পরবর্তীতে আবার ১৯৬৬ সালের ১৭ জুলাই থেকে ১৯৬৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এর প্রকাশনার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে প্রকাশনা বন্ধ রাখে।

[৬] *উইকিপিডিয়া*

Dhaka University Institutional Repository

> "The Dawn will mirror faithfully the views of Hindustan's Muslims and the All Hindustan Muslim League in all its activities: economic, educational and social and more particularly political, throughout the country fearlessly and independently and while its policy will be, no doubt, mainly to advocate and champion the cause of the Muslims and the policy and programme of the All Hindustan Muslim League, it will not neglect the cause and welfare of the peoples of this sub-continent generally."

১৯৪২ সালের অক্টোবর থেকে এটি দৈনিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়। পোথান জোসেফ ছিলেন এর সম্পাদক। কিন্তু পত্রিকাটি ভারত বিভাগকে সমর্থন করায় তিনি সম্পাদক পদ থেকে ইস্তফা দেন। পরবর্তীতে এর সম্পাদক হন আলতাফ হোসেন। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর এটি করাচী থেকে প্রকাশিত হয়।

দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার

দেশবিভাগের পর ঢাকা থেকে প্রকাশিত কোনো ইংরজি পত্রিকা ছিল না। ফলে ভাষাগত কারণে পাকিস্তান রাষ্ট্রের উভয় অংশের মধ্যে খবর আদান প্রদানে সমস্যা দেখা দেয়। এ প্রেক্ষাপটে মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা হামিদুল হক চৌধুরীর পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৪৯ সালের ১১ মার্চ দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার প্রকাশিত হয়। পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন মোঃ শেহাবুল্লাহ এবং সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান করেন জহুর হোসেন চৌধুরী ও মোহাম্মদ আবদুল হাই।[৭] মুসলিম লীগের অন্তঃকলহের জের ধরে ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে হামিদুল হক চৌধুরী মুসলিম লীগ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান অবজারভার ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।[৮] ইতিমধ্যে মুসলিম লীগ সরকারের অদুরদর্শী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার জনমনে অসন্তোষ দানা বাঁধে। ফলে পাঠকের নিকট পাকিস্তান অবজারভার জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

দৈনিক মর্নিং নিউজ

১৯৪৯ সালের ২০ মার্চ কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তারিত হয় মর্নিং নিউজ পত্রিকা। কলকাতায় ছিল এটি দৈনিক কিন্তু পূর্ববাংলা থেকে প্রকাশিত হতো সাপ্তাহিক হিসেবে। ঐ বছরের ডিসেম্বর থেকে প্রকাশিত হতে থাকে দৈনিক হিসেবে। এর স্বত্বাধিকারী ছিলেন খাজা নাজিমুদ্দীনের আত্মীয় খাজা নুরুদ্দীন।[৯] মনিং নিউজ শুরু থেকেই সরকার সমর্থক একটি পত্রিকা ছিল। এটি মুসলিম লীগ সরকারের একমাত্র ইংরেজি মুখপাত্র হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে।[১০]

দৈনিক সংবাদ

কলকাতা যুগের দৈনিক আজাদ পত্রিকার বার্তা সম্পাদক খায়রুল কবীরের সম্পাদনায় ১৯৫১ সালের ১৭ মে প্রকাশিত হয় দৈনিক সংবাদ। বিভাগোত্তর পূর্ববাংলার ঢাকা থেকে প্রকাশিত কোনো দৈনিকের বাংলা নাম এটিই প্রথম। আর্থিক সংকটের কারণে পরিচালনা কর্তৃপক্ষ দৈনিক সংবাদের প্রকাশনা অব্যাহত রাখতে ব্যর্থ হয়। এ সুযোগে মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন

[৭] মোঃ এমরান জাহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০
[৮] অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫*, ঢাকা, খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৮২, পৃ. ৯৭
[৯] সুব্রত শংকার ধর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০
[১০] মোঃ এমরান জাহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০

Dhaka University Institutional Repository

পত্রিকাটির প্রকাশনা স্বত্ব কিনে নেন। শুরুতে এ পত্রিকা বামপন্থী রাজনীতিবিদদের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করে সরকারের সমালোচনায় সরব ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে মালিকানা পরিবর্তনের কারণে এর সংবাদ পরিবেশনের চরিত্রও বদলে যায়।

দৈনিক সংগ্রাম

দৈনিক সংগ্রাম জামায়াতে ইসলামি সমর্থক পত্রিকা। তাদের পরিবেশিত সংবাদ সবসময় জামায়াতে ইসলামির সমর্থন, সরকারের গুণগান, অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির বিশেষ করে আওযামী লীগ ও বামপন্থী দলগুলির সমালোচনা বেশি লক্ষ্য করা যায়।

দৈনিক পূর্বদেশ

দৈনিক পূর্বদেশ পূর্ব পাকিস্তান সমর্থক পত্রিকা। শুরু থেকেই এ পত্রিকা পাকিস্তানের সামরিক শাসনের সমালোচনায় মুখর ছিল যা পত্রিকায় পরিবেশিত সংবাদ সমূহে সুস্পষ্ট ভাবে ফুটে ওঠে। সরকারের গঠনমূলক সমালোচনার পাশাপাশি পুর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ আদায়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ পত্রিকা সংবাদ পরিবেশন করে।

১৯৭০ সালের নির্বাচন নিয়ে গণমাধ্যমে বিভিন্ন ভাবে সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে জেগে ওঠা ব্যাপক গণআন্দোলনের চাপে ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ আইয়ুব খান সাংবিধানিকভাবে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে তাঁর উত্তরসুরী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নিকট রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অপর্ণ করেন। জেনারেল ইয়াহিয়া খান একই কায়দায় ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ রাতে সমগ্র পাকিস্তানে পুনরায় সামরিক আইন জারি করেন এবং একই সঙ্গে সংবিধান বাতিল করে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। ৩১ মার্চ সামরিক আইনের এক ঘোষণায় প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক কর্তৃক জারিকৃত একের পর এক সামরিক বিধি সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়। এ সংক্রান্ত এক সামরিক বিধিতে ঘোষণা করা হয় যে, শাসন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও জনমনে উত্তেজনা সৃষ্টি এবং দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়, এমন কোনো সংবাদ পত্রপত্রিকায় প্রকাশ করা যাবে না। এরূপ প্রচেষ্টা করা হলে সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়।[১১] ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা গ্রহণ থেকে শুরু করে তাঁর প্রথম সাংবাদিক সম্মেলন, তাঁর গৃহীত বিভিন্ন সামরিক বিধি গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। প্রথম পাতায় বড় শিরোনামে এসব সংবাদ পরিবেশন করা হয়। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে গণমাধ্যমের ভূমিকা কয়েকটি বিষয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আলোচনা করা হলো-

আইনগত কাঠামো আদেশ

১৯৬৯ সালের ৮ এপ্রিল ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণা দেন। উক্ত ভাষণে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট প্রথা বাতিল এবং এক ব্যক্তি এক ভোট ভিত্তিতে জনসংখ্যার অনুপাতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা করেন। এছাড়া

[১১] *দৈনিক আজাদ*, ১ এপ্রিল ১৯৬৯

Dhaka University Institutional Repository

ফেডারেল সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠা, নব নির্বাচিত গণপরিষদে প্রথম বৈঠক থেকে ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান রচনা, গণপরিষদকে জাতীয় পরিষদে রূপান্তর এবং ১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে প্রকাশ্য রাজনীতি শুরু করার ঘোষণা দেন। একই সাথে তিনি বলেন ১৯৭০ সালের ৩০ মার্চ নির্বাচনের লক্ষ্যে আইনগত কাঠামো আদেশ ঘোষণা করবেন। আইনগত কাঠামো আদেশ ঘোষণার পূর্বে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান দেশের দু'অংশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রধানদের সাথে কয়েক দফা বৈঠক করে দেশের সমস্যার নিরসন সম্পর্কে তাদের মতামত গ্রহণ করেছেন। এ সংবাদও প্রতিটি গণমাধ্যম প্রচার করেছে। এসব আলোচনার ফলাফল কি হয়েছে তা প্রেসিডেন্ট সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে গণমাধ্যমের কাছে উপস্থাপন করেছেন। প্রেসিডেন্টের আইনগত কাঠামো সম্পর্কিত ঘোষণাও জাতীয় গণমাধ্যমে প্রচার করা হয় যাতে পাকিস্তানের জনগণসহ রাজনীতিবিদরা জানতে পারে প্রেসিডেন্ট তাঁর কথামত নির্ধারিত তারিখে আইনগত কাঠামো আদেশ ঘোষণা করেছেন। প্রেসিডেন্ট সবসময় তাঁর এ ধরনের দিকনির্দেশনা মূলক ঘোষণাগুলি প্রচারের জন্য জাতীয় গণমাধ্যমের সাহায্য নিয়েছেন। জাতীয় গণমাধ্যমে এ ঘোষণা দিয়ে প্রেসিডেন্ট একদিকে যেমন দেশবাসীর সামনে তাঁর অবস্থান পরিষ্কার করেছেন অন্যদিকে তিনি যে একটি সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন তা-ও তুলে ধরেছেন। ১৯৭০ সালের ৩০ মার্চ সে মোতাবেক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান রাওয়ালপিণ্ডিতে তাঁর আইনগত কাঠামো আদেশ ঘোষণা করেন। যা পরেরদিন প্রতিটি গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। একই সাথে গণমাধ্যমগুলি এ সংক্রান্ত সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করে। সকল মহলের রাজনীতিবিদরা প্রথম অবস্থায় এর বিরোধিতা করলেও পরবর্তীতে তারা আইনগত কাঠামো আদেশের অধীনে নির্বাচন করতে সম্মত হয়। আইনগত কাঠামো সম্পর্কিত সকল রাজনৈতিক দলের নেতাদের মন্তব্য গণমাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। ফলে জনগণ সহজেই জানতে পেরেছে ইয়াহিয়া খান সৃষ্ট এ নতুন ঘোষণাটি কোন রাজনৈতিক দল কিভাবে গ্রহণ করেছে। দৈনিক পত্রিকাগুলিও তাদের সম্পাদকীয় নিবন্ধে প্রেসিডেন্টের এই ঘোষণায় সন্তোষ প্রকাশ করে তাদের বক্তব্য তুলে ধরে। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় আইনগত কাঠামো আদেশের ব্যাপারে সন্তোষ প্রকাশ করে এর দু'য়েকটি ধারা সম্পর্কে মন্তব্য করে[১২]-

> ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান রচনার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে প্রেসিডেন্টের আশাবাদ ও নির্বাচনের উপযোগী শান্তিশৃঙ্খলাপুর্ণ পরিবেশ রক্ষার্থে তাহার দৃঢ় সঙ্কাল্পের পুনরাবৃত্তি অনেকের ন্যায় আমাদিগকেও আনন্দিত করিয়াছে। প্রেসিডেন্টের বক্তৃতার আরেকটি বিষয়–যাহা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে তাহা হইল ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে তাহার আগ্রহের পুনঃপ্রকাশ। তার সুদীর্ঘ বক্তৃতায় এই সুরটি আগাগোড়াই ছিল সুস্পষ্ট।

একইভাবে পরদিন দৈনিক আজাদ মন্তব্য করে[১৩]-

> প্রেসিডেন্ট জেনারেল মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান ২৮শে মার্চ তারিখের বেতার ভাষণে ও পরবর্তী আইনগত কাঠামোতে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের কয়েকটি নির্দেশনা ঘোষণা করেছেন। মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনসংখ্যা সহ জাতীয় পরিষদের মোট আসনসংখ্যা, পুর্ব পাকিস্তান এবং এক ইউনিট উত্তর পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের হিসসা প্রাদেশিক পরিষদসমূহের আসনসংখ্যা এবং প্রাদেশিক নির্বাচনের তারিখ প্রভৃতি বিষয় তার ভাষণে ঘোষিত হয়েছে। যেসব ন্যূনতম ব্যবস্থা ছাড়া প্রস্তাবিত জাতীয় পরিষদ গঠিত ও চালু হতে পারে না, তা যথাসময়ে ঘোষণা করার

[১২] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩১ মার্চ ১৯৭০
[১৩] *দৈনিক আজাদ*, ১ এপ্রিল ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিশ্রুতি প্রেসিডেন্ট তার ২৮শে নভেম্বর তারিখের ভাষণে উল্লেখ করেছিলেন। এ ঘোষণার মধ্য দিয়ে প্রেসিডেন্ট তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। আইনগত কাঠামো পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র দলিলের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। ভবিষ্যৎতের শাসনতন্ত্র এর আলোকে রচনা করা হবে।

আইনগত কাঠামো আদেশ ঘোষণার পর ধর্মভিত্তিক দল জামায়াতে ইসলামি সমর্থক পত্রিকাও এ সম্পর্কে ইতিবাচক মন্তব্য করে যে[১৪]- প্রেসিডেন্ট তার বেতার ভাষণে শাসনতন্ত্রের পাঁচটি আইনগত কাঠামো ঘোষণা করা ছাড়াও জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং দেশে সুস্থ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার দৃঢ় মনোভাব প্রকাশ করেছেন। গণতান্ত্রিক অধিকার বঞ্চিত এদেশের মানুষের কাছে তার এ ঘোষণা তাই স্বাভাবিকভাবেই অভিনন্দন লাভ করেছে।

একই ভাবে পাকিস্তানের জনগণের সমর্থক পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকায় আইনগত কাঠামো আদেশের দুটি দিক সম্পর্কে মন্তব্য করে[১৫]–

> The President's broadcast made two other important points. The votting procedure will have to be determined by the Constituent Assembly, let us hope, its very first session. We have always maintained that constitution make in should not be treated as mere ordinary legislation which a can be extremely controversial and carried by a brute majority, but should be one based on a general consensus so that it is broadly acceptable to all sections of the people and to all territories... The other point is about the election to provincial legislatures. This is an indication both of the regimes eagerness to transfer power to duly constituted popular government at the earliest possible moment.

সরকার সমর্থক দৈনিক দি ডন পত্রিকা সবসময় তাদের প্রকাশনার ক্ষেত্রে সরকারি সংবাদকে প্রাধান্য দিত। ভাল মন্দ যাই হোক না কেন তারা সরকারের সকল কাজ ইতিবাচক ভাবে দেখত যা তাদের সংবাদসমূহে পরিলক্ষিত হয়। তেমনি এ পত্রিকাটি আইনগত কাঠামো আদেশ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রেসিডেন্টের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে[১৬]-

> President A M Yahya Khan's November 28 plan for a smooth transition to representative rule has take final shape with the promulgation of the Legal Framework Order, 1970. The country now knows precisely show it is going to set about the task of providing itself with a constitution and of restoring democratic government…

নির্বাচনের তারিখ

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান প্রথম জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর জাতীয় পরিষদের ও ২২ অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদের। কিন্তু আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ববাংলার কোনো কোনো অঞ্চলে ব্যাপক বন্যা হওয়ায় বাম ও ডানপন্থী দলগুলি নির্বাচন পিছানোর দাবি তুলে। তারা এক্ষেত্রে যতটা না ভোট দানে বিঘ্ন হওয়ার কথা বলতে থাকে তার চেয়ে বেশি ছিল নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল করা। কারণ তারা মনে করেছিল যদি নির্বাচন পিছানো যায় তবে তারা নিজেদের প্রচারণা কার্যক্রম আরো বেশি জোরদার করতে পারবে এবং নিজেদের জয় নিশ্চিত করতে পারবে।

[১৪] *দৈনিক সংগ্রাম*, ১ এপ্রিল ১৯৭০
[১৫] *দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার*, ৩১ মার্চ ১৯৭০
[১৬] *দৈনিক দি ডন*, ৩১ মার্চ ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

শেষ পর্যন্ত তাদের দাবি ও ভোটদানের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান নির্বাচনের নতুন তারিখ ঘোষণা করেন। তাই তখন নির্বাচন পিছিয়ে দেয়ায় দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার মন্তব্য করে[১৭]-

> In such an event even of the election on October 5 is held, a substantial number of the voters may not be able to turn up at the polling booths and exercise their right of franchise. Usually some 80 to 85 percent of the voters cast their votes. If 40 or 50 prercent of these 80 percent voters cannot participate in this election, then the elected candidates will represent only a small part of the adult voting population and their representative character will be rather fragile. Since these members will be charged with the framing of the most important documement for the nation, namely, the constitution, they should be chosed by, and get the mandate from, the largest number, if not all, of the electors. Viewed from this angle, October 5 may not seem to be quite suitable for the election.

নির্বাচনী সংবাদ প্রচার ও প্রকাশে যখন গণমাধ্যমগুলি ব্যস্ত সময় পার করছে তখন ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর বাংলার উপকূল অঞ্চলে আঘাত হানে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস। এ প্রেক্ষাপটে তখন আবার সর্বত্র দাবি ওঠে নির্বাচন পিছানোর। কিন্তু এ সময় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব এর বিরোধীতা করে কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করেন। যার ফলে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পূর্বের তারিখ বহাল রেখে শুধুমাত্র দুর্গত এলাকার জন্য নতুন তারিখ ঘোষণা করেন। নির্বাচন পিছানোর ব্যাপারে আওয়ামী লীগের এ ধরণের ভূমিকা সম্পর্কে বামপন্থী দলগুলির সমর্থক দৈনিক সংবাদ সমালোচনামূলক মন্তব্য করে[১৮]-

> নির্ধারিত তারিখেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। দুর্গত এলাকার নির্বাচন স্থগিত রাখার প্রশ্নটি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন কমিশনের উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন। নির্বাচন কমিশন দুর্গত এলাকার নয়টি জাতীয় পরিষদ আসন ও আঠারটি প্রাদেশিক পরিষদ আসনের নির্বাচন আপাতত স্থগিত ঘোষণা করিয়াছেন। ইহার ফলে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে দশ লক্ষ লাশের উপর দাঁড়াইয়া এবং খণ্ড খণ্ড ভাবে। দুর্গত এলাকায় নির্বাচন স্থগিত রাখার ফলে দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন সারাদেশে একযোগে অনুষ্ঠিত হইতে পারিতেছে না। স্বাধীনতার তেইশ বৎসর পর অনুষ্ঠিতব্য দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন এই অস্বাভাবিক পরিবেশে এবং খণ্ড খণ্ড ভাবে অনুষ্ঠিত হউক ইহা কাহারও কাম্য হইতে পারে না। দুর্গত এলাকাগুলিতে সরকারের ইচ্ছা থাকলেও এখন নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব নয়। কাজেই আমরা সারা দেশে নির্বাচন কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখার দাবী জানাইয়াছিলাম। একমাত্র আওয়ামী লীগ ছাড়া অপরাপর সকল দলের নেতৃবৃন্দ এই দাবী উত্থাপন করিয়াছিলেন।. . .

আওয়ামী লীগের নির্বাচন নিয়ে বেশি মাত্রায় আগ্রহী হওয়ায় দৈনিক সংবাদ আওয়ামী লীগের সমালোচনা করে মন্তব্য করে[১৯]–

> বাঙালী দরদের সোল এজেন্সীর দাবীদার আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যেই নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য জেদ ধরে। ইহার অর্থ দেশের মানুষ মরুক আর আর বাঁচুক নির্বাচন ও গদি লাভের জন্য তাহারা এক মুহূর্ত বিলম্ব বা অপেক্ষা করিতে রাজী নয়। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের এই গণবিরোধী ভূমিকার দরুনই শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে এইরূপ অস্বাভাবিক অবস্থায় খণ্ডিত নির্বাচনের সিদ্ধান্ত চাপাইয়া দেওয়া সম্ভব হইয়াছে। ...

[১৭] *দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার*, ১ এপ্রিল ১৯৭০
[১৮] *দৈনিক সংবাদ*, ২৯ নভেম্বর ১৯৭০
[১৯] *ঐ*, ৩ ডিসেম্বর ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনী আচরণবিধি

দেশব্যাপী যখন নির্বাচনী কর্মতৎপরতা শুরু হয় তখন প্রতিটি রাজনৈতিক দল তাদের নির্বাচনী ইশতাহার জনগণের সামনে প্রচারের পাশাপাশি ব্যাপক হারে সভা সমাবেশ করতে থাকে। এসব সভা সমাবেশে দেখা যায় এক দল অপর দলকে আক্রমণ করে কটুক্তি করে। ফলে নির্বাচনী ময়দানে উত্তেজনামূলক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তাই প্রধান নির্বাচন কমিশনার সকল রাজনৈতিক দলের প্রধানদের নিয়ে বৈঠক করে নির্বাচনী আচরণ বিধি প্রণয়ন করে। নির্বাচনী আচরণ বিধি প্রণয়ন করার পর এ সম্পর্কে দৈনিক পাকিস্তানে মন্তব্য করে[২০]-

> জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত বেতার ও টেলিভিশন ভাষণে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান দেশবাসীর প্রতি আমাদের ইতিহাসের এই ক্রান্তিলগ্নে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের তাৎপর্য উপলব্ধি করার এবং সতর্কতা ও প্রজ্ঞার সঙ্গে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করার আহবান জানাইয়াছেন। ... এই সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই গণতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব। ... শান্তিপূর্ণভাবে যাহাতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে পারে, সেদিকে সকলেরই সজাগ দৃষ্টি রাখা একান্ত জরুরী।... যে কোনো অবাঞ্চিত ঘটনা প্রতিরোধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকেই প্রস্তুত থাকিতে হইবে। নির্বাচনকালে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার কাজে সাহায্য করার জন্য ইতিমধ্যেই সশস্ত্র বাহিনী নিযুক্ত করা হইয়াছে।... নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হউক, ইহা যদি দেশবাসী আন্তরিকভাবে কামনা করেন, তবে রাজনৈতিক নেতা, কর্মী ও জনসাধারণের আইনের সীমা লংঘন করা অনুচিত। নির্বাচনী আচরণ বিধি সংশ্লিষ্ট সকলকে অবশ্যই মান্য করিতে হইবে।... প্রেসিডেন্ট বলেন, কোনো ব্যক্তি বা কোনো এক দলের লোকের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর এই নির্বাচনের লক্ষ্য নয়, পাকিস্তানের সকল মানুষের প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরই এই নির্বাচনের উদ্দেশ্য।. . .এজন্যই প্রেসিডেন্ট সতর্কতা ও প্রজ্ঞার সঙ্গে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহবান জানাইয়াছেন।...

প্রচারণা কার্যক্রম

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তাঁর ঘোষণামত ১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে রাজনৈতিক তৎপরতার উপর পূর্বের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন। এর ফলে সকল দল তাদের নির্বাচনী প্রচারণা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ১৯৭০ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ময়দান পূর্ণমাত্রায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। নির্বাচন উপলক্ষে ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের সকল রাজনৈতিক দলের প্রধানদের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম বেতার টেলিভিশনে তাদের কর্মকাণ্ড জনগণের সামনে তুলে ধরার সুযোগ করে দেয়। এসব ভাষণ প্রতিদিন রাষ্ট্রীয় বেতার টেলিভিশনে প্রচারের পাশাপাশি পরেরদিন দৈনিক সংবাদপত্রেও পূর্ণ বিবরণী আকারে প্রকাশ করা হয়। এ সিরিজ বক্তৃতা শুরু হয় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের মধ্য দিয়ে। জনগণ ইয়াহিয়া খানের এ নতুন উদ্যোগকে স্বাগত জানায়। এছাড়া দলীয় প্রচারণার অংশ হিসেবে সকল রাজনৈতিক দল সভা সমাবেশ, পোস্টার, লিফলেট এর আশ্রয় নেয়। এসব প্রচারণার কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন স্থানে এক দলের সাথে অন্য দলের সংঘর্ষ হয়েছে, অন্য দলের প্রতি কটুক্তি, বিষোদগার করা হয়েছে। যা সকল গণতান্ত্রিক দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনের চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য। এরূপ কর্মকাণ্ডের ফলে রাজনৈতিক মাঠে সাময়িক উত্তেজনা, কোলাহল সৃষ্টি হয়েছে। আবার এ উত্তেজনা কখনও সংঘর্ষে রূপ নিয়েছে। তাই তখন প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার দেশে সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে সকলের প্রতি শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার প্রতি আহবান জানিয়েছেন। একই সাথে দেখা যায় কোনো কোনো

[২০] *দৈনিক পাকিস্তান*, ৫ ডিসেম্বর ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক দলও নির্বাচনকালীন শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহবান জানিয়েছে। বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের বৃহৎ রাজনৈতিক দল মিরপুরের নির্বাচনকালীন সংঘর্ষের পর দেশবাসী ও আওয়ামী লীগের কর্মীদের প্রতি শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার আহবান জানিয়েছে। যা তাদের বিভিন্ন বক্তৃতা, বিবৃতির আকারে গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামি সমর্থক পত্রিকা এরূপ কার্যকলাপের জন্য একতরফা ভাবে আওয়ামী লীগকে দায়ী করে সমালোচনামূলক বক্তব্য দেয়[২১]-

> নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসছে, দেশের শান্তিশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ততই অবনতি ঘটছে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় প্রত্যেক দলের প্রতিটি নেতাই সুক্ষ্ম নির্বাচনের জন্য শান্তিপূর্ণ পরিবেশের পক্ষপাতী। এমনকি বহু অঘটনের হোতা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের মুখ থেকেও নির্বাচনের জন্য শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার আহবান ধ্বনিত হতে শোনা যাচ্ছে।...দলীয় প্রধান থেকে শুরু করে আওয়ামী লীগের প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের অনেকের মুখে শান্তির এ বাণী শোনা যাচ্ছে। কিন্তু শান্তি শৃঙ্খলা পরিস্থিতিতির উন্নতি না হয়ে ক্রমে তার অবনতিই ঘটছে।... আওয়ামী লীগ নেতাদের শান্তির ললিত বাণী মানুষের মন থেকে মুছে যাবার আগেই জামায়াতের শান্তিপূর্ণ মিছিলে তাদের নগ্ন হামলার সংবাদ তাদেরকে শুনতে হলো। মনে হয় এটা এ জন্য হতে পেরেছে যে, আওয়ামী লীগ হিংস্র কর্মপন্থার অনুসরণ করে তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের কণ্ঠ রুদ্ধ করে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

দেশের বিভিন্ন স্থানে এমন ছোটখাট ঘটনাও প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দৃষ্টি এড়ায় নি। তারা এ ধরনের ঘটনাগুলিকে গুরুত্বের সাথে নেয়। তাদের কাছে মনে হয়েছে এ ধরনের ঘটনার যদি পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে তাহলে তা সুষ্ঠু ভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানকে বাধাগ্রস্থ করবে। তাই নির্বাচনের পূর্বে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে নির্বাচনকালীন শান্তি শৃঙ্খলা ও নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেন। এ সম্পর্কে দৈনিক দি ডন মন্তব্য করে[২২]–

> ...Regarding the polls due early next week, there is in his pronouncement a remarkable ring of sincerity that has by now become his hallmark. He has admirably brought out their ture import and significance in the concluding sentences of his speech to observe that "these elections are a step towards democracy and tolerance is one of the basic requirements of the democratic way of life."

নির্বাচনের গুরুত্ব

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন পাকিস্তানের রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তাই স্বাভাবিকভাবে এ নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম। পাকিস্তানের সকল স্তরের জনগণের মতো গণমাধ্যমগুলিও এ নির্বাচনের উপর গুরুত্বারোপ করে সংবাদ পরিবেশন ও তাদের মন্তব্য প্রকাশ করে। জাতীয় জীবনে এ নির্বাচনের গুরুত্ব সম্পর্কে দৈনিক পাকিস্তান মন্তব্য করে[২৩]-

> সন্দেহ আর সংশয়ের নিরসন ঘটিয়াছে। অবসান হইয়াছে উদ্বেগ আকূল প্রতীক্ষার। পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে একটি পরম উজ্জল দিন। দেশের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকরা আজ ভোট কেন্দ্রে যাইয়া নিজেদের বিবেক ও বুদ্ধি অনুযায়ী জাতীয় পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করিবেন। ... দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের গুরুত্ব প্রতিটি ভোটদাতা, প্রতিটি প্রার্থীর নিকটই পরিষ্কার বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এই

[২১] *দৈনিক সংগ্রাম*, ১০ নভেম্বর ১৯৭০
[২২] *দৈনিক দি ডন*, ৫ ডিসেম্বর ১৯৭০
[২৩] *দৈনিক পাকিস্তান*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনে যাহারা বিজয়ী হইবেন তাহাদের উপর ন্যস্ত হইবে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন আর রাষ্ট্র পরিচালনার বিশাল দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনে তাহারা সাফল্য লাভ করুন, ইহাই আমরা আন্তরিকভাবে কামনা করি।

নির্বাচনের ফলাফল

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের ও ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন সারাদেশে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। পরবর্তীতে ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি দুর্গত অঞ্চলগুলিতেও সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন নিয়ে গণমাধ্যমগুলির ব্যাপক আগ্রহ থাকায় নির্বাচনের আগে থেকেই দেশি বিদেশি সকল গণমাধ্যমে এর ফলাফল নিয়ে জল্পনা কল্পনা শুরু হয়। সবার প্রশ্ন কে বা কারা হবে বিজয়ী। অনেক গণমাধ্যম এ সম্পর্কে আগাম ভবিষ্যৎবাণীও করে। কিন্তু তাদের এ ভবিষ্যৎবাণী বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয় নির্বাচন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত। তাই নির্বাচন শেষ হওয়া মাত্র গণমাধ্যমগুলি দেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ শুরু হয়ে যায়। যার প্রতিফলন ঘটে প্রতিটি গণমাধ্যমের সংবাদে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আওয়ামী লীগ ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ভুট্টোর পিপলস পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আর্বিভূত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে পূর্ব পাকিস্তানের গণমাধ্যমগুলিতে আওয়ামী লীগের বিজয়ের সংবাদ বেশি প্রচার হয়। নির্বাচন শেষ হওয়ার পরদিন জাতীয় দৈনিকগুলিতে নির্বাচনের ফলাফল অর্থাৎ আওয়ামী লীগের বিজয় নিয়ে সম্পাদকীয় নিবন্ধে বিভিন্ন শিরোনামে মন্তব্য করা হয়। নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ হওয়ার পর দৈনিক ইত্তেফাক আওয়ামী লীগের বিজয়কে অভিনন্দন জানিয়ে মন্তব্য করে[২৪]-

> ...গণতন্ত্রের দুশমন ও ধর্ম ব্যবসায়ীদের সকল ষড়যন্ত্রজাল ছিন্নভিন্ন। ... ব্যক্তি ভুল করিতে পারেন, কিন্তু জনতার সামগ্রিক রায় ভুল হইতে পারে না। বাংলার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত কোটি কোটি মানুষ যে অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন এবং ছয়দফা ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকারের স্বপক্ষে কার্যত: সর্বসম্মত রায় দিয়াছেন সেজন্য ব্যাগ্রত বাংলার তুলনাহীন গণসচেতনাকে অভিনন্দন। আর অভিনন্দন সেই সংগ্রামী দল, দলপতি ও লাখো নির্যাতিত কর্মীকে– যাহাদের ত্যাগ, সংগ্রাম সাধনা ও রক্তদান বাংলার মানুষকে এই ঐতিহাসিক বিজয় তোরণে পৌছাইয়া দিয়াছে। ... নির্বাচনে বাংলার জনমতের জয় হইয়াছে। কিন্তু এই জয়ই শেষ কথা নয়। ইহাকে স্থায়ী, স্থিতিশীল ও ফলপ্রসু করাই বড় কথা।...

এ নির্বাচনের ফলাফলে স্বাধিকারের প্রতিফলন ঘটেছে এমন মন্তব্য করে ইত্তেফাকে বলা হয়[২৫]- ... নির্বাচনী ফলাফল সম্পর্কিত এই সংবাদের ভিতর দিয়া স্বাধিকারের সপক্ষে জনসাধারণের অভ্রান্ত ও সুস্পষ্ট রায়ই প্রতিফলিত হইয়াছে।

জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের ফলাফলের পাশাপাশি প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনকেও গুরুত্ব দিয়ে এর ফলাফল সম্পর্কে ইত্তেফাক উল্লেখ করে[২৬]

> ... প্রাদেশিক পরিষদসমুহের নির্বাচনও ৭ই ডিসেম্বরের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের ন্যায়ই নির্বিঘ্নে শান্তি শৃঙ্খলার সঙ্গে সম্পন্ন হইয়াছে। নির্বাচনের ফলাফলের ধারাও দেখা যাইতেছে, পূর্ববৎ। অঞ্চল ও প্রদেশ নির্বিশেষে আমাদের জনগণ আবার প্রমাণ করিয়াছে যে, পাকিস্তানী জাতি গণতন্ত্রের উপযুক্ত নয় বলিয়া যে ইলজাম লাগানো হইয়াছিল, তাহা সর্বৈব মিথ্যা, অবাস্তব ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।...

একই নিবন্ধে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকার প্রশংসা করে বলা হয়[২৭]–

---

[২৪] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৭০
[২৫] *ঐ*, ৯ ডিসেম্বর ১৯৭০
[২৬] *ঐ*, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭০
[২৭] *ঐ*

Dhaka University Institutional Repository

> ... প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত দেশব্যাপী এই প্রথম সাধারণ নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও দুর্নীতিমুক্তভাবে সম্পন্ন করার ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ও অবদান স্মরণযোগ্য বিষয় হইয়া থাকিবে।

নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে হওয়া সত্ত্বেও কোনো কোনো রাজনৈতিক দল নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিশৃঙ্খলাপূর্ণভাবে হয়নি বলে দাবি করে। তাদের এ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করে পাকিস্তানপন্থী গণমাধ্যম দৈনিক পাকিস্তান মন্তব্য করে যে[২৮]-

> গতকাল সারা দেশে শান্তি ও শৃংখলার মধ্যে এই প্রথমবারের মতো প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জাতীয় পরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন হইয়াছে। কোনো কোনো স্থানে উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে সত্য কিন্তু উহা প্রায় অনুল্লেখ্য। প্রকৃতপক্ষে খুব কম দেশেই এমন শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন সম্পন্ন হইয়া থাকে। ... এই যে সমগ্র দেশে সুষ্ঠুভাবে সাধারণ নির্বাচন সম্পন্ন হইতে পারিল, এজন্য জনসাধারণের অসামান্য রাজনৈতিক চেতনাই মূলত দায়ী। ... প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে ভোটারগণ সমবেত হইয়াছেন, সজাগ দৃষ্টি রাখিয়াছেন যাহাতে কিছুতেই শান্তি ও শৃংখলা ক্ষুন্ন না হয়।... নিয়মিত সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই গণতন্ত্রের সুষ্ঠু বিকাশ সম্ভব।

নির্বাচনের অভাবিত ফলাফল যেমন সকলকে বিস্মিত করেছে তেমনি গণমাধ্যমও বিস্মিত হয়েছে। তাই এ সম্পর্কে দৈনিক পাকিস্তান সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে[২৯]–

> ... দেশের পূর্বাঞ্চলে আওয়ামী লীগ এবং পশ্চিমাঞ্চলে পিপলস পার্টি স্ব স্ব জনপ্রিয়তার প্রমাণ সুস্পষ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। দেশের বাকি রাজনৈতিক দলগুলি জাতীয় পরিষদে পাইয়াছে নামমাত্র প্রতিনিধিত্ব। কোন কোন দলের আবার কেউই জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত হইতে পারেন নাই। এবারকার সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও পিপলস পার্টি যথাক্রমে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানে যে বিরাট সাফল্য অর্জন করিবে উহার আভাস এই দুইটি দলের জন্য বিপুল জনসমর্থনের মধ্য দিয়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এই বিজয়ের ব্যাপকতা বুঝি সমর্থকদেরও হিসেবের বাহিরে ছিল। পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগের বিজয় অভিযানের সামনে কোন দলই দাড়াইতে পারে নাই–প্রায় প্রতিটি কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা নির্বাচিত হইয়াছেন বিপুল ভোটের ব্যবধানে।... পশ্চিম পাকিস্তানে পিপলস পার্টিকে তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। আওয়ামী লীগের তুলনায় এই দল লাভ করিয়াছে কম সংখ্যক আসন কিন্তু জনাব জুলফিকার আলী ভুট্রো সিন্ধু ও পাঞ্জাবের পাঁচটি আসনে এক সঙ্গে বিজয়ী হইয়া জনপ্রিয়তার নতুন রেকর্ড স্থাপন করিয়াছেন। জাতীয় পরিষদের নির্বাচনী ফলাফল বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, ব্যালটের মাধ্যমে পাকিস্তানের জনসাধারণ এবার প্রাসাদকেন্দ্রিক প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির বিরুদ্ধে নিজেদের নিঃসংশয় রায় ঘোষণা করিয়াছেন। ...

নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগের একচেটিয়া বিজয় সম্পর্কে দৈনিক সংবাদের সম্পাদকীয়তে বলা হয়[৩০]–

> সার্বজনীন ভোটাধিকার ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। জাতির জন্য ইহা শ্লাঘার বস্তু। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ বিপুল ভাবে জয়লাভ করিয়াছে। পশ্চিম পাকিস্তানে পাঞ্জাবে ও সিন্ধুতে পিপলস পার্টি জয়লাভ করিয়াছে এবং জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের পক্ষে স্থান লাভ করিয়াছে।... সারা পাকিস্তান ভিত্তিক আওয়ামী লীগ এবং পিপলস পার্টি সংযুক্ত ভাবে বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিয়াছে। এই ধরনের বিজয় বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে বিরল।

জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের পর সকল মহলের ধারণা ছিল প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল একই হবে। নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পর দেখা যায় ফলাফল আবারও আওয়ামী লীগের প্রতি জনগণ তাদের রায় দিয়েছে। তাই এ বিজয়কে

---

[২৮] *দৈনিক পাকিস্তান*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৭০
[২৯] *ঐ*, ৯ ডিসেম্বর ১৯৭০
[৩০] *দৈনিক সংবাদ*, ৯ ডিসেম্বর ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

সবাই এদেশের জনগণের দীর্ঘ বঞ্চনার ইতিহাসে একটি সুস্পষ্ট সঠিক রায় হিসেবে মন্তব্য করেছে। প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কেও মন্তব্য করতে গিয়ে দৈনিক সংবাদে বলা হয়[৩১]–

> ... আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় প্রমাণ করে যে, দেশবাসী তাহাদের উপর বিপুল আস্থা স্থাপন করিয়াছেন, কাজেই এই আস্থার মর্যাদা রক্ষার দায়িত্বও তাহাদের উপর বর্তাইয়াছে। প্রায় বিরোধীদল শূণ্য পরিষদে এই দায়িত্ব আরও কঠিন। অতীতের মুসলিম লীগ সরকার বিরোধী দল শূণ্য পরিষদে স্বেচ্ছাচারিতার উদাহরণ স্থাপন করিয়াছিল। ভবিষ্যতে উহার পুনরাবৃত্তি না ঘটুক ইহাই দেশবাসীর কামনা।

দেশব্যাপী জাতীয় পরিষদের নির্বাচন হওয়ার পর যখন সকলের কাছে আওয়ামী লীগের বিপুল জয় নিয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি তখন এ ফলাফল বিশ্লেষণ করে দৈনিক আজাদ মন্তব্য করে[৩২]-

> পাকিস্তানের এই ঐতিহাসিক নির্বাচনে দুইটি লক্ষযোগ্য বিষয় হইতেছে যে, বিপুল সংখ্যক ভোটদাতা তাহাদের ভোট দান ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়াছেন এবং দ্বিতীয়ত সাধারণ ভাবে শান্তি ও শৃংখলার মাঝে নির্বাচন কার্য সম্পন্ন হইয়াছে। নির্বাচন দেশে গণতান্ত্রিক যুগের প্রত্যাবর্তনের প্রথম, সুনির্দিষ্ট ও অবিচল পদক্ষেপ। নির্বাচনে বিপুল সংখ্যক লোকের অংশগ্রহণ এবং শান্তি ও শৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবেশে ইহা সম্পন্ন হওয়ার ফলে পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হইতেছে যে, গণতন্ত্রের জন্য এ দেশের জনসাধারণ গভীর আগ্রহ পোষণ করিতেছেন।...

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর দেখা যায় দু'অঞ্চলে দুটি রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ায় কোনো রাজনৈতিক দল একক দল হিসেবে বেরিয়ে আসতে পারেনি। কোনো দলই আঞ্চলিক মর্যাদার বাইরে আসতে পারেনি। এ নিয়ে জনমনেও নানা প্রশ্ন দেখা দেয়। আঞ্চলিক দল হিসেবে দুটি দলের পরিচয় নির্ধারিত হওয়ায় দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র কিরূপে হবে তা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দেয়। এমন পরিস্থিতিতে দৈনিক পূর্বদেশ প্রকাশ করে[৩৩]–

> ... এই অঞ্চলভিত্তিক নির্বাচনী রায় পাকিস্তানকে দুটি রাজনৈতিক অঞ্চলে বিভক্ত করে দিয়েছে। বিশ্বের ইতিহাসে আওয়ামী লীগের সাফল্য নজীর বিহীন। কেবলমাত্র একনায়কত্ববাদী, এক দলীয় শাসন ব্যবস্থার অধীন দেশ ছাড়া একাধিক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বসম্পন্ন গণতান্ত্রিক দেশে এমন ঘটনা ইতপূর্বে আর ঘটেনি। কাজেই এই দলের ওপরে নতুনতর এবং আর গুরুতর দায়িত্ব বর্তেছে।...

জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ফলে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের পূর্বে অনেক রাজনৈতিত দল তাদের আসন্ন পরাজয় নিশ্চিত জেনে নির্বাচনী মাঠ থেকে বিদায় নিচ্ছে তখন তাদের সম্পর্কে দৈনিক পূর্বদেশ মন্তব্য করে[৩৪]–

> ... যেসব দল নির্বাচনে নিশ্চিহ্ন হয়েছে তারাও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে পরিপূর্ণভাবে উদ্যোগী হওয়ার জন্যে কোমরে বল পাচ্ছে না। এই অবস্থায় প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ছাড়া দলীয় ভিত্তিতে কার্যত ওয়ালী ন্যাপ এবং জামাতে ইসলামই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। পিডিপি, কাউন্সিল লীগ এবং কনভেনশন লীগ দলীয় ভিত্তিতে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচন থেকে সরে না দাড়ালেও এসব দলের নির্বাচন প্রার্থীরা অনেকেই ইতিমধ্যে নির্বাচনী অঙ্গন থেকে সরে পড়েছেন। ... এদিকে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যেও নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে পড়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে।... এই কারণে বর্তমানে নির্বাচন থেকে কেবল সরে দাড়ানো হিড়িকই পড়েনি যারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তাদেরও মনোবল অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে। এদিকে আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা জয় সম্পর্কে মনস্তাত্ত্বিকভাবে অনেকটা নিশ্চিত বোধ করছেন। তাই প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে উৎসাহ উদ্দীপনা, প্রাণচাঞ্চল্য ও উত্তেজনার অভাবের মূল এই মনস্তাত্ত্বিক পরিস্থিতিই অন্যতম প্রধান কারণ। এছাড়া প্রাদেশিক পরিষদের

[৩১] *দৈনিক সংবাদ*, ২০ ডিসেম্বর ১৯৭০
[৩২] *দৈনিক আজাদ*, ৯ ডিসেম্বর ১৯৭০
[৩৩] *দৈনিক পূর্বদেশ*, ১০ ডিসেম্বর ১৯৭০
[৩৪] *ঐ*, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

> নির্বাচনে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া না পড়ার উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে যে, কোন রাজনৈতিক দলই তাদের ম্যানিফেষ্টোতে নির্বাচকদের সামনে এই নির্বাচনের গুরুত্ব তুলে ধরেনি। ...

জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন শেষ হওয়ার পর যখন বিভিন্ন মহল থেকে নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে হয়নি বলে যে দাবি ওঠে এর প্রত্যুত্তরে দৈনিক পূর্বদেশ পত্রিকা মন্তব্য করে[৩৫]–

> ... জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের পর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন শেষ হওয়ার মধ্য দিয়ে জাতির গণতন্ত্রে উত্তরণের প্রথম পর্ব সমাপ্ত হলো বলা যায়।... নির্বাচন সম্পর্কে কিছু কিছু দুর্নীতির অভিযোগ উঠলে বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে শান্তি ও শৃঙ্খলার মধ্যে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে তা অস্বীকারের উপায় নেই। দেশব্যাপী নির্বাচনের মতো এমন একটি ব্যাপক ও উত্তেজনাময় কাজে ছোট খাটো কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটা অস্বাভাবিক নয়। জাল ভোট কিংবা কোনো নির্বাচনী কেন্দ্রে ছোট খাটো অনিয়মের ফলে কোনো অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটানোর মতো দু'একটি নজিরও থাকতে পারে। কিন্তু দেশ জুড়ে নির্বাচনের ব্যাপকতার তুলনায় দু'একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বেশী কিছু নয়। সবকিছু মিলে সারা দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সাফল্য থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তেইশ বছরের স্বাধীনতাউত্তর জীবনে এই প্রথম দেশব্যাপী শান্তি ও শৃংখলার মধ্যে সুষ্ঠু সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। এবারের সাধারণ নির্বাচন নিয়ে জনমনে সন্দেহ, অবিশ্বাস ও শংকার ভাব নিতান্ত কম ছিলো না। তার প্রথম কারণ দেশে তেইশ বছরে ব্যাপকভিত্তিক কোনো সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। এ জন্যেই নির্বাচনের অতীত অভিজ্ঞতা না থাকায় সফল নির্বাচন অনুষ্ঠান নিয়ে যেমন নানারূপ সংশয় ছিলো, তেমনি অতীতের চক্রান্ত ও ব্যর্থতার কথা স্মরণ করে আদৌ নির্বাচন অনুষ্ঠান হবে কিনা তা নিয়েও সন্দেহের ভাব বিদ্যমান ছিলো। বলাবাহুল্য, জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সফল নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সেই সংশয় ও সন্দেহের অবসান ঘটেছে।

সকল মহল, সকল সরকারি, বিভিন্ন দলের সমর্থক গণমাধ্যম যখন দাবি করে যে নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে তখন এ নির্বাচন নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে জামায়াতে ইসলামি। তাই তাদের সমর্থিত গণমাধ্যম দৈনিক সংগ্রামে এ সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশ করে[৩৬]–

> গত ৭ই ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদ সদস্য নির্বাচনে নানাবিধ দুর্নীতির অভিযোগ ক্রমাগত আসছে। আমরা নির্বাচনের ফলাফলকে সরল বিশ্বাসে জনতার রায় হিসেবেই মেনে নিয়েছিলাম কিন্তু বিভিন্ন মহল ও রাজনৈতিক নেতা যে সব দুর্নীতির প্রেক্ষিতে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনকে নানাভাবে আখ্যায়িত করেছেন। নিখিল পাকিস্তান নেজামে ইসলাম নেতা জনাব মওলানা সিদ্দিক আহমদের মতে দুর্নীতির মোকাবেলায় ইসলামপন্থীরা হেরেছেন।...প্রাদেশিক জামায়াতে ইসলামী প্রধান অধ্যাপক গোলাম আযম নির্বাচন সমাপ্তির পরেই নেতাদের ফলাফল ঘোষণার পূর্বে এসব দুর্নীতির বিষয় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করেছেন। এসব অভিযোগের প্রেক্ষিতে নির্বাচনে দুর্নীতির বিষয়টি আজ ধামাচাপা দেয়ার উর্ধ্বে। এটা সকলকে একবাক্যে স্বীকার করতেই হবে। সরকার বার বার একথা ঘোষণা করেছিলেন যে, নির্বাচন যাতে স্বাধীন, নিরপেক্ষ এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে হতে পারে সে জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে।... সম্ভবত এ কারণেই নির্বাচনে দুর্নীতি সম্পর্কে যারা অসংখ্য অভিযোগ আনয়ন করেছেন, তারাও নির্বাচনের ফলাফলকে মেনে নিয়েই এসব অভিযোগ এনেছেন যাতে ভবিষ্যতে এসবের পুনরাবৃত্তি না ঘটে।...অনেক মৌলিক গণতন্ত্রীর ভাষায় এ নির্বাচনে দুর্নীতি আইয়ুবী আমলে দুর্নীতিকেও হার মানিয়েছে।...

সরকার সমর্থিত গণমাধ্যম দৈনিক দি ডন জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগের বিজয়, নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সকল মহলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ইতিবাচক মন্তব্য করে[৩৭]–

> The way in which Monday's General Election was conducted has been one of the best things that has ever happened to this country. The people will rejoice to in the fact that everything went off smoothly and in the manner it was meant to do. The polling took place in a tranquil, disciplined and relaxed atmosphere, and

[৩৫] *দৈনিক পূর্বদেশ*, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭০
[৩৬] *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭০
[৩৭] *দৈনিক দি ডন*, ৯ ডিসেম্বর ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

> brings a few incidents here and there, perfectly peaceful conditions prevailed. For popular consultation involving tens of millions of voters, many many of whom gave their votes for the first time in their lives, the conduct of the general election could it be easily considered exemplary in almost any country in the world…The December 7 Election becomes the exemplar for the future....

একইভাবে জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের পরে পাকিস্তান অবজারভার শেখ মুজিব ও ভুট্টোর প্রশংসা ও তাদের নির্বাচনী কর্মতৎপরতার ওপর মূল্যায়ন করতে গিয়ে মন্তব্য করে[৩৮]–

> It is now obvious that the Awami League has swept the polls in East Pakistan and, although the gains made by the Pakistan People's Party in West Pakistan have not been as a spectacular, they have been hardly less dramatic owing to all the forecasts made previously by West Pakistan observers that Mr. Bhutto's pull with actual electorate has no correspondence to his appeal to teenagers, that is, the non-voting groups. Both Sheikh Mujibur Rahman's and Mr. Bhutto's appeal was to youth and obviously youth a has asserted itself in the polls and has demolished the old political vanguard… Sheikh Mujibur Rahman has said that he will consider the verdict has received as the decision by East Pakistan for the "6 Points" and if they are not acceptable by the other wing, then he will take it that other wing is not interested in the integrity of Pakistan as a whole...

রাষ্ট্রীয় বেতার ও টেলিভিশন

যে কোনো রাষ্ট্রীয় ঘটনার প্রথম প্রকাশ ঘটে রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম অর্থাৎ বেতার ও টেলিভিশনে। যেহেতু জাতীয় গণমাধ্যম অর্থাৎ বেতার এবং টেলিভিশন সরকারি প্রচারযন্ত্র তাই তারা সাধারণত সরকারি আজ্ঞাবহ ভাবে তথ্য পরিবেশন করে। তেমনি পাকিস্তানের ইতিহাসে জাতীয় গণমাধ্যম বেতার ও টেলিভিশন পাকিস্তানের সকল ঘটনাগুলিকে সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রচার করেছে। ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের সময় সারাদেশব্যাপী আন্দোলন চলাকালে সরকারি প্রচারমাধ্যম সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে তেমন গুরুত্ব দেয়নি। সার্জেন্ট জহুরুল হক হত্যা, ছাত্রনেতা আসাদ হত্যা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড.শামসুজ্জোহা হত্যার সংবাদ রাষ্ট্রীয় প্রচারমাধ্যমে প্রচার হয়নি। ক্ষেত্রবিশেষে প্রচার হলেও তা হয়েছে অনেক পরে। এসব সংবাদ জনগণের কাছে পৌছেছে মানুষের মুখে মুখে। গণআন্দোলনের মুখে যখন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ক্ষমতা থেকে বিদায় নেন তখন তিনি রাষ্ট্রীয় প্রচারমাধ্যমে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে জানান দেন যে, তিনি পাকিস্তানের রাজনীতি থেকে বিদায় নিচ্ছেন। ক্ষমতা হস্তান্তর করেছেন পাকিস্তানের তৎকালীন সামরিক প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে। আবার ইয়াহিয়া খানও ক্ষমতা গ্রহণ করে রাষ্ট্রীয় প্রচারমাধ্যমের মাধ্যমে ঘোষণা করেন তাঁর ক্ষমতা গ্রহণের উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা। একই সাথে জেনারেল ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবেও ক্ষমতা গ্রহণ করেন এ সংবাদও রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তার ক্ষমতা গ্রহণ থেকে শুরু করে নির্বাচনের পর এমনকি স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর সকল পরিকল্পনা জাতীয় গণমাধ্যমের মাধ্যমে সমগ্র দেশবাসীর কাছে তুলে ধরেছেন। জাতির উদ্দেশ্যে তাঁর প্রথম ভাষণ প্রচারিত হয় জাতীয় গণমাধ্যমে। এ ভাষণে তিনি ঘোষণা করেন ক্ষমতা আকড়ে ধরে

[৩৮] *দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার*, ৯ ডিসেম্বর ১৯৭০

রাখার কোনো গোপন অভিলাষ তাঁর নেই। একই সাথে তিনি ১৯৭০ সালের শেষ নাগাদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করেন। তিনি জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য একটি নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়নের লক্ষ্যে নতুন নির্বাচন কমিশনার গঠন করেন তাও জাতীয় গণমাধ্যমে প্রচারিত হয়। দেশবাসী জানতে পারে সুপ্রীম কোর্টের একজন বাঙালি বিচারপতিকে নতুন নির্বাচন কমিশনার হিসেবে জেনারেল ইয়াহিয়া খান নিয়োগ দিয়েছেন। আবার প্রেসিডেন্ট যখন ১ জানুয়ারি ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের রাজনীতির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন তাও জাতীয় প্রচারমাধ্যমে প্রচারিত হয়। প্রেসিডেন্ট তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ১৯৭০ সালের ২৮ মার্চ জাতীয় গণমাধ্যমে প্রচারিত জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের রূপরেখা সম্বলিত আইনগত কাঠামো আদেশ ঘোষণা করেন।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তাঁর শাসনকালে পাকিস্তানের রাজনীতির ক্ষেত্রে কিছু কাজের জন্য দেশে বিদেশে প্রশংসনীয় হয়েছেন। তিনি পাকিস্তানের সকল রাজনৈতিক দলগুলির জন্য নতুন এক সুযোগ সৃষ্টি করেন। তিনি তাদেরকে তাদের নির্বাচনী কর্মকাণ্ড জনগণের সামনে তুলে ধরার জন্য প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকে জাতীয় গণমাধ্যমে বক্তব্য প্রদানের সুযোগ দেন। এটি সর্বপ্রথম অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে রাজনীতিবিদদের সরকারি মালিকানার বেতার টেলিভিশনে তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য ব্যবহারের সুযোগ দেয়া হয়। ধারাবাহিক বক্তৃতার আয়োজন শুরু হয় ২৮ অক্টোবর ১৯৭০ সালে এবং ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। এ সময়ের মধ্যে ১৪টি দলের নেতৃবৃন্দ ভাষণ দেন। ইয়াহিয়া খানের এ উদ্যোগ রাজনৈতিক দলগুলিও ভালভাবে গ্রহণ করে কেননা তারা এই প্রথম নিজেদের কথা প্রচারের জন্য জাতীয় প্রচারমাধ্যম ব্যবহার করার সুযোগ পায় যা তাদের নির্বাচনী প্রচারণার ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা যোগ করে। নির্বাচন যত এগিয়ে আসছিল ততই দেশব্যাপী উত্তেজনা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। নির্বাচনের পূর্বে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও প্রধান নির্বাচনী কমিশনার বিচারপতি আবদুস সাত্তার দেশব্যাপী নির্বাচনী যজ্ঞের ব্যাপার এবং নির্বাচনকালীন শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যাপারে জাতীয় প্রচারমাধ্যমে ভাষণ দেন। সরকার জাতীয় গণমাধ্যমের মাধ্যমে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী প্রতীক কি এবং কিভাবে ভোট প্রদান করতে হবে, নির্বাচনী আচরণ বিধি এসব সম্পর্কেও দেশবাসীকে অবহিত করেন।

যথাসময়ে নির্বাচনের সকল প্রস্তুতি সমাপ্ত হয়। নির্বাচনের ফলাফল প্রচারের ক্ষেত্রেও সরকার জাতীয় গণমাধ্যমে কিভাবে ফলাফল প্রচার করা হবে সে সম্পর্কেও দিকনির্দেশনা দেন। নির্বাচনের দিন থেকে শুরু করে নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশ পর্যন্ত জাতীয় গণমাধ্যম বিশেষ অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে। দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে রেডিও পাকিস্তান ৭ ডিসেম্বর বেলা ১২টা থেকে একটানা ৩৭ ঘন্টাব্যাপী অনুষ্ঠান প্রচারের সিদ্ধান্ত নেয়। এ অনুষ্ঠানে ভোটপ্রদান ও ভোটপ্রদানকালীন পরিস্থিতির ধারা বর্ণনা, নির্বাচন সম্পর্কিত কথিকা ও নির্বাচনের ফলাফল প্রচার ছাড়াও অন্যান্য অনুষ্ঠান প্রচার করার সিদ্ধান্ত নেয়।[৩৯]

জাতীয় প্রচারমাধ্যম পাকিস্তান টেলিভিশন পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনকে গুরুত্ব দেয়। পাকিস্তান টেলিভিশনের

[৩৯] *দৈনিক সংবাদ*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচন সম্পর্কিত অনুষ্ঠান সম্পর্কে দৈনিক মর্নিং নিউজ পত্রিকা যে সংবাদ পরিবেশন করে[৪০]–

> General Elections in Pakistan on December 7 will give Pakistan Television its first great opportunity to play this important role and it will be called upon to prove itself as an effective, dependable and swift medium of information. Television in Pakistan is still in its early stages of development. The coverage of the general election is going to be the biggest challenges to its resourcefulness.
>
> The main idea would be to bring election results to the viewers instantly and round the clock. For this purpose Pakistan Television will have a special Election 70 transmission which will continue nonstop for 29 hours...
>
> To facilitate instant transmission of results, there will be communication links between the four television stations, the Provincial Election Commission and non partisan...The special programme for the election is thus is going to be the most important venture of Pakistan Television. It will be a programme whose quality and scale will be in keeping with the historic importance of the event.

মূল্যায়ন

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন পাকিস্তানের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ নির্বাচন নিয়ে অনেক সংশয় ছিল। কেননা পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে জন্মের পর প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের ভিত্তিতে কোনো সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। প্রথমদিকে মুসলিম লীগ সরকার নির্বাচনে পরাজয় ও নিজেদের হাত থেকে ক্ষমতা চলে যাবে এ ভয়ে কোনো নির্বাচন দিতে সাহস করেনি। তেমনি সামরিক শাসকও ক্ষমতায় এসে সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিকভাবে পাকিস্তানের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। তারা নির্বাচন দিলেও তা ছিল পরোক্ষ ভোটের মাধ্যমে। যাতে জনমতের প্রতিফলন ঘটেনি। তাই স্বাভাবিকভাবে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন নিয়ে পাকিস্তানের সর্বমহলের যেমন আগ্রহ উদ্দীপনা ছিল তেমনি দেশ বিদেশের গণমাধ্যমেরও আগ্রহ ছিল ব্যাপক। অবশ্য সাধারণ মানুষের কাছে এ নির্বচন নিয়ে বেশি আগ্রহ তৈরির পিছনে ভূমিকা পালন করেছে গণমাধ্যম। এ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের গণমাধ্যমগুলি কয়েকটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়।

১৯৬৯ সালে যখন পাকিস্তানের রাজনীতির উত্তাল সময় তখন এসব ঘটনার বিবরণ জনসাধারণ জানতে পারে গণমাধ্যমের মাধ্যমে। তাই পাকিস্তানের সামরিক শাসক তাদের খড়গহস্ত চালায় গণমাধ্যমের উপর। কোনো কোনো গণমাধ্যমের উপর সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। তাসত্ত্বেও গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করতে পারেনি। আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে গণমাধ্যম যেভাবে জোরালো ভূমিকা পালন করেছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানব্যাপী এ আন্দোলনের সংবাদ মানুষ জানতে পারে গণমাধ্যমের মাধ্যমে। আন্দোলনের চাপে যখন আইয়ুব খান দেশের সংকটকালীন মুহূর্ত থেকে কোনো সমাধান বের করতে পারেননি তখন তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি এক্ষেত্রে আবারো সামরিক শাসনের আশ্রয় নেন।

[৪০] *দৈনিক মর্নিং নিউজ*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণ করে বুঝতে পারেন যে, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন না দিলে দেশের সংকটকালীন সমস্যার সমাধান হবে না। তাই তিনি ক্ষমতা গ্রহণের সময় থেকে শুরু করে নির্বাচন অনুষ্ঠান পর্যন্ত প্রতিটি কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে। তাই প্রতিটি গণমাধ্যমে ইয়াহিয়া খানের এসব কর্মকাণ্ডের বিবরণ ফলাও করে প্রকাশ করে। একই সাথে প্রতিটি গণমাধ্যম তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করে।

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গণমাধ্যমগুলি আদর্শগত ও সমর্থনের দৃষ্টিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক একটি গণমাধ্যম এক একটি রাজনৈতিক দলের মুখপাত্র হিসেবে ভূমিকা রাখতে শুরু করে। ১৯৭০ সালের পূর্ব পর্যন্ত নির্বাচন ও রাজনৈতিক দলগুলির কর্মকাণ্ড নিয়ে গণমাধ্যমের ভূমিকা সক্রিয় থাকলেও তা তেমন জোরালো ছিল না। কিন্তু ১ জানুয়ারি থেকে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হলে গণমাধ্যমগুলিও রাজনৈতিক দলের সমর্থনে সরব হয়ে ওঠে। তাদের এ সরব অবস্থান বজায় ছিল নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা পর্যন্ত। মাঝে ১২ নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের সময় গণমাধ্যমগুলি নির্বাচনী সংবাদের চেয়ে গুরুত্ব দেয় দুর্যোগকালীন ঘটনার প্রতি। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ঘোষণা অনুযায়ী যখন নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষিত হয় তখন আবারো গণমাধ্যমগুলি নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তখন কোনো গণমাধ্যম প্রকাশ্যে আবার কোনো গণমাধ্যম পরোক্ষভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলিকে সমর্থন দিয়ে সে দলের নির্বাচনী সংবাদ পরিবেশন করে।

পূর্ব পাকিস্তানে যেমন বাংলা ও ইংরেজি শীর্ষস্থানীয় কিছু দৈনিক ছিল তেমনি পশ্চিম পাকিস্তানে থেকে প্রকাশিত পত্রিকাও এখানে বহুল প্রচলিত ছিল। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত ও সরকার সমর্থক পত্রিকাগুলিতে সরকারি সংবাদ বেশি প্রাধান্য পেত। পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনা খুব কম গুরুত্ব পেত। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান থেকে সকল গণমাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের সংবাদ বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হতো। দি ডন, মর্নিং নিউজ, দৈনিক পাকিস্তান এসকল পত্রিকায় সরকারি কর্মকাণ্ড, নির্বাচন সংক্রান্ত সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ, সামরিক আইন বিধি প্রকাশিত হতো। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের দৈনিক ইত্তেফাক সরাসরি আওয়ামী লীগকে সমর্থন দিয়ে তাদের সংবাদ পরিবশন করে। একই সাথে এ পত্রিকা সরকারের সমালোচনাও করতো। দৈনিক সংবাদ বামপন্থী রাজনৈতিক দল ন্যাপ ভাসানী পত্রিকা হওয়ায় এদের সংবাদে বেশি প্রাধান্য পেত বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির সংবাদ। এরা সরকারের সমালোচনার পাশাপাশি আওয়ামী লীগ ও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলির সমালোচনা করে সংবাদ পরিবেশেন করতো। দৈনিক আজাদ পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত হলেও এ পত্রিকা পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ রক্ষার পাশাপাশি সরকারের ও মুসলিম লীগ সমর্থিত দলগুলির সংবাদও প্রকাশ করতো। দৈনিক সংগ্রাম জামায়াতে ইসলামি ও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলির সমর্থন করতো। এ পত্রিকাটি সরকারের সমালোচনার চেয়ে আওয়ামী লীগ ও বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির সমালোচনা বেশি করতো। দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকা বিভিন্ন ভিত্তিহীন সংবাদ পরিবেশন করতো। যেমন আওয়ামী লীগ সম্পর্কে এ পত্রিকাটি বলে যে এ দলটি ভারত থেকে টাকা এনে নির্বাচন করছে। কিন্তু এ ধরনের সংবাদের কোনো সমর্থিত সূত্র তারা দিতে পারে নি। জনমনকে আওয়ামী লীগ

Dhaka University Institutional Repository

ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি সম্পর্কে মিথ্যা ভিত্তিহীন সংবাদ পরিবেশন করে রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোড়ন ও উত্তেজনা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। কিন্তু এটি খুব বেশি যে ফলপ্রসু হয়নি তা নির্বাচনের ফলাফল থেকেই প্রমাণিত হয়েছে। একইভাবে পূর্বদেশ, পাকিস্তান অবজারভার এসব সংবাদপত্রে বেশি প্রাধান্য দেয়া হতো পূর্ব পাকিস্তানীদের সংবাদ। এ দুটো পত্রিকা নির্বাচনসময়কালীন সরকারের সমালোচনার পাশাপাশি সকল রাজনৈতিক দলকে গুরুত্ব দিয়ে সকল রাজনৈতিক দলের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলির সমালোচনা করে সংবাদ প্রকাশ করেছে।

আবার জাতীয় গণমাধ্যম বেতার ও টেলিভিশন সবসময় সরকারের আজ্ঞাবহ হিসেবে সরকারি সংবাদ পরিবেশনে সবচেয়ে বেশি সচেষ্ট ছিল। নির্বাচনকে ঘিরে তাদের তেমন কোনো তৎপরতা ছিল না। শুধুমাত্র নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম তাদের সম্প্রচার কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখে। সরকারের সিদ্ধান্তে সকল রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনের আগে তাদের দলের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা জনগণের সামনে তুলে ধরার জন্য রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম ব্যবহার করার সুযোগ পায়। এই একটি দিক ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের তেমন কোনো ভূমিকা ছিল না। ভূমিকা যা ছিল তা সরকারি প্রশাসন যন্ত্র হিসেবে।

সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন নিয়ে এদেশের গণমাধ্যমগুলোর ভূমিকা একদিকে যেমন ইতিবাচক ছিল তেমনি আবার নেতিবাচকও ছিল। রাজনৈতিক দলগুলোর ভাল-মন্দ দু'ধরনের সংবাদই তারা পরিবেশন করতো। ১৯৭০ সালের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তাদের পরিবেশিত সংবাদে সুস্পষ্ট জনমতের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

উপসংহার

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ব্রিটিশ শাসিত ভারতে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩৭ সালে। নির্বাচনের পর কৃষক-প্রজা পার্টির এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে প্রথম মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এ দশ বছরে ব্রিটিশ শাসিত ভারতে বঙ্গীয় আইনসভায় চারটি মন্ত্রিসভা ছিল। মাঝে ১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ শাসিত ভারতে শেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। মুসলিম জনসংখ্যা অধ্যুষিত পূর্ববাংলা পাকিস্তানের একটি অংশ হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে একীভূত হয়। কিন্তু পাকিস্তানের দু'অংশের মধ্যে ছিল হাজার মাইলের ব্যবধান। মাঝে আরেকটি রাষ্ট্র। দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে শুধু ধর্মীয় জাতিসত্তার পরিচয়ে গঠিত হয় পাকিস্তান রাষ্ট্র। দুই প্রান্তে দুই অঞ্চল। অন্য অংশে যেতে পাড়ি দিতে হয় আর এক দেশের সীমানা। ভাষা, আচার আচরণ, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, জীবনযাত্রা সবদিক থেকে পৃথক দুই ভিন্ন জনগোষ্ঠী শুধু ধর্মীয় পরিচয়ে এক জাতিসত্তার নামে নতুন রাষ্ট্র হিসেবে যাত্রা শুরু করে। পাকিস্তানের এ ধরণের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া মন্তব্য করেন[১]-

> ভৌগোলিক দিক থেকে পাকিস্তান ছিল একটি বিচিত্র রাষ্ট্র। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অভিধানে বিশ্বে এর দ্বিতীয় নজির বলতে গেলে নেই। পাকিস্তানের দুইটি অংশ পরস্পর হতে পনেরশ কি.মি বিদেশী এলাকা দ্বারা বিচ্ছিন্ন। শুধু ভৌগোলিক দিক থেকেই অবাস্তব নয়, অন্যান্য দিক হতেও যেমন সংস্কৃতি, কৃষ্টি, সভ্যতা, আচার ব্যবহার, ঐতিহ্য এবং অর্থনীতি-দুটি অঞ্চলে বিরাট পার্থক্য।

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ড. আহমেদ হাসান দানী পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থান ও রাষ্ট্রীয় সংহতির উপর আলোকপাত করে মন্তব্য করেছিলেন যে, ইতিহাসের গতিতে পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত দুটি সার্বভৌম ও স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হবে।[২]

পাকিস্তান রাষ্ট্র জন্মের কয়েক বছরের মধ্যেই রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিশেষ করে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান ভিত্তিক উপদল, তাদের মধ্যকার ভাষা ও আঞ্চলিক রাজনীতি, স্বাধিকারের প্রশ্নে অব্যাহত মতানৈক্য এবং বিবদমান দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানে এ সময় কিছু আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ঘটে। এসব রাজনৈতিক দলগুলোর উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ রক্ষার্থে আন্দোলন করা। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর ১৯৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ নানা অজুহাতে নির্বাচন অনুষ্ঠান পিছিয়ে দেয়। ইতিমধ্যে ১৯৪৯ সালে টাঙ্গাইল উপ নির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থী পরাজিত হওয়ার পর নির্বাচন দিলে এর ফলাফল কি হবে তা নিয়ে মুসলিম লীগ সরকার আশঙ্কিত হয়। এজন্য আইন পরিষদের শূন্য আসনগুলিতে নির্বাচন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে। শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগ সরকার ১৯৫৪ সালে নির্বাচন দিতে

[১] তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, *পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর*, ঢাকা, বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল লি, ১৯৮১, পৃ. ২৬

[২] অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫*, ঢাকা, খোশরোজ কিতাবমহল, ১৯৮২, পৃ. ৪৪৩

Dhaka University Institutional Repository

স্বীকৃতি জানায়। নির্বাচনে দেখা যায় মুসলিম লীগ যুক্তফ্রন্টের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। কিন্তু এ নির্বাচনে জনগণের ম্যান্ডেট পেয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করলেও তা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কেননা মুসলিম লীগ সরকার এ নির্বাচনের রায়কে মেনে নিতে পারে নি। এর ফলে কিছুদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিকভাবে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে সরিয়ে দিয়ে গভর্নর জেনারেলের শাসন চালু করে। কিন্তু তা-ও বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কিছুদিনের মধ্যেই অর্থাৎ ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের রাজনীতিতে শুরু হয় সামরিক শাসন। যা স্থায়ী হয় ১৯৭১ সাল অবধি।

পাকিস্তানের প্রথম সামরিক শাসক জেনারেল আইয়ুব খান ১৯৫৮-১৯৬৯ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকলেও এ সময় তিনটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু কোনো নির্বাচন জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। জনগণের আকাঙ্ক্ষার কাছে এসব নির্বাচনের ফলাফল তথা আইয়ুব খান পরাজিত হয়েছেন। তাঁর শাসনকালে গণঅভ্যুত্থানের সময় যখন প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের দাবি ওঠে তখন তিনি বাধ্য হয়ে রাজনীতিবিদদের গোলটেবিল বৈঠকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু তা ফলপ্রসু না হওয়ায় সাংবিধানিক সংকট নিরসনকল্পে তিনি তাঁর পরবর্তী সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে বিদায় নেন। জেনারেল ইয়াহিয়া কিন্তু শুরু থেকেই সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের পক্ষপাতি ছিলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি কিছু কার্যকরী পদক্ষেপ নেন। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্ব পর্যন্ত ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের ব্যাপারে আন্তরিক ছিলেন। যা তাঁর গৃহিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে পরিলক্ষিত হয়।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বহু কারণে। প্রথমত, পাকিস্তানের দীর্ঘ তেইশ বছরে এই প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে। দ্বিতীয়ত, ১৯৫৮ সালে যখন আইয়ুব খান ক্ষমতা গ্রহণ করেছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন দেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি হলে তিনি নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে বিদায় নিবেন। কিন্তু পাকিস্তানের জনগণ অবলোকন করে তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি না রেখে বরং নিজের ক্ষমতাকে দৃঢ় করে রাখার উদ্যোগ নিয়েছেন। কিন্তু ইয়াহিয়া খান এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তৃতীয়ত, এই নির্বাচনে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চল থেকে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এমনকি বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল উভয় পরিষদে তাদের দলীয় মনোনয়ন দেয়। চতুর্থত, নির্বাচনে অনেক রাজনৈতিক দল থাকা সত্ত্বেও দুটি রাজনৈতিক দল দু'অঞ্চলে তাদের প্রাধান্য বিস্তার করে আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল হিসেবে তাদের জয় নিশ্চিত করে। পঞ্চমত, নির্বাচনে সকল রাজনৈতিক দল একটি সুষ্ঠু, অবাধ নির্বাচনের লক্ষ্যে তারা যে শৃঙ্খলাবোধ ও সংযমের পরিচয় দিয়েছে তা অবাক করার মতো। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যে প্রতিযোগিতা হয়েছে তা বাক যুদ্ধের মাধ্যমে হয়েছে কিন্তু তা সংঘর্ষে রূপ নেয়নি। তারা একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। ষষ্ঠত, এ নির্বাচন নিয়ে জনগণের আগ্রহও ছিল অত্যধিক। কেননা পাকিস্তান শাসনপর্বে জনগণ তাদের

Dhaka University Institutional Repository

ভোটাধিকার প্রয়োগের চর্চা ভুলে গিয়েছে। ফলে তেইশ বছর পর যখন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় জনগণ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা নিযে তাদের পছন্দের প্রার্থীদের ভোট দিয়ে তাদের রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ পায়।

নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। তিনটি ধারার রাজনৈতিক দল এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। শুরু থেকেই সকল রাজনৈতিক দলের এ নির্বাচন নিয়ে আগ্রহ ছিল অনেক বেশি। প্রত্যেক দল তাদের জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী ছিল। প্রেসিডেন্ট হিসেবে ইয়াহিয়া খান যখন ক্ষমতা গ্রহণের পর ঘোষণা দেন আগামী নির্বাচন হবে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে তখন সকল রাজনৈতিক দল তাঁর এ ঘোষণাকে স্বাগত জানায়। কিছু রাজনৈতিক দল নির্বাচনের পূর্বে স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারটি নিশ্চিত করার কথা বলে। কিন্তু তারা নির্বাচন নিয়ে আশান্বিত হয়। একইভাবে প্রেসিডেন্ট সুষ্ঠুভাবে নির্বাচনের জন্য একজন বাঙালি বিচারপতির নেতৃত্বে নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন করে নতুন ভোটার তালিকার কাজ শুরু করে তখনও রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা ছিল ইতিবাচক। বিশেষ করে আইয়ুব খানের সময়কার ভোটার তালিকা নিয়ে সকল রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যে সংশয় ছিল এর ফলে তার অবসান ঘটে। আইনগত কাঠামো আদেশ ঘোষণার পর রাজনৈতিক দলগুলো সর্বপ্রথম নির্বাচন সম্পর্কে তাদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বিভিন্ন ভাবে। এসব প্রতিক্রিয়ায় দেখা যায় রাজনৈতিক দলগুলো প্রথমাবস্থায় আইনগত কাঠামো আদেশের তিনটি ধারা সংশোধনের দাবী জানায় নতুবা তারা নির্বাচনে অংশ নিবে না। একমাত্র আওয়ামী লীগ আইনগত কাঠামো আদেশের সংশোধনী দাবি করলেও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না এমন কথা বলে নি। কারণ আওয়ামী লীগ শুরু থেকেই নির্বাচনের পক্ষপাতি ছিল। স্বয়ং আওয়ামী লীগ প্রধান নির্বাচন হলে তাঁর দলের জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী ছিলেন অনেক বেশি। কেননা এ দলটি ১৯৬৬ সাল থেকে পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ রক্ষায় যেভাবে আন্দোলন করছিল তা অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের মধ্যে দেখা যায় নি। তাদের নির্বাচনী ইশতাহার প্রণয়ন করা হয়েছিল জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা স্মরণ রেখে। ফলে এ রাজনৈতিক দলটি চাচ্ছিল সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন হলে তারা জয়ী হবে। নির্বাচন পিছানো নিয়ে যত বার দাবি ওঠে বেশিরভাগ সময় এ দাবিগুলো ওঠে ধর্মভিত্তিক ও বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে। তাদের দাবি জনগণের ভোটদানের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে তারা নির্বাচন পিছানোর কথা বলেছে। কিন্তু নির্বাচন পিছিয়ে দিলে তা কতটা জনকল্যাণমুখী হবে তা তারা সুস্পষ্ট করতে পারেননি। কেননা নির্বাচন নিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যেও আশা নিরাশা ছিল। নির্বাচনে এককভাবে অংশ নিবে নাকি কোনো দলের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে অংশ নিবে তা ঠিক করতেই তাদের অনেক সময় চলে যায়। তাই রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্ন সময় নির্বাচন নিয়ে তাদের যে বক্তব্য বিবৃতি দিয়েছে তাতে তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ১ জানুয়ারি ১৯৭০ সালে যখন নির্বাচনী কর্মতৎপরতার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয় তখন সকল রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নির্বাচনী প্রচারণা জোরে শোরে শুরু করে। সকল রাজনৈতিক দলগুলোর লক্ষ্য ছিল নিজেদের জয় নিশ্চিত করা। নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত রাজনৈতিক দলগুলো দেশের বিভিন্ন স্থানে সভা সমাবেশ করেছে। এক দল অন্য দলের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিলে তারা আবার পাল্টা জবাব দিয়েছে কিন্তু তা ছিল সহনীয় পর্যায়ে। যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে সকল রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। একমাত্র ন্যাপ ভাসানী ও প্রগতি লীগ নির্বাচনের এক সপ্তাহ

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বে নির্বাচন বয়কট করে। জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে সকল রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। তারা প্রত্যেকে তাদের জয় সম্পর্কে অনেক বেশি আশাবাদী ছিল। কিন্তু ফলাফল ঘোষণার পর দেখা যায় যে, জাতীয় পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ পায় ১৬৭টি আসন। শুরুতে এ ফলাফল সবার কাছে অভাবিত হলেও পরবর্তীতে সকল রাজনৈতিক দল এ ফলাফলকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করে। একই সাথে তারা নির্বাচিত বিজয়ী দলকে শুভেচ্ছা জানায়। কিন্তু জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের দশ দিন পর যখন প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তখন নির্বাচনের চিত্র পাল্টে যায়। কেননা এসময় বেশিরভাগ রাজনৈতিক দলগুলো তাদের পরাজয় নিশ্চিত জেনে নির্বাচনী মাঠ থেকে তাদের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেয়। দুটি পরিষদের নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে হলেও যেখানে সকল রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনের এ রায়কে মেনে নেয় তখন একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল জামায়াতে ইসলামি। তারা এ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে হয়নি বলে মতামত ব্যক্ত করে।

এই নির্বাচনের ফলাফল শুধুমাত্র পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলোকে অবাক করেনি। একই সাথে এ ফলাফলে অবাক হয়েছে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা সরকার। কেননা এ নির্বাচনের ফলাফল তাদের কাছে ছিল হিসেবের বাইরে। তারা আশা করেছিল তাদের সাহায্যপুষ্ট রাজনৈতিক দলগুলোই নির্বাচনে জয়ী হবে। আর এতে সামরিক সরকার তাদের গোপন মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে পারবে। নির্বাচনে এ অভাবিত এবং অসাধারণ ফলাফল পাকিস্তানের রাজনীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে সূচিত করেছিল। কিন্তু এ পরিবর্তনের মাধ্যমে দীর্ঘদিন পর পাকিস্তানের গণতন্ত্র চর্চা ও এর বিকাশের প্রশ্নে কে কতটুকু আন্তরিক নিষ্ঠাবান তা নিয়ে নির্বাচন পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ গটতে থাকে। একই সাথে একটি দেশ কিভাবে অভ্যুদয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তা এ ঘটনা প্রবাহ থেকেই বুঝা যায়।

১৯৭০ সলের ৯ ডিসেম্বর মওলানা ভাসানী স্বাধীন সার্বভৌম পূর্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তানীদের রায় যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে একটি গণভোট অনুষ্ঠানের দাবি করেন।[৩] নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার একদিন পর মওলানা ভাসানীর আরেকটি নির্বাচন দাবী ও পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার জন্য গণভোট অনুষ্ঠানের বিষয়টি পর্যবেক্ষক মহলকে বিস্মিত করে। কারণ এ নির্বাচনে মওলানা ভাসানীর অংশ নেয়ার কথা ছিল। এ জন্য প্রার্থী মনোনয়নও দিয়েছিল। কিন্তু নির্বাচনের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে নির্বাচন বয়কট করে আবার নির্বাচনের দাবী তোলা ছিল সকলের কাছে বিস্ময়কর।

১৫ ডিসেম্বর পাকিস্তানের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে ৬-দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র অঞ্চলে অঞ্চলে ও মানুষের মানুষে ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা দিতে পারবে বলে আশ্বাস প্রদান করেন।[৪] একই দিনে পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশের মধ্যে দুটি প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নতো ভুট্টো পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য ৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটি করে সকলকে বিস্মিত করে দেন।[৫] ভুট্টোর এ ঘটনাকে অভিনন্দন জানান পিডিপি'র নূরুল আমীন। ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন শেষ হওয়ার পর

[৩] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১০ ডিসেম্বর ১৯৭০
[৪] *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭০
[৫] *ঐ*

Dhaka University Institutional Repository

কমিউনিস্ট সমর্থিত হাতিয়ার পত্রিকা আশঙ্কা প্রকাশ করে যে, জনগণের সুস্পষ্ট রায় সত্ত্বেও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে প্রকৃত শাসনক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই।[৬] তাদের এ আশঙ্কা সত্যি হয় কিছু দিনের মধ্যেই।

১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগের নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যরা জনগণের সামনে প্রকাশ্যে শপথ গ্রহণ করে। এদিন শেখ মুজিব নবনির্বাচিত সদস্যদের উদ্দেশ্যে ও জাতির উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনা মূলক ভাষণ দেন। যার মধ্যে স্বাধীনতার কথা প্রচ্ছন্নভাবে লুকায়িত ছিল।[৭] পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের পর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১১ জানুয়ারি প্রথম ঢাকায় আসেন। বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, তাঁর যে দায়িত্ব ছিল তা শেষ হয়েছে। জাতি কীভাবে পরিচালিত হবে সেই পথে আমি গতি সঞ্চার করে দিয়েছি।[৮] ঢাকা এসে ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবের সাথে দু'দফা আলোচনা করেন। পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করার সময় ১৪ জানুয়ারি তিনি সাংবাদিকদের সামনে শেখ মুজিবকে ভাবী প্রধানমন্ত্রী বলে সম্বোধন করেন।[৯] ঢাকা থেকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পাখি শিকারের নামে ভুট্টোর সাথে দেখা করে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ রাজনীতি নিয়ে আলোচনার জন্য লারকানা যান। সেখানে পাখি শিকারের বদলে তারা দু'জনে পাকিস্তানের রাজনীতিকে কিভাবে শিকার করা যায় সে পরিকল্পনায় ব্যস্ত ছিলেন। ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্ট ঢাকায় শেখ মুজিবকে ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করেননি বলে অস্বীকার করেন। বরং এ সময় তিনি বলেন, পার্লামেন্টারী ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাই প্রধানমন্ত্রী হয়ে থাকেন। এখন শেখ সাহেব যদি প্রধানমন্ত্রী হতে না চান তার পক্ষে জোর করারও কিছুই নেই।[১০] প্রেসিডেন্টের এই মত পরিবর্তন ভবিষ্যৎ ক্ষমতা হস্তান্তরে গভীর ষড়যন্ত্রের পূর্বাভাস পান অনেকে। পিপলস পার্টির নেতা ভুট্টো প্রথমদিকে ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করলেও প্রেসিডেন্টের সাথে তাঁর বৈঠকের পর মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। শেখ মুজিবের সাথে দেখা করার জন্য ভুট্টো ২৭ জানুয়ারি ঢাকায় আসেন। এদিন তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের সাথে কী কী বিষয়ে মতৈক্য ও সমঝোতা করা যায়, তার অনুসন্ধানেই তিনি ঢাকা এসেছেন। তিনি বলেন, প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ায় দেশের রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।[১১] ২৮ জানুয়ারি মুজিব-ভুট্টো বৈঠক হলেও উভয় নেতা তাদের বৈঠকের বিষয় গোপন রাখেন।[১২] ২৯ জানুয়ারি দুই নেতা নৌবিহারে যান এবং আরো এক দফা বৈঠক করেন। কিন্তু বৈঠকের ফলাফল তখনও প্রকাশ হয়নি।[১৩]

সাধারণ নির্বাচনের পর সমগ্র পাকিস্তান জুড়ে এমন কতগুলো ঘটনা ঘটে যাতে বুঝা যাচ্ছিল কোনো একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী যে কোনো উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর বিলম্বিত করতে চায়। বিশ্বকাপ হকি প্রতিযোগিতায় ভারতীয় খেলোয়ারদের পাকিস্তানে আসতে ভুট্টোর হুমকি, সংসদ সদস্য আহমদ রফিক হত্যা, মওলানা ভাসানীর পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার দাবি সবশেষে

---

[৬] মোহাম্মদ হাননান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫০
[৭] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৪ জনুয়ারি ১৯৭১
[৮] ঐ, ১২ জানুয়ারি ১৯৭১
[৯] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৫ জানুয়ারি ১৯৭১
[১০] *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৮ জানুয়ারি ১৯৭১
[১১] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৮ জানুয়ারি ১৯৭১
[১২] *ঐ*, ২৯ জানুয়ারি ১৯৭১
[১৩] *ঐ*, ৩০ জানুয়ারি ১৯৭১

Dhaka University Institutional Repository

ভারতীয় একটি বিমান ছিনতাই করে লাহোরে নিয়ে যাওয়া। এ ঘটনার পর শেখ মুজিব দ্রুত তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেও ভুট্টো বলেন, ভারতীয় বিমান ধ্বংস করার জন্য পাকিস্তান দায়ী নয়।

১৯৭১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে আওয়ামী লীগের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ও কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের এক যৌথ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এদিন শেখ মুজিব বলেন, গণতান্ত্রিক দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছাই সবাই মেনে নেয়। কিন্তু পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রের রাজনীতি গত ২৩ বছর দেশে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে, তার জের এখনো চলছে। তিনি বলেন, ইয়াহিয়া খান তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করে এসেছেন, তাঁর আমলে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এক ইউনিট বাতিল করা হয়েছে। যথা শীঘ্র তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন বলে বঙ্গবন্ধু আশা প্রকাশ করেন।[১৪]

মধ্য ফেব্রুয়ারি থেকে পাকিস্তানের রাজনীতির সর্বশেষ সংকট শুরু হয়। এ সংকটের সূত্রপাত করেন জুলফিকার আলী ভুট্টো। ১৫ ফেব্রুয়ারি তিনি পেশোয়ারে সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন, জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেয়ার জন্য তিনি ঢাকায় যাবেন না।[১৫] পাকিস্তানের সকল রাজনৈতিক দল ভুট্টোর এ সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে অবাক হয়। রাজনৈতিক মহলে একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পাকিস্তানের অস্তিত্ব এখন বিপন্ন। ১৭ ফেব্রুয়ারি ভুট্টো ঘোষণা করেন, আওয়ামী লীগের আর আপস আলোচনার পথ নেই। ঢাকায় গিয়ে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে পিপিপি'র সদস্যরা যদি শাসনতন্ত্র অনুমোদন না করে, তাহলে আওয়ামী লীগ প্রশ্ন করতে পারে, শাসনতন্ত্রে যদি সই না দেবে, তাহলে ঢাকা এসেছ কেন? সেক্ষেত্রে জাতীয় পরিষদ হবে একটি কসাইখানা।[১৬] ২২ ফেব্রুয়ারি ভুট্টো সংকট সমাধানে ৫-দফা দাবি ফর্মূলা পেশ করেন। এতে তিনি সকল প্রদেশের জন্য সমান প্রতিনিধিত্বের দাবি তোলেন এবং এজন্য কেন্দ্রে একটি দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ গঠনের কথাও বলেন।[১৭] নির্বাচনের পর আসন্ন রাজনৈতিক সংকট নিরসনের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা ঘনঘন ঢাকায় আসতে থাকেন। ঢাকায় এসে তারা সবাই শেখ মুজিবের সাথে বৈঠক করেন এবং শেখ মুজিবের প্রতি তাঁদের আস্থা প্রকাশ করেন।

জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে ভুট্টোর যোগদানে অস্বীকৃতিকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের রাজনৈতিক শক্তিগুলো যখন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে তখন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ভাইস এডমিরাল এস এম আহসানকে জরুরী প্রয়োজনে পশ্চিম পাকিস্তানে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়। পূর্ব পাকিস্তানের সংকটপূর্ণ রাজনৈতিক অস্থিরতা সম্পর্কে রিপোর্ট করার জন্য গভর্নরকে ডেকে পাঠানো হয়। ২৬ ফেব্রুয়ারি সংকট নিরসনের শেষ চেষ্টা হিসেবে প্রেসিডেন্টের বিশেষ দূত জেনারেল এস জি এম পীরজাদাকে শেখ মুজিবের সাথে দেখা করার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়।[১৮] এদিন শেখ মুজিব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর মন্তব্য করে ৬-দফা সংকটের একটি গ্রহণযোগ্য ফর্মূলা বের করেন। তিনি বলেন, পাকিস্তানের কোনো

[১৪] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১
[১৫] *ঐ*, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১
[১৬] *ঐ*, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১
[১৭] *ঐ*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১
[১৮] *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১

Dhaka University Institutional Repository

প্রদেশের জন্য তিনি ৬-দফা চাপিয়ে দিবেন না। পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো প্রদেশে স্বায়ত্তশাসনের পূর্ণ সুযোগ লাভে অনিচ্ছুক হলে আওয়ামী লীগ জোর করবে না। তবে বাংলাদেশের ব্যাপারে ৬-দফা পুরোপুরি কার্যকর হতে হবে।[১৯] ২৬ ফেব্রুয়ারি করাচীতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর মধ্যে একান্ত বৈঠক হয়। এদিন ঢাকায় গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিল হয়ে গিয়েছে। সর্বত্র এ খবর ছড়িয়ে পড়লে পূর্ব পাকিস্তানীদের মধ্যে চাপা উত্তেজনা লক্ষ করা যায়। ২৭ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টিতে শেখ মুজিবের সভাপতিত্বে পাকিস্তানের খসড়া শাসনতন্ত্র পেশ করা হয়।[২০] এদিন ওয়ালী খান ন্যাপ থেকে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে ঢাকায় আসেন জাতীয় পরিষদে অধিবেশনে যোগ দিতে।[২১] ২৮ ফেব্রুয়ারি ভুট্টো লাহোরে বলেন, জাতীয় পরিষদের এবারের তারিখ পিছিয়ে দিলে তিনি অধিবেশনে যোগ দিবেন। তিনি হুমকি দিয়ে বলেন, তাকে ছাড়া অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলে খাইবার থেকে করাচী পর্যন্ত আন্দোলন শুরু করবেন।[২২]

১ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান রেডিওতে ভাষণে ৩ মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কলের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন।[২৩] রেডিওতে যখন এ খবর প্রচার হয় তখন ঢাকা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল বিশ্ব একাদশ ও পাকিস্তানের মধ্যকার আর্ন্তজাতিক ক্রিকেট ম্যাচ। যার ফলশ্রুতিতে জনগণ তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে রাজপথে নেমে যায়। খেলা বন্ধ হয়ে যায়। এদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেন, আগামী ৭ মার্চ তিনি রেসকোর্স ময়দানে বাংলার মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার অর্জনের কর্মসূচি ঘোষণা করবেন।[২৪] ২ মার্চ ঢাকায় ও ৩ মার্চ সারাদেশে হরতাল পালিত হয়। ২ মার্চ সারাদেশে কারফিউ জারি করা হয়। এদিন পুলিশের গুলিতে দুজন নিহত হয়। ৪ মার্চ ঢাকাসহ প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৮ ঘন্টা হরতাল পালিত হয়। ৫ মার্চ টঙ্গীতে সশস্ত্রবাহিনীর গুলিতে ২ জন নিহত ও ৩০ জন আহত হয়। ৬ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এক বেতার ভাষণে ঢাকায় পুনরায় ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান করেন।[২৫] ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর সর্বশেষ দিকনির্দেশনা মূলক ভাষণ দেন।[২৬] একই দিনে এডমিরাল আহসানকে সরিয়ে দিয়ে লে. জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করে পাঠানো হয়। কিন্তু সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি তাকে শপথ গ্রহণ করাতে অস্বীকৃতি জানায়।[২৭] ৭ মার্চের পর থেকে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। শেখ মুজিবের ডাকে শুরু হয়ে যায় অসহযোগ আন্দোলন। জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় নেমে আসে। পূর্ব পাকিস্তানীদের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানায় পশ্চিম পাকিস্তানের বেশিরভাগ রাজনৈতিক দলের নেতা। এ সময় থেকে পূর্ব পাকিস্তানের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে যায়। এরকম অবস্থায় ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান

[১৯] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১
[২০] *ঐ*, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১
[২১] *ঐ*
[২২] *দৈনিক পাকিস্তান*, ১ মার্চ ১৯৭১
[২৩] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২ মার্চ ১৯৭১
[২৪] *ঐ*, ২ মার্চ ১৯৭১
[২৫] *ঐ*, ৭ মার্চ ১৯৭১
[২৬] *ঐ*, ৮ মার্চ ১৯৭১
[২৭] *ঐ*

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকায় আসেন এবং শেখ মুজিবের সাথে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে আলোচনার প্রস্তাব দেন।[২৮] শেখ মুজিব আলোচনা প্রস্তাবে রাজি হলেও তাঁর ডাকে প্রদেশব্যাপী যে অসহযোগ আন্দোলন চলছিল তা প্রত্যাহার করেননি। ১৬ মার্চ থেকে ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনা শুরু হয়। ২২ মার্চ হঠাৎ করে ঢাকায় আসেন জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং আলোচনায় অংশ নেন।[২৯] ২৩ মার্চ পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র দিবসে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র পাকিস্তানের পতাকার পরিবর্তে স্বাধীন বাংলার জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। ২৪ মার্চ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক সংকট নিরসনের জন্য সর্বশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু মুজিব-ভুট্টো-ইয়াহিয়া আলোচনার নামে যা হয় তা প্রহসন মাত্র। একদিকে সমগ্র বিশ্বকে দেখানো হচ্ছিল আলোচনার মাধ্যমে সংকট নিরসনের উপায় বের করা হচ্ছে। অন্যদিকে আলোচনার নামে সময় ক্ষেপণ করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে গোপনে আনা হচ্ছিল সৈন্য, অস্ত্র ও রসদ। পরিকল্পনা করা হচ্ছিল কীভাবে বাঙালিদের নিধন করা যায়। যার বাস্তবায়ন দেখা যায় একদিন পর। ২৫ মার্চ রাতে যখন নিরস্ত্র বাঙালিরা ঘুমে আচ্ছন্ন তখন পশ্চিম পাকিস্তানীরা তাদের নীল নকশা বাস্তবায়নে সশস্ত্র হয়ে রাস্তায় নেমে আসে। শুরু হয় 'অপারেশন সার্চলাইট'। হত্যা করে নিরস্ত্র বাঙালিদের। এরপর দীর্ঘ নয় মাস রক্তাক্ত যুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালিরা ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতা। বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়ায় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

সর্বোপরি বলা যায়, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন স্বাধীনতা পূর্ব বাংলাদেশের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বাঙালি জাতি এ প্রথম অবলোকন করে সামরিক শাসক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সর্বপ্রথম যে উদ্দেশ্যে নিয়ে ক্ষমতা গ্রহণ করেছিল সে উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত ঠিক থাকে নি। তারা একটি সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আন্তরিক ছিলেন কিন্তু আবার তারাই জনগণের ম্যান্ডেট পাওয়া সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানীদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে বরং সেটাকে বিলম্বিত করে। একদিকে শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থান্বেষী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় অন্যদিকে বাঙালিরা বুঝতে পারে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর তাদেরকে শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তর করে নি, এতে বুঝা যায় পশ্চিম পাকিস্তানীরা কখনো পূর্ব পাকিস্তানীদের স্বার্থ রক্ষায় আন্তরিক নয়। তারা পূর্ব পাকিস্তানকে নিজেদেরকে একটি অংশ মনে না করে বরং কীভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করে নিজেদের সমৃদ্ধি আরো বেশি করা যায় সে চেষ্টা সবসময় করেছে। আর এ নির্বাচনের ফলাফল যখন শাসকগোষ্ঠী মানতে পারেনি তখনি বাঙালি জাতিকে একটি স্বাধীন দেশের স্বপ্ন দেখতে হয়েছে। আর এজন্য বাঙালি জাতির নিজের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নেয়। যার মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ, বাংলাদেশ।

[২৮] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ মার্চ ১৯৭১
[২৯] *ঐ*, ২৩ মার্চ ১৯৭১

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

সরকারি দলিলপত্র

১. *Census Report of Pakistan 1961,* Vol 2, East Pakistan

২. *Report on General Election Pakistan 1970-71,* Karachi, Election Commission, 1972

৩. *The Gazette of Pakistan, Extraordinary,* 19*70*

৪. *The Dacca Gazette, Extraordinary,* 1972

প্রকাশিত দলিলপত্র

১. *Bangladesh Documents*, Madras, The B.N.K. Press Private Ltd.

২. Ijazuddin, F.S edited, *The White House and Pakistan Secret Declassified Documents 1969-1974*, Oxford, Oxford University Press, 2002.

৩. Khan, Roedad, *The American Papers Secret and Confidential India-Pakistan-Bangladesh Documents 1965-1973*, Dhaka, UPL, 1999.

৪. পাকিস্তান তথ্য মন্ত্রণালয়, *শ্বেতপত্র*, ইসলামাবাদ, ১৯৭১।

৫. *বাংলাদেশ ডকুমেন্টস*, পাকিস্তান সরকারের বৈদেশিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত

৬. রহমান হাসান হাফিজুর সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, ঢাকা, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২।

দৈনিক পত্রিকা

১. *দৈনিক ইত্তেফাক*

২. *দৈনিক আজাদ*

৩. *দৈনিক পাকিস্তান*

৪. *দৈনিক পূর্বদেশ*

৫. *দৈনিক সংবাদ*

৬. *দৈনিক সংগ্রাম*

৭. *দৈনিক দি ডন*

৮. *দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার*

৯. *দৈনিক মর্নিং নিউজ*

ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ

১. Ahmed, A.F. Salahuddin, *Bengali Nationalism and the Emergence of Bangladesh*, Dhaka, UPL, 1994.

২. Ali, Shaikh Maqsood, *From East Bengal to Bangladesh*, Dhaka, UPL, 2009.

৩. Bhattacharjee, G.P., *Renaissance and Freedom Movement in Bangladesh*, Calcutta, The Minerva Associates, 1973.

৪. Bhuiyan, Md. Abdul Wadud, *Emergence of Bangladesh and Role of Awami League*, Dhaka, Panjeree Publication Ltd, 2008.

৫. Bhutto, Z.A. *The Great Tragedy*, Lahore, Classsic, 1971.

৬. Callard Keith, *Pakistan–A Political Study*, London, George Allen & Unwin Ltd, 1958.

৭. Chowdhury Najma, *The Legislative Process in Bangladesh: Politics and Functioning of the East Bengal Legislature 1947-58*, Dacca, University of Dacca, 1980.

৮. Chowdhury, A.K, *The Independence of East Bengal*, Dhaka, A.K. Chowdhury, 1984.

৯. Gupta, Joyoti Sen, *Histroy of Freedom Movement in Bangladesh 1943-1973*, Calcutta, Naya Prakash, 1974.

১০. Hossain, Kamal, *Bangladesh Quest for Freedom and Justice*, Dhaka, UPL, 2013.

১১. Jahan, Rounaq, *Pakistan: Failure in National Integration*, London, Columbia University Press, 1972.

১২. Kamal, Ahmed, *State Against the Nation The Decline of Muslim League in Pre-Independence Bangladesh, 1947-1954*, Dhaka, UPL, 2009.

১৩. Karim, Nehal, *The Emergence of Nationalism in Bangladesh*, Dhaka, University of Dhaka, 1992.

১৪. Khan, Iqbal Ansari, *The Third Eye*, Glimpses of Politics, Dhaka, UPL, 1991.

১৫. Khan, Mohammad Ayub, *Friends Not Masters: A Political Autobiography*, London, OUP, 1967.

১৬. Mahmood, Safdar, *Pakistan Divided*, New Delhi, Alpha Bravo.

১৭. Mannan, Mohammad Siraj, *The Muslim Political parties in Bengal 1936-1947*, Dhaka, Islamic Foundation of Bangladesh, 1987.

১৮. Momen Humaira, *Muslim Politics in Bengal: A Study of Krishak Praja Party and the Election of 1937*, Dacca, Sunuy House, 1972.

১৯. Moniruzzaman, Talukder, *Radical Politics and the Emergence of Bangladesh*, Dhaka, Bangladesh Book International, 1975.

২০. Qureshi, I. H., *The Struggle for Pakistan*, Karachi, 1965.

২১. Raghavan, Srinath, *1971: A Global History of the Creation of Bangladesh*, Himalayana, Permanent Black,2013.

২২. Rashid, Harun-or, *The Foreshadowing of Bangladesh*, Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 1987.

২৩. Sen, Ranglal, *Political Elite in Bangladesh*, Dhaka, UPL, 1986.

২৪. Sen, Shila, *Muslim Politics in Bengal 1937-1947*, New Delhi, India.

২৫. Shamsuddin, Abu Jafar, *Sociology of Bengal Politics*, Dacca, 1973.

২৬. Talukder, Moniruzzaman, *The Bangladesh Revolution and its aftermath*, Dhaka, UPL, 1988.

২৭. Umar, Badruddin, *The Emergence of Bangladesh*, 2 Vol., Oxford, Oxford University Press, 2006.

২৮. Zaheer, Hasan, *The Separation of East Pakistan The Rise and Realization of Bengali Muslim Nationalism*, Dhaka, UPL, 2001.

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ

১. আরেফিন, এ.এস.এম. সামছুল, *বাংলাদেশের নির্বাচন ১৯৭০-২০০১*, ঢাকা, বাংলাদেশ রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স, ২০০৩।

২. আযম, গোলাম, *জীবনে যা দেখলাম*, ঢাকা, কামিয়ার প্রকাশন, ২০০২।

Dhaka University Institutional Repository

৩. আলী, রাও ফরমান, *বাংলাদেশের জন্ম*, ঢাকা, ইউপিএল, ১৯৯৬।

৪. আসাদুজ্জামান, *অর্থনৈতিক বৈষম্য ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়*, ঢাকা, তরফদার প্রকাশনী, ২০০১।

৫. আহমেদ তোফায়েল, *উনসত্তরের গণআন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭।

৬. আহমেদ সিরাজ উদদীন, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, ঢাকা, ভাস্কর প্রকাশনী, ২০০১।

৭. আহমদ, আবুল মনসুর, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা, খোশরোজ কিতাবমহল, পুনমুদ্রণ ২০০৬।

৮. আহমদ, মওদুদ, *বাংলাদেশ: স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা*, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৯২।

৯. আহমদ, কামরুদ্দীন, *স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং অতঃপর*, ঢাকা, ধ্রুপদ সাহিত্যাঙ্গন, ২০০৬।

১০. আহমদ, কামরুদ্দীন, *পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০২।

১১. আহমদ, সালাহউদ্দীন ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস (১৯৪৭-১৯৭১)*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭।

১২. আহাদ, অলি, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫*, ঢাকা, খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৮২।

১৩. ইসলাম মযহারুল, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬।

১৪. ইসলাম, সিরাজুল সম্পাদিত, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, তিন খণ্ড, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯৩।

১৫. উমর বদরুদ্দীন, *পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, তিন খণ্ড, ঢাকা, সুবর্ণ, ২০১১।

১৬. উল্লাহ মাহবুব, *ষাটের দশকের ছাত্র রাজনীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, ঢাকা, জ্ঞান বিতরণী, ২০০১।

১৭. কাশেম, আবুল সম্পাদনা ও সংকলন, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও আওয়ামী লীগ ঐতিহাসিক দলিল*, ঢাকা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০১।

১৮. কামাল, মেসবাহ, *আসাদ ও উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান*, ঢাকা, বিবর্তন, ১৯৮৬।

১৯. কাওছার, এবিএম রিয়াজুল কবীর, *বাংলাদেশ নির্বাচন (১৯৪৭-২০০৬)*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ২০০৬।

২০. কাদির, মোহাম্মদ নুরুল, *দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা*, ঢাকা, মুক্ত প্রকাশনী, ১৯৯৭।

২১. খালেক, আব্দুল, *ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ২০১০।

২২. খান, আতাউর রহমান, *স্বৈরাচারের দশ বছর*, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭০।

২৩. খান, আতাউর রহমান, *ওজারতির দুই বছর*, ঢাকা, অভিজিৎ প্রিন্টিং হাউস, ১৯৬৮।

২৪. খান, ইসরাইল, *পূর্ববাঙলার সাময়িকপত্র ১৯৪৭-৭১*, ঢাকা, ১৯৯৯।

২৫. খান, আবু সাঈদ, *শ্লোগানে শ্লোগানে রাজনীতি*, ঢাকা, অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০৮।

২৬. ঘোষ, শ্যামলী, হাবীব-উল-আলম অনুদিত, *আওয়ামী লীগ ১৯৪৯-১৯৭১*, ঢাকা, ইউপিএল, ২০০৭।

২৭. চৌধুরী, আবদুল গাফফার, *বাংলাদেশ কথা কয়*, ঢাকা, মুক্তধারা, ১৯৯১।

Dhaka University Institutional Repository

২৮. চৌধুরী, মিজানুর রহমান, *রাজনীতির তিনকাল*, ঢাকা, হাফেজ মাহমুদা ফাউন্ডেশন, ২০০১।

২৯. চৌধুরী, জি ডব্লিউ, সিদ্দীক সালাম অনুদিত, *অখণ্ড পাকিস্তানের শেষ দিনগুলি*, ঢাকা, হক কথা প্রকাশনী, ১৯৯১।

৩০. জাহাঙ্গীর, বোরহান উদ্দিন খান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং পাকিস্তান: পাকিস্তান সরকারের শ্বেতপত্র*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩।

৩১. জাহান, মোঃ এমরান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস ও সংবাদপত্র*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০৮।

৩২. তালুকদার, আবদুল ওয়াহেদ, *৭০ থেকে ৯০ বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট*, ঢাকা, পাণ্ডুলিপি, ১৯৯১।

৩৩. ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত, *ছয়দফা থেকে বাংলাদেশ*, ঢাকা, হাক্কানী পাবলিশার্স।

৩৪. ধর, সুব্রত শংকর, *বাংলাদেশের সংবাদপত্র*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।

৩৫. নিয়াজি, লে. জে. এ. এ. কে, *দ্য বিট্রেয়াল অব ইস্ট পাকিস্তান*, ঢাকা, আফসার ব্রাদার্স, ২০০৮।

৩৬. বেগম, সাহিদা, *আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলন*, ঢাকা, মুন্নী প্রকাশনী, ১৯৯৯।

৩৭. ভট্টাচার্য্য, গৌরীপদ, *মুজিবর রহমান ও আওয়ামী লীগ*, কলকাতা, পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা সম্প্রীতি সমিতি।

৩৮. ম্যাসকারেনহাস, এ্যান্থনী, অনুবাদ ড. মযহারুল ইসলাম, *বাংলাদেশ লাঞ্ছিতা*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩।

৩৯. মুকুল, এম. আর আখতার, *চল্লিশ থেকে একাত্তর*, ঢাকা, সাগর পাবলিশার্স, ১৯৯০।

৪০. মুকুল, এম. আর আখতার, *ভাসানী মুজিবের রাজনীতি*, ঢাকা, সাগর পাবলিশার্স, ১৯৮৯।

৪১. মুহিত, আবুল মাল আবদুল, *বাংলাদেশ: জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব*, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ২০০০।

৪২. মিয়া, এম এ ওয়াজেদ, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ*, ঢাকা, ইউপিএল, ১৯৯৭।

৪৩. রহমান, আতিউর, *অসহযোগের দিনগুলি: মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব*, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৪।

৪৪. রহমান, মাহফুজুর সম্পাদিত, *বাঙালির জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম*, মুক্তিযুদ্ধে চট্রগ্রাম, চট্রগ্রাম, ১৯৯৩।

৪৫. রহমান, জিবলু, *১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান ও মওলানা ভাসানী*, ঢাকা, শুভ প্রকাশ, ২০০৪।

৪৬. রহমান, মো: মাহবুবর, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১*, ঢাকা, সময় প্রকাশন, ১৯৯৯।

৪৭. রহমান, মো: শফিকুর, *জাতীয় রাজনীতি: শেরে বাংলা থেকে বঙ্গবন্ধু*, ঢাকা, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ১৯৯১।

৪৮. রহমান, মোহাম্মদ হাবিবুর, *বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও শেখ মুজিব*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯১।

৪৯. রহিম, মুহম্মদ আবদুর, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭)*, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০০২।

৫০. সরকার, মোনায়েম সম্পাদিত, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান: জীবন ও রাজনীতি*, দুই খণ্ড, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০৮।

৫১. সাঈদ, আবু আল, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস (১৯৪৯-১৯৭১)*, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৩।

৫২. সাঈদ, আবু আল, *সাতচল্লিশের অখণ্ড বাংলা আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯।

৫৩. সিদ্দিকী, রেজোয়ান, *উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান সংবাদপত্রে প্রতিফলন*, ঢাকা, বাংলাদেশ প্রেস ইন্সটিটিউট, ২০০৮।

৫৪. স্বপন, সিদ্দিকুর রহমান, *বাংলাদেশের গণ-আন্দোলন স্লোগান প্ল্যাকার্ড ও পোস্টার*, ঢাকা, সুবর্ণ, ২০০৮।

৫৫. হক, আবদুল, *লেখকের রোজনামচা চার দশকের রাজনীতি*, নুরুল হুদা সম্পাদিত, ঢাকা, ইউপিএল, ১৯৯৩।

৫৬. হক, মুহাম্মদ ইনাম-উল, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন* ১৭০৭-১৯৪৭, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫।

৫৭. হাননান, মোহাম্মদ, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, কলকাতা, এ হাকিম এন্ড সন্স, ১৯৯৪।

৫৮. হাননান, মোহাম্মদ, *ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস (১৮৩০-১৯৭১)*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯।

৫৯. হাসান, মোরশেদ শফিউল, *স্বাধীনতার পটভূমি: ১৯৬০ দশক*, ঢাকা অনুপম প্রকাশনী, ২০১১।

৬০. হোসেন, কামাল, *স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা* ১৯৬৬-১৯৭১, ঢাকা অংকুর প্রকাশনী, ১৯৯৪।

৬১. হোসেন, তফাজ্জল মানিক মিয়া, *পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর*, ঢাকা, বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল লি, ১৯৮১।

৬২. হোসেন, শাহ মোয়াজ্জেম, *বলেছি বলছি বলব*, ঢাকা, লেখক, ২০০২।

বাংলা প্রবন্ধ

১. ইসলাম, মোঃ আনোয়ারুল, "১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়", *আইবিএস জার্নাল*, ১৪০৪-১৪০৫, রাজশাহী।

২. রেজা, এস. এম. রেজাউল করিম, "১৯৪৬ সালের নির্বাচন: পূর্ববাংলার প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি", *বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, সংখ্যা ২৭-২৮, ১৪০৯-১১, ২০০৫।

৩. হোসেন, আবু মোঃ দেলোয়ার ও এস. এম. রেজাউল করিম, "১৯৫৪ সালের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ইশতাহার ও পূর্ব বাংলায় এর প্রতিক্রিয়া", *সমাজ নিরীক্ষণ*, ঢাকা, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, নং ৮৭, ২০০৩।

ইংরজি প্রবন্ধ

১ Akanda, S. A, "Was Parliamentary System of Government a Failure in Pakistan? A Case Study of a Constitutional Debate in Pakistan during Martial Law, 1958-1962" *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies*, Vol. VI, 1982-1983. P. 163

২. Akanda, S. A, "The Working of the Ayub Constitution and the People of Bangladesh", *The Journal of the Institute of Bangladesh Stueies*, Vol. IV, (1979-80)

৩. Baxter, Craig, "Pakistan Votes-1970", *Asian Survey*, March 1971, Vol. XI

৪. Bhattacharya, Asit, "Pakistan Election: Prospect and Problems", *Mainstream*, Vol. VIII, August 1970.

৫.Morshed, G, "Pakistan's 1970 Election and the Liberation of Bangladesh: A Political Analysis", *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies*, Vol. XI, 1988.

৬. Mujahid Sharif, "Pakistan: First General Election", *Asian Survey*, Vol. XI, 1971.

৭. Mujahid Sharif, "Pakistan's First Presidential Election", *Asian Survey*, Vol. V, 1965.

৮.Rashiduzzaman M, "The Awami League in the Political Development of Pakistan", *Asian Survey*, Vol. X 7, 1970.

অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ

১. আক্তার দিল আরা, *১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূতিকাগার*, এমফিল অভিসন্দর্ভ, ঢাকা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১।

২. খাতুন মোছাঃ খোদেজা, *১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা*, এমফিল অভিসন্দর্ভ, ঢাকা, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১।

৩. রায় বীনা রাণী, *বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নারী ১৯৪৭-১৯৭১*, এমফিল অভিসন্দর্ভ, ঢাকা, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়, ২০০৩।

৪. সিদ্দিকী মোঃ খায়রুল আহসান, *বাংলাদেশের রাজনীতি ১৯৫৩-১৯৬৬*, পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৬।

৫. হাসান সৈয়দ ওয়াকিল, *বাংলাদেশের বাম রাজনীতি ও মওলানা ভাসানী*, এমফিল অভিসন্দর্ভ, ঢাকা, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৬।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১

১৯৩৭ সালের নির্বাচনের ফলাফল

(ক) নির্বাচনে মুসলিম আসনের ফলাফল

রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত আসন	প্রাপ্ত শতকরা হার
মুসলিম লীগ	৩৫	২৯.৯১
স্বতন্ত্র (মুসলিম)	৪১	৩৫.০৪
ত্রিপুরা কৃষক সমিতি	৫	৪.২৭
কৃষক প্রজা পার্টি	৩৬	৩০.৭৬
মোট		**৯৯.৯৮**

সূত্রঃ Harun-or-Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh Bengal Muslim League and Muslim Politics 1936-1947*, Dhaka, ASB, 1987, p. 82

(খ) নির্বাচনে মুসলিম আসনে জেলাভিত্তিক ফলাফল

	বিভিন্ন দলের প্রাপ্ত আসন				
জেলার নাম	**মুসলিম লীগ**	**কৃষক প্রজা পার্টি**	**ত্রিপুরা কৃষক সমিতি**	**স্বতন্ত্র**	**মোট আসন**
বর্ধন	-	-	-	১	১
বীরভূম	-	১	-	-	১
বানকুরা	১	-	-	-	১
মেদিনীপুর	-	-	-	১	১
হুগলী	১	-	-	১	২
হাওড়া	-	-	-	১	১
চব্বিশ পরগনা	৩	-	-	১	৪
কুষ্টিয়া	-	১	-	১	২
মুর্শিদাবাদ	-	-	-	৩	৩
যশোর	১	২	-	১	৪
খুলনা	-	৩	-	-	৩
রাজশাহী	-	২	-	৩	৫
দিনাজপুর	১	-	-	২	৩
রংপুর	৫	২	-	-	৭
জলপাইগুড়ি	-	-	-	১	১
বগুড়া	১	২	-	১	৪
পাবনা	১	-	-	৪	৫
মালদহ	-	১	-	১	২
ঢাকা	৮	১	-	১	১০

ময়মনসিংহ	৪	৭	-	৫	১৬
ফরিদপুর	২	৩	-	১	৬
বরিশাল	-	৭	-	২	৯
ত্রিপুরা	২	-	৫	৩	১০
নোয়াখালী	১	২	৩	৬	১২
চট্টগ্রাম	১	১	-	৩	৫
কলকাতা	৩	-	-	-	৩
মোট	**৩৫**	**৩৬**	**৫**	**৮১**	**১১৭**

সূত্রঃ Harun-or-Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh Bengal Muslim League and Muslim Politics 1936-1947*, Dhaka, ASB, 1987, p. 83

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২

১৯৪৬ সালের নির্বাচনের ফলাফল

বঙ্গীয় আইন পরিষদের নির্বাচনে ২৫০টি আসনের ফলাফল, ১৯৪৬

ক্রমিক নং	রাজনৈতিক দল	প্রাপ্ত আসন
১	মুসলিম লীগ	১১৪
২	কংগ্রেস	৮৬
৩	ইউরোপীয়ান	২৫
৪	কৃষক প্রজা পার্টি	৪
৫	এ্যাংলো ইন্ডিয়ান	৪
৬	কমিউনিস্ট পার্টি	৩
৭	ভারতীয় খ্রিস্টান	২
৮	হিন্দু মহাসভা	২
৯	ইমারত পার্টি	১
১০	ক্ষত্রিয় সমিতি	১
১১	তফসিলি ফেডারেশন	১
১২	হিন্দু স্বতন্ত্র	৬
১৩	মুসলিম স্বতন্ত্র	২
	মোট	**২৫০**

সূত্রঃ Harun-or-Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh Bengal Muslim League and Muslim Politics 1936-1947*, Dhaka, ASB, 1987, p. 230

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৩

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফল

(ক) ৭২টি অমুসলমান আসনের ফলাফল

রাজনৈতিক দল	প্রাপ্ত আসন
পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস	২৪
তফসিলি ফেডারেশন	২৭ (রসরাজ মন্ডল গ্রুপ)
সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট	১৩ (গণতন্ত্রী দল ৩টি)
কমিউনিস্ট পার্টি	৪
বৌদ্ধ	২
খ্রিস্টান	২
স্বতন্ত্র	১
মোট	**৭২**

সূত্রঃ *দৈনিক আজাদ*, ২ এপ্রিল ১৯৫৪

(খ) ২৩৭ টি মুসলমান আসনের ফলাফল

রাজনৈতিক দল	প্রাপ্ত আসন
যুক্তফ্রন্ট	২১৫
মুসলিম লীগ	৯
খেলাফতে রব্বানী পার্টি	১
স্বতন্ত্র	১২
মোট	**২৩৭**

সূত্রঃ *দৈনিক আজাদ*, ২ এপ্রিল ১৯৫৪

Dhaka University Institutional Repository

(গ) জেলাভিত্তিক ফলাফল

ক্রমিক নং	জেলা	মোট আসন	যুক্তফ্রন্ট	মুসলিম লীগ	রব্বানী পার্টি	স্বতন্ত্র
১	দিনাজপুর	৬	৬	-	-	-
২	রংপুর	১৬	১১	-৪-	-	-
৩	বগুড়া	৮	৮	-	-	-
৪	রাজশাহী	১৩	১২	-	-	-
৫	পাবনা	৯	৯	-	-	-
৬	কুষ্টিয়া	৬	৬	-	-	-
৭	যশোর	৮	৭	১	-	-
৮	খুলনা	৮	৮	-	-	-
৯	বাকেরগঞ্জ	২০	১৯	-	-	১
১০	ফরিদপুর	১৪	১৪	-	-	-
১১	ঢাকা	২৩	২৩	-	-	-
১২	মোমেনশাহী	৩৪	৩৪	-	-	-
১৩	সিলেট	১৫	১১	২	১	১
১৪	ত্রিপুরা	২২	১৫	২	-	৫
১৫	নোয়াখালী	১৩	১২	-	-	১
১৬	চট্টগ্রাম	১৩	১১	-	-	২
	মহিলা	৯	৯	-	-	-
	মোট	**২৩৭**	**২১৫**	**৯**	**১**	**১২**

সূত্রঃ *দৈনিক আজাদ*, ২৪ মার্চ; ২৫ মার্চ ও ২ এপ্রিল ১৯৫৪

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৪

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের ২১দফা

১. বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হইবে।

২. বিনাক্ষতিপূরণে জমিদারী ও সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করিয়া ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে জমি বিতরণ করা হইবে এবং উচ্চহারের খাজনা হ্রাস করা হইবে। সার্টিফিকেট প্রথা রহিত করা হইবে।

৩. পাট ব্যবসার জাতীয়করণ। পাটের ন্যায্য মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে এবং লীগ মন্ত্রীসভার আমলের পাট কেলেঙ্কারির তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট সকলের শাস্তির ব্যবস্থা ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

৪. সমবায় কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন। সকল প্রকার কুটির ও হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন।

৫. পূর্ববঙ্গকে লবণ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার জন্য লবণ তৈয়ারির কারখানা স্থাপন। লবণ কেলেঙ্কারি সম্পর্কে তদন্ত।

৬. শিল্পী ও কারিগর শ্রেণীর গরীব মোহাজেরদের কাজের আশু ব্যবস্থা ও তাহাদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা।

৭. খালখনন ও সেচের ব্যবস্থা করিয়া দেশকে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের কবল হইতে রক্ষার ব্যবস্থা।

৮. পূর্ববঙ্গকে শিল্পায়িতকরণ। শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক এবং সকল প্রকার অধিকার প্রতিষ্ঠিতকরণ।

৯. প্রাথমিক অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন। শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা।

১০. শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধন। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা।

১১. ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিক্রিয়াশীল কানুন বাতিল ও রহিতপূর্বক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা।

১২. শাসন ব্যয় সর্বাত্মকভাবে হ্রাস করা। উচ্চ বেতনভোগী সরকারী কর্মচারীদের বেতন হ্রাস ও নিম্ন বেতনভোগীদের বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা।

১৩. দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, ঘুষ, রিশওয়াত বন্ধ করা। এতদুদ্দেশ্যে সরকারী ও বেসরকারী পদাধিকারীর ও ব্যবসায়ীর ১৯৪০ সাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত মুদ্দতের আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ।

১৪. জননিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি কালাকানুন রদ ও রহিতকরণ বিনাবিচারে আটক সমস্ত বন্দীকে মুক্তিদান। সংবাদপত্র ও সভাসমিতি করিবার অধিকার অবাধ ও নিরঙ্কুশকরণ।

১৫. বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগকে পৃথককরণ।

১৬. বর্ধমান হাউসকে আপাতত ছাত্রাবাস ও পরে বাংলাভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা।

১৭. বাংলা রাষ্ট্রভাষার দাবীতে শহীদানের পবিত্র স্মৃতির চিহ্নস্বরূপ ঘটনাস্থলে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ এবং তাহাদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দান।

১৮. ২১শে ফেব্রুয়ারীকে শহীদ দিবস ঘোষণা করা ও উহাকে সরকারী ছুটির দিন ঘোষণা করা।

১৯. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে, পূর্ববঙ্গকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌমকরণ এবং দেশরক্ষা,পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত বিষয় (অবশিষ্টাত্মক ক্ষমতা) পূর্ববঙ্গের হাতে আনয়ন। দেশরক্ষা বিভাগের স্থলবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পশ্চিম

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানে ও নৌবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন এবং পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্রকারখানা স্থাপন। বর্তমানের আনসার বাহিনীকে সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত করা হইবে।

২০. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা কোনো অজুহাতেই আইন পরিষদের আয়ু বাড়াইবে না। আইন পরিষদের আয়ু শেষ হওয়ার ছয়মাস পূর্বে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়া নির্বাচন কমিশনের মারফত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থাকরণ।

২১. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভার আমলে যখন যে আসন শূন্য হইবে, তিন মাসের মধ্যে তাহা পূরণের জন্য উপনির্বাচনের ব্যবস্থাকরণ এবং পর পর তিনটি উপনির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী পরাজিত হইলে মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিবে।

সূত্রঃ হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২, পৃ. ৪৫৫-৪৫৭

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৫

জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে বিদায়ী প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খানের পত্র

প্রেসিডেন্ট হাউস

২৪শে মার্চ, ১৯৬৯

প্রিয় জেনারেল ইয়াহিয়া,

অতীব দুঃখের সহিত আমাকে এই সিদ্ধান্তে আসিতে হইয়াছে যে, দেশের সমুদয় বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা ও নিয়মতান্ত্রিক কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ অচল হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমান উদ্বেগজনক মাত্রায় অবস্থার যদি অবনতি ঘটিতে থাকে, তাহা হইলে দেশের অর্থনৈতিক জীবনধারা তথা সভ্য জীবনের অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

এমতাবস্থায় ক্ষমতার আসন হইতে নামিয়া যাওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর দেখিতেছি না। তাই আমি পাকিস্তানের দেশরক্ষা বাহিনীর হস্তে দেশের পূর্ণ কর্তৃত্ব ন্যস্ত করিয়া যাওয়ার সাব্যস্ত করিয়াছি; কেননা, সামরিক বাহিনীই দেশের আজিকার একমাত্র কর্মক্ষম ও আইনানুগ যন্ত্র।

আল্লার মেহেরবাণীতে আমাদের সেনাবাহিনী পরিস্থিতির মোকাবিলা করিয়া দেশকে চরম বিশৃংখলা ও সর্বাত্মক ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম। কেবল তাঁহারাই দেশের বুকে শুভবুদ্ধির উন্মেষ ঘটাইয়া বেসামরিক ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরায় অগ্রগতির পথে আগাইয়া যাইতে সাহায্য করিতে পারেন।

"কতিপয় লোক আমার নিকট প্রস্তাব করেন যে, যদি সমুদয় দাবি মানিয়া নেওয়া হয়, তাহা হইলে দেশে শান্তি ফিরিয়া আসিবে। আমি তাহাদের জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কোন দেশে? এই সকল দাবী মানিয়া নেওয়া হইলে পাকিস্তান ধ্বংস হইয়া যাইত।

আমি সর্বদা আপনাকে বলিয়াছি যে, শক্তিশালী কেন্দ্রের মধ্যেই পাকিস্তানের মুক্তি নিহিত রহিয়াছে। আমি এই জন্য পার্লামেন্টারী শাসন-ব্যবস্থা মানিয়া নিয়াছিলাম যে, এই পদ্ধতিতে শক্তিশালী কেন্দ্র বজায় রাখার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু এক্ষণে বলা হইতেছে যে, দেশ দুইটি অংশে বিভক্ত হইবে এবং কেন্দ্র ক্ষমতাহীন সংস্থায় পরিণত হইবে।

"প্রতিরক্ষা বাহিনী পঙ্গু হইয়া উঠিবে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক সত্তা বিলোপ করা হইবে। আমাদের ধ্বংস করিয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে পৌরোহিত্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

"আমার জীবনের বিরাট আশা বাস্তবায়িত হইতে পারিল না দেখিয়া আমি ব্যথিত। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর অব্যাহত করবার ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করাই ছিল আমার কামনা। (এখানে কিয়দংশ পাওয়া যায় নাই)

Dhaka University Institutional Repository

"দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। শ্রমিকদের উস্কানি দেওয়া হইতেছে এবং অরাজকতাপূর্ণ ও নিষ্ঠুর কাজ করার জন্য বলা হইতেছে। এদিকে হিংসাত্মক হুমকি প্রদর্শন করিয়া অধিক বেতন, মজুরী ও সুযোগ-সুবিধার দাবী আদায় করা হইতেছে। উৎপাদন হ্রাস পাইতাছে এবং রফতানী গুরুতরভাবে কমিয়া যাইতেছে। শীঘ্রই দেশে গুরুতর মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে বলিয়া আমার আশঙ্কা হয়।

"যাঁহারা গণআন্দোলনের আড়ালে থাকিয়া গত কয়েক মাস যাবৎ দেশের মূলে আঘাত হানিয়াছেন, তাহাদের বেপরোয়া আচরণের দরুন এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। দুঃখের বিষয়, বহু সংখ্যক নিরীহ লোক তাহাদের দুরভিসন্ধির শিকারে পরিণত হয়।

"সকল অবস্থায় সাধ্যমত আমি জনসাধারণের খেদমত করিয়াছি। নিশ্চয়ই কিছু কিছু ভুল-ত্রুটি হইয়াছে, তবে সাফল্যও নেহাৎ নগণ্য নয়। আমি যাহা কিছু সম্পাদন করিয়াছি, এমনকি আমার পূর্বেকার সরকারসমূহ যাহা সম্পাদন করিয়াছেন, অনেকে তাহা নিশ্চিহ্ন করিতে চাহে। তবে সবচাইতে মর্মান্তিক ও হৃদয় বিদারক ব্যাপার এই যে, কতিপয় ব্যক্তি এমনকি কায়েদে আজমের কীর্তি পাকিস্তান বিনষ্ট করিতে ইচ্ছুক।

"বর্তমান সঙ্কট নিরসনের জন্য আমি সম্ভাব্য সর্বপ্রকার বেসামরিক ও শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়াছি। জনগণের নেতা বলিয়া গণ্য সকলের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হওয়ার জন্য আমি প্রস্তাব দেই। ইহাদের মধ্যে অনেকে সম্প্রতি সম্মেলনে যোগদান করেন, তবে তাঁহাদের পূর্বশর্ত মানিয়া নেওয়ার পরই তাঁহারা উহাতে যোগদান করেন। অনেকে সম্মেলনে যোগদান করিতে অসম্মত হন। কেন উহা তাঁহারাই ভাল জানেন।

"একটি সর্বসম্মত ফর্মূলা উদ্ভাবনের জন্য আমি তাঁহাদের অনুরোধ জানাই। কিন্তু কয়েকদিনব্যাপী আলোচনার পরও তাঁহারা এ ব্যাপারে ব্যর্থ হন। অবশেষে তাহারা দুটি প্রশ্নে একমত হন এবং আমিও উহার দুইটিই মানিয়া লই। প্রত্যক্ষ সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হওয়ার পর জন-প্রতিনিধিদের নিকট অমীমাংসিত প্রশ্নসমূহ পেশ করার জন্য অতঃপর আমি প্রস্তাব দেই। আমার যুক্তি ছিল যে, সম্মেলনে যোগদানকারী ডেলিগেটগণ জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হয় নাই বলিয়া যে সকল প্রশ্নে তাঁহারা নিজেরা একমত হন, সে সকল বিষয়সহ সমুদয় বেসামরিক ও শাসনতান্ত্রিক প্রশ্ন সম্পর্কে তাঁহারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন না।

"দুইটি সর্বসম্মত প্রস্তাব বিবেচনার জন্য জাতীয় পরিষদের বৈঠক আহবান করার কথা আমি চিন্তা করি। কিন্তু শীঘ্রই সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, উহা নিরর্থক হইবে। পরিষদের সদস্যের আর স্বাধীন প্রতিনিধি থাকিতেছেন না এবং দুইটি সর্বসম্মত প্রশ্ন গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। বস্তুতঃ সদস্যদের প্রতি হুমকি দেওয়া হইতেছে এবং অধিবেশন বর্জন অথবা তাহাদের এমন সব সংশোধনী উত্থাপনের জন্য বাধ্য করা হইতেছে যাহার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত সশস্ত্র বাহিনী বজায় রাখা অসম্ভব। দেশের অর্থনীতি বিভক্ত এবং পাকিস্তান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইত। এই ধরনের বিশৃংখল অবস্থায় পরিষদ আহবান করা হইলে পরিস্থিতি খারাপ হইয়া উঠিত। ক্রমাগত হিংসাত্মক কাজের হুমকির মধ্যে কাহারও পক্ষে কি মৌলিক সমস্যা সম্পূর্ণ শান্তভাবে আলোচনা করা সম্ভব?

"বর্তমান জটিল পরিস্থিতির মোকাবিলা করা বেসামরিক সরকারের সাধ্যাতীত। কাজেই প্রতিরক্ষা বাহিনীকে অগ্রসর হইতে হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

"শুধু বাইরের আক্রমণই নয়, আভ্যন্তরীণ আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করাও আপনাদের আইনগত এবং শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব। দেশের নিরাপত্তা এবং অখণ্ডতা রক্ষা এবং স্বাভাবিক সামাজিক, অর্থনৈতিক, ও প্রশাসনিক জীবন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আপনি এই দায়িত্ব পালন করিবেন বলিয়া জাতি আশা করে। ১২ কোটি মানুষের এই দুঃখের রাজ্যে শান্তি ও সমৃদ্ধি ফিরিয়া আসুক।

"আমি বিশ্বাস করি যে, দেশের বিরাট সমস্যার মোকাবিলা করার মত সামর্থ্য, দেশপ্রেম, শিক্ষা ও কল্পনা শক্তি আপনার রহিয়াছে। আপনি এমন এক বাহিনীর নেতা যে বাহিনী গোটা বিশ্বের সম্মান ও প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। পাকিস্তান বিমান বাহিনী এবং পাকিস্তান নৌ বাহিনীতে আপনার সহকর্মীরা সম্মানের অধিকারী এবং আমি জানি যে, আপনি সর্বদা তাহাদের পুর্ণ সমর্থন লাভ করিবেন। পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীকে অবশ্যই পাকিস্তানকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

"আপনি যদি প্রত্যেক সৈনিক নাবিক ও বৈমানিককে জানান যে, এককালে তাহাদের সর্বাধিনায়ক হিসাবে থাকার জন্য আমি গর্ববোধ করিব তাহা হইলে আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব। তাহাদেরকে মনে রাখিতে হইবে যে, এই সংকটজনক মুহূর্তে তাহাদেরকে পাকিস্তানের রক্ষক ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে ইসলামের নীতি অনুযায়ী তাহাদের আচরণ করিতে হইবে।

এত দীর্ঘকাল সাহসী পাকিস্তানবাসীর সেবা করা একটি বিরাট সম্মান। "অকৃত্রিম আনুগত্যের জন্য আমি অবশ্যই আপনার প্রশংসা করিব। আমি জানি দেশপ্রেম সর্বদা আপনার জীবনে উৎসাহের উৎস ছিল। আপনার সাফল্য এবং আমার দেশের জনগণের কল্যাণ ও সুখ-সমৃদ্ধির জন্য আমি প্রার্থনা করি।

খোদা হাফিজ
আপনার বিশ্বস্ত
(স্বাং) এম.এ.খান

সূত্রঃ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৬ ও ২৭ মার্চ ১৯৬৯

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৬

আইনগত কাঠামো আদেশ

যেহেতু,

১৯৬৯ সালের ২৬ মার্চ জাতির উদ্দেশ্যে তাঁর প্রথম ভাষণে প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক দেশে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংকল্প ঘোষণা করেন।

এবং যেহেতু,

১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর, জাতির উদ্দেশ্যে তাঁর ভাষণে, তিনি এই সংকল্পের পুনরাবৃত্তি করেন এবং ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানের একটি জাতীয় পরিষদ নির্বাচিত করার জন্য সাধারণ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ ১৯৭০ সালের ৫ই অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে।

এবং যেহেতু,

এরপর তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, প্রাদেশিক পরিষদসমূহের নির্বাচনের ভোট গ্রহণও ১৯৭০ সালের ২২ অক্টোবরের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে।

এবং যেহেতু,

প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণ প্রতিনিধিদের নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ভোটার তালিকা তৈরির জন্য ভোটার তালিকা আদেশ (১৯৬৯)- এ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

এবং যেহেতু,

এই আদেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র তৈরির উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় পরিষদ গঠন এবং প্রতিটি প্রদেশের জন্য একটি করে প্রাদেশিক পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

সুতরাং

১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চের ঘোষণা মোতাবেক এবং এই ঘোষণায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিম্নলিখিত আদেশ জারী করেছেন।:

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এবং আদেশ বলবৎ হওয়ার তারিখঃ

১. (১) এই আদেশ আইন কাঠামো আদেশ, ১৯৭০ সাল বলে অভিহিত হবে।

২. (২) সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রেসিডেন্টের নির্দেশিত তারিখে এই আদেশ বলবৎ হবে।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য আইনের উপর প্রাধান্য

২. প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র আদেশ, পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র কিংবা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে এই আদেশের বিপরীত কিছু থাকলেও তা অগ্রাহ্য করে এই আদেশ বলবৎ হবে।

৩. (১) এই আদেশে, বিষয় কিংবা প্রসঙ্গের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ না হলে;

ক) 'পরিষদ' অর্থ হবে এই আদেশে উদ্দিষ্ট পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে কিংবা কোন প্রদেশের প্রাদেশিক পরিষদ;

খ) 'কমিশন' অর্থ হবে ৮ নম্বর অনুচ্ছেদের অধীনে গঠিত নির্বাচন কমিশন,

গ) 'কমিশনার' অর্থ হবে ভোটার তালিকা আদেশ, ১৯৬৯ সাল (১৯৬৯ সালের পি.ও নম্বর ৬)- এর অধীনে নিযুক্ত কিংবা নিযুক্ত বলে গণ্য প্রধান নির্বাচন কমিশনার;

ঘ) 'ভোটার তালিকা' অর্থ হবে ভোটার তালিকা আদেশ ১৯৬৯ (১৯৬৯ সালের পি.ও নম্বর ৬) এর অধীনে তৈরি ভোটার তালিকা;

ঙ) 'সদস্য' অর্থ হবে কোন পরিষদের সদস্য;

চ) 'স্পীকার' অর্থ হবে কোন জাতীয় পরিষদের স্পীকার এবং

ছ) "কেন্দ্র শাসিত উপজাতীয় এলাকার" কথাটি পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশ (বাতিল) আদেশ, ১৯৭০-এ ব্যবহৃত অর্থেই প্রযুক্ত হবে।

(২) এই আদেশ বলবৎ হওয়ার সময় পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশে অর্ন্তভুক্ত এলাকাগুলোর প্রসঙ্গে, কোন 'প্রদেশ' কিংবা 'প্রাদেশিক পরিষদ' এর উল্লেখ করা হলে তার অর্থ হবে, যথাক্রমে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রদেশ (বাতিল) আদেশ, ১৯৭০ এর অধীনে গঠিত কোন একটি নতুন প্রদেশ এবং এরকম প্রদেশের প্রাদেশিক পরিষদ।

জাতীয় পরিষদ গঠন

৪।(১) পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ ৩১৩ সদস্য বিশিষ্ট হবে। এর মধ্যে ৩০০ হবে সাধারণ আসন এবং ১৩টি হবে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন।

(২) ১৯৬১ সালের আদমশুমারী মোতাবেক জাতীয় পরিষদের আসন সংখ্যা ১ নম্বর তালিকায় বর্ণিত প্রদেশসমূহ কেন্দ্রশাসিত উপজাতীয় এলাকাসমূহের মধ্যে বন্টন করা হবে।

(৩) (১) নম্বর ধারায় একজন মহিলাকে একটি সাধারণ আসনে নির্বাচনের অযোগ্য গণ্য করা হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাদেশিক পরিষদ সমূহের গঠন

৫। (১) প্রত্যেক প্রদেশের জন্য একটি প্রাদেশিক পরিষদ গঠিত হবে। ২ নম্বর তালিকা মোতাবেক প্রতিটি প্রদেশে সাধারণ আসন ও মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত সদস্যদের মোট সংখ্যাই হবে সেই প্রদেশের প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য সংখ্যা।

(২) (১) নম্বর ধারায় একজন মহিলাকে একটি সাধারণ আসনে নির্বাচনের অযোগ্য গণ্য করা হয়নি।

নির্বাচনের রীতি

৬। (১) নিম্নে (২) এ বর্ণিত ক্ষেত্র ছাড়া, সাধারণ আসনসমূহের সদস্যরা প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকা থেকে আইনানুসারে নির্বাচিত হবেন।

(২) প্রেসিডেন্ট আইন জারী করে, কেন্দ্র শাসিত উপজাতীয় এলাকাসমূহের সদস্যদের নির্বাচনের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

(৩) জাতীয় পরিষদ সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর, যত শীঘ্রই সম্ভব, সাধারণ আসনে নির্বাচিত একটি প্রদেশের জাতীয় পরিষদের সদস্যরা জাতীয় পরিষদের মহিলা সদস্যদেরকে আইনানুসারে নির্বাচিত করবেন।

(৪) একটি প্রাদেশিক পরিষদের মহিলা সংরক্ষিত আসনগুলোর মহিলা সদস্যরাও সেই পরিষদের সাধারণ নির্বাচিত সদস্যসমূহ কর্তৃক আইন অনুসারে নির্বাচিত হবে।

আকস্মিক আসন খালি

৭। জাতীয় পরিষদের কোন আসন খালি হলে, আসন খালি হওয়ার তিন সপ্তাহের মধ্যে তা পূরণের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশনার

৮। একটি পরিষদের সদস্যদের নির্বাচনের উদ্দেশ্যে এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করবেন যাতে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিরা থাকবেন–

(ক) কমিশনার যিনি কমিশনের চেয়ারম্যান থাকবেন, এবং

(খ) অন্য দুইজন সদস্য - যাদের প্রত্যেকেই হচ্ছেন হাইকোর্টের একজন স্থায়ী বিচারপতি।

সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

৯।(১) নিম্নবর্ণিত (২) নম্বর ধারা সাপেক্ষে কোন ব্যক্তি একজন সদস্য হিসেবে নির্বাচনের যোগ্য এবং সদস্য হওয়ার যোগ্য হবেন, যদি

Dhaka University Institutional Repository

(ক) তিনি পাকিস্তানের নাগরিক হন।

(খ) তার বয়স কমপক্ষে ২৫ বছর হয়।

(গ) যে প্রদেশ কিংবা কেন্দ্রশাসিত যে উপজাতীয় এলাকা থেকে তিনি নির্বাচিত হতে চাচ্ছেন তার অন্তর্গত যে কোন নির্বাচনী এলাকার ভোটার তালিকায় তার নাম থাকে।

(২) কোন ব্যক্তি সদস্য হিসেবে নির্বাচনের এবং সদস্য হওয়ার অযোগ্য হবেন, যদি

(ক) তিনি মানসিক অসুস্থতায় ভোগেন এবং কোন যথাযোগ্য আদালত তাকে মানসিক রোগগ্রস্থ বলে ঘোষণা করেন। কিংবা,

(খ) তিনি ঋণ দেউলিয়া হন এবং আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হবার পর ১০ বছর অতিক্রান্ত না হয়ে থাকে কিংবা,

(গ) তিনি কোন অপরাধে দন্ডিত হয়ে যে কোন মেয়াদের জন্য নির্বাসিত হন কিংবা কমপক্ষে দুই বছরের জন্য জেলে থাকেন এবং তার মুক্তির পর পাঁচ বছর অথবা কোন বিশেষ ক্ষেত্রে, প্রেসিডেন্টের অনুমতি অনুসারে ৫ বছরের কম কোন নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত না হয়ে থাকে। কিংবা,

(ঘ) তিনি ১৯৬৯ সালের পহেলা আগষ্টের পর প্রেসিডেন্টের উজীর পরিষদের সদস্য হয়ে থাকেন এবং তার উজীর পদের অবসানের পর ২ বছর অথবা কোন বিশেষ ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টের অনুমতি অনুসারে ২ বছরের কম কোন নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত না হয়ে থাকে। বা,

(ঙ) বেতন বা ফিসের মাধ্যমে পরিশ্রমিক প্রাপ্ত আংশিক সময়ের চাকরি ছাড়া পাকিস্তানের কোন সরকারী চাকুরীজীবি হন। বা,

(চ) অসদাচরণের জন্য পাকিস্তানে কোন সরকারী চাকুরী থেকে বরখাস্ত হয়ে থাকেন এবং বরখাস্ত হবার ৫ বছর কিংবা কোন বিশেষ ক্ষেত্রে, প্রেসিডেন্টের অনুমতি অনুসারে ৫ বছরের কম কোন নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত না হয়ে থাকে। বা,

(ছ) তিনি পাকিস্তানের কোন সরকারী চাকুরীজীবির স্বামী বা স্ত্রী হন। বা,

(জ) তিনি নিজে কিংবা তার পক্ষে প্রতিনিধিত্বকারী অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে বা তার স্বার্থে বা তার নামে বা একান্নবর্তী হিন্দু পরিবারের সদস্য হিসেবে সরকারকে মাল সরবরাহের বা সরকারের গৃহীত কোন ঠিকা বাস্তবায়নের কিংবা সরকারের পক্ষে কোন সার্ভিস সম্পাদনের কোন ঠিকায় শরীক থাকেন। সমবায় সমিতি কিংবা সরকারের মধ্যকার ঠিকার ক্ষেত্রে এই অযোগ্যতা প্রযোজ্য নয়।

উল্লেখ থাকে যে, (জ) ধারায় বর্ণিত অযোগ্যতা প্রযোজ্য নয় (i) যেখানে ঠিকার অংশ কিংবা স্বার্থ তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে বা ক্রমপরম্পরায় বা কোন উইল অনুসারে Executor administrator হিসেবে পেয়েছেন এবং তা পাওয়ার পর এখনো ৬ মাস কিংবা কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টের অনুমতি মোতাবেক ৬ মাসের বেশি কোন নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হয়নি। বা,

Dhaka University Institutional Repository

(ii) যেখানে ১৯১৩ (১৯১৩ সালের ৮) সালের কোম্পানী আইনের সংজ্ঞা মোতাবেক কোন পাবলিক কোম্পানী কর্তৃক বা কোম্পানীর পক্ষে এই ঠিকা গ্রহণ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কোম্পানীর একজন শেয়ারহাল্ডার কিন্তু কোম্পানীর অধীনে কোন লাভজনক পদে আসীন পরিচালক হন কিংবা ম্যানেজিং এজেন্ট হন। বা,

(iii) সেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একটি হিন্দু একান্নবর্তী পরিবারের একজন লোক এবং সেই পরিবারের অন্য কোন লোক এমন একটি স্বতন্ত্র ব্যবসা প্রসঙ্গে এই ঠিকা নিয়েছেন যে ব্যবসাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোন অংশ নেই।

(৩) এই প্রসঙ্গে সন্দেহ এড়ানোর উদ্দেশ্যে এতদ্বারা ঘোষণা করা হচ্ছে যে, সুপ্রীম কোর্ট কিংবা হাইকোর্টের বিচারপতি পাকিস্তানের কন্ট্রোলার বা অডিট জেনারেল, পাকিস্তানের এ্যাটর্নী জেনারেল এবং কোন প্রদেশের এ্যাডভোকেট জেনারেল এরা সবাই পাকিস্তানের সরকারী চাকুরে।

(৪) কোন সদস্য তার নির্বাচিত হওয়ার পর কোন রকম অযোগ্য হয়েছেন কিনা এরকম কোন প্রশ্ন দেখা দিলে কমিশনার প্রশ্নটি নির্বাচন কমিশনের মতে সংশ্লিষ্ট সদস্য অযোগ্য হয়ে থাকেন তাহলে তার আসন শূণ্য হয়ে যাবে।

কতিপয় ক্ষেত্রে প্রার্থী হওয়া নিষিদ্ধ

১০। (১) কোন ব্যক্তি একসঙ্গে একাধিক পরিষদের সদস্য কিংবা একই পরিষদ একাধিক নির্বাচনী এলাকার পক্ষে সদস্য হতে পারবেন না।

(২) উপরে বর্ণিত (১) ধারা দরুন কোন ব্যক্তির জন্য একসঙ্গে দুই বা ততোধিক নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচনের প্রার্থী হওয়া নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি দুই বা ততোধিক নির্বাচনী এলাকা থেকে সদস্য নির্বাচিত হন এবং সর্বশেষ যে এলাকা থেকে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন, সেই এলাকা কর্তৃক নির্বাচিত হওয়ার বিজ্ঞপ্তি ১৫ দিনের মধ্যে যদি তিনি কমিশনারের কাছে স্বাক্ষরিত ঘোষণা পাঠিয়ে না জানান যে তিনি কোন এলাকাটির প্রতিনিধিত্ব করতে চাচ্ছেন তাহলে তার সব আসনই শূণ্য হয়ে যাবে।

কিন্তু যতদিন তিনি দুই বা ততোধিক নির্বাচনী এলাকার সদস্য থাকবেন ততদিন তিনি কোন পরিষদে আসন গ্রহণ করবেন না কিংবা ভোট দেবেন না।

পদত্যাগ

১১। (১) কোন সদস্য স্পীকারের কাছে নিজের স্বাক্ষরযুক্ত লিখিত বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে তার আসন থেকে ইস্তফা দিতে পারবেন।

(২) কোন সদস্য স্পীকারের অনুমতি ছাড়া পরপর পরিষদের ১৫টি (অধিবেশনের দিন ধরে) পরিষদে অনুপস্থিত থাকলে তার আসন শূন্য হয়ে যাবে।

(৩) কোন সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর পরিষদের প্রথম অধিবেশনের তারিখ থেকে সাত দিনের মধ্যে ১২ নম্বর অনুচ্ছেদ মোতাবেক শপথ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হলে তার আসন খালি হয়ে যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ থাকে যে, স্পীকার কিংবা স্পীকার নির্বাচিত না হয়ে থাকলে কমিশনার উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে উপযুক্ত কারণ দেখানো হলে, এই মেয়াদ বাড়িয়ে দিতে পারবেন।

পরিষদ সদস্যদের শপথ

১২। কোন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত কোন ব্যক্তি তার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে পরিষদের অধিবেশনে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির সামনে, নিম্নলিখিত শপথ গ্রহণ করবেন:

"আমি ..... সর্বান্তকরণে শপথ গ্রহণ করছি যে, আমি পাকিস্তানের প্রতি সত্যিকার ভাবে বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকবো এবং যে কর্তব্যভার আমি গ্রহণ করতে যাচ্ছি তা সততা, আমার সর্বোত্তম যোগ্যতা এবং বিশ্বস্তার সঙ্গে আইন কাঠামো আদেশ, ১৯৭০ এর ধারাসমূহ এবং এই আদেশে বর্ণিত পরিষদের আইনকানুন মোতাবেক এবং সবসময়ই পাকিস্তানের অখন্ডতা, সংহতি, কল্যাণ ও সমৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রেখে সম্পাদন করবো।"

ভোটগ্রহণের তারিখ

১৩। জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের জন্য ভোটগ্রহণ ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর এবং প্রাদেশিক পরিষদসমূহের নির্বাচনের ভোটগ্রহণ ১৯৭০ সালের ২২ অক্টোবরের আগেই কোন তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান

১৪। (১) জাতীয় পরিষদ সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পর প্রেসিডেন্ট পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র তৈরির কাজ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে তার বিবেচনামতো উপযুক্ত তারিখ, সময় ও স্থানে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকবেন এবং এইভাবে আহুত জাতীয় পরিষদে তার প্রথম বৈঠকের দিন হতেই বিধিগত গঠিত হলে গণ্য হবে।

উল্লেখ থাকে যে, এই ধারায় বর্ণিত কোন কিছুই জাতীয় পরিষদের সব সদস্যের নির্বাচন সম্পূর্ণ না হওয়ার অজুহাতে প্রেসিডেন্টকে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান থেকে বিরত রাখতে পারবে না।

(২) (১) ধারা মোতাবেক আহুত হয়ে প্রথম মিলিত হওয়ার পর থেকে স্পীকারের দেওয়া তারিখ ও স্থানে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে।

(৩) জাতীয় পরিষদ তার কর্তব্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে যুক্তিসঙ্গত বিরতিসহ দৈনিক অধিবেশনে মিলিত হবেন।

প্রেসিডেন্টের ভাষণ দানের অধিকার

১৫। প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদে ভাষণ দিতে পারবেন এবং পরিষদকে এক বা একাধিক বার্তা পাঠাতে পারবেন।

Dhaka University Institutional Repository

স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার

১৬। (১) জাতীয় পরিষদ যত শীঘ্র সম্ভব তার দুইজন সদস্যকে পরিষদের স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার পদের জন্য নির্বাচিত করবেন এবং স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারের পদ শূণ্য হলেই তার স্থলে আরেকজন স্পীকার কিংবা ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত করবেন।

(২) স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচনের আগ পর্যন্ত কমিশনার জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন এবং স্পীকারের কর্তব্যসমূহ পালন করবেন।

(৩) স্পীকারের পদ শূণ্য হলে ডেপুটি স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকারের পদ শূণ্য হলে কমিশনার স্পীকারের কর্তব্যসমূহ পালন করবেন।

(৪) জাতীয় পরিষদের কোন অধিবেশনে স্পীকারের অনুপস্থিতি কালে ডেপুটি স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকারও যদি অনুপস্থিত থাকেন তাহলে পরিষদের কার্যবিধিতে এ সংক্রান্ত যে ব্যবস্থা থাকবে সেই ব্যবস্থা অনুসারে কোন সদস্য স্পীকারের কর্তব্যসমূহ পালন করবেন।

(৫) স্পীকার কিংবা ডেপুটি স্পীকার পদে নিযুক্ত কোন সদস্য তার পদ হারাবেন–

(ক) তিনি যদি জাতীয় পরিষদের সদস্য না থাকেন

(খ) যদি তিনি প্রেসিডেন্টকে তার স্বাক্ষরযুক্ত চিঠি পাঠিয়ে তার সদস্যপদে ইস্তফা দেন। বা,

(গ) যদি পরিষদে তার সম্পর্কে অনাস্থা প্রকাশ করে কোন প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় এবং তা জাতীয় পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যার কমপক্ষে দুই তৃতীয়াংশ ভোটে পাশ হয়। এ ধরনের প্রস্তাব উত্থাপনের আগে কমপক্ষে ১৪ দিনের নোটিশ দিতে হবে।

কোরাম ও কার্যবিধি

১৭। (১) জাতীয় পরিষদের কোন অধিবেশন চলাকালে যদি অধিবেশনের সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় যে, উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যা একশতে না পৌছে ততক্ষণ পর্যন্ত অধিবেশনের কাজ বন্ধ রাখবেন কিংবা অধিবেশন মুলতবী করে দিবেন।

(২) জাতীয় পরিষদের কার্যবিধি তৃতীয় তালিকায় বর্ণিত কার্যবিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে কিন্তু জাতীয় পরিষদ নিজে স্থির করবেন শাসনতন্ত্র বিল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত কিভাবে নেয়া হবে।

(৩) জাতীয় পরিষদে কোন সদস্যের আসন যে কোন কারণে শূণ্য থাকা সত্ত্বেও পরিষদ কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন। কোন সদস্যের নির্বাচন পরে বাতিল হয়ে গিয়েছে কিংবা কোন সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর যে সকল কাজ করলে সদস্যপদের অযোগ্য হয়ে যেতে হয় তার কোন একটি করেছিলেন- এ ধরনের কোন সদস্য পরিষদের কোন সিদ্ধান্তে ভোট দিয়েছেন কিংবা অন্যভাবে অংশ নিয়েছেন এই অজুহাতে পরিষদের সেই সিদ্ধান্তটি বাতিল হবে না।

জাতীয় পরিষদের অধিকার

১৮। (১) জাতীয় পরিষদের কোন কাজের বৈধতা কোন আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না।

(২) জাতীয় পরিষদে বক্তৃতা দানের অধিকারপ্রাপ্ত কোন সদস্য কিংবা ব্যক্তির বিরুদ্ধে পরিষদ কিংবা পরিষদের কোন কমিটিতে তার কোন উক্তি কিংবা তার দেয় কোন ভোটের ব্যাপারে কোন আদালতে অভিযোগ করা যাবে না।

(৩) জাতীয় পরিষদের কোন অফিসার কর্তৃক পরিষদের কোন কাজের ব্যাপারে তাকে দেয়া কার্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ, কার্য পরিচালনা এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখা সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রয়োগের উপর কোন আদালতের এখতিয়ার থাকবে না।

(৪) কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে জাতীয় পরিষদ কর্তৃক কিংবা জাতীয় পরিষদের কর্তৃত্বাধীনে কোন রিপোর্ট, দলিলপত্র, ভোট কিংবা কার্যবিবরণী প্রকাশনার ব্যাপারে কোন আদালতে অভিযোগ আনীত হবে না।

(৫) যে স্থানে জাতীয় পরিষদ কিংবা তার কোন কমিটির বৈঠক হচ্ছে তার সীমানার মধ্যে স্পীকারের অনুমতি ব্যতীত আদালত কিংবা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের ইস্যু করা কোন কাগজপত্র বিলি করা কিংবা সেই অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না।

সদস্যদের ভাতা ও অধিকার

১৯। স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার এবং অন্য সদস্যরা প্রেসিডেন্ট যে রকম আদেশ দিবেন সে অনুসারে ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ভোগ করবেন।

শাসনতন্ত্রের মূলনীতিসমূহ

২০। শাসনতন্ত্র এমনভাবে তৈরী করা হবে যেন তাতে নিম্নবর্ণিত মূলনীতিসমূহ অর্ন্তভুক্ত থাকে।

(১) পাকিস্তান একটি ফেডারেল প্রজাতন্ত্র হবে এবং তা 'পাকিস্তান ইসলামিক প্রজাতন্ত্র' নামে অভিহিত হবে। যেসব প্রদেশ ও অন্যান্য এলাকা বর্তমানে পাকিস্তানের অর্ন্তভুক্ত হয়েছে কিংবা পরে অর্ন্তভুক্ত হতে পারে সেসব প্রদেশ ও এলাকাকে একটি ফেডারেশনের অধীনে এমনভাবে একত্রিত করা হবে যেন পাকিস্তানের স্বাধীনতা, আঞ্চলিক অখন্ততা এবং জাতীয় সংহতি অক্ষুন্ন থাকে এবং ফেডারেশনের ঐক্য কোনমতেই ক্ষুন্ন না হয়।

(২) (ক) পাকিস্তান সৃষ্টির ভিত্তি যে ইসলামী আদর্শবাদ তা অক্ষুন্ন রাখা হবে।

(খ) রাষ্ট্রপ্রধানকে একজন মুসলমান হতে হবে।

(৩) (ক) জনসংখ্যা ও প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট মেয়াদ পরপর ফেডারেল ও প্রাদেশিক পরিষদ সমূহের নির্বাচনের ব্যবস্থার মাধ্যমে গণতন্ত্রের মূলনীতিসমূহের অনুসরণ নিশ্চিত করা হবে।

(খ) নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ বিধিবদ্ধ করা হবে এবং তা ভোগের নিশ্চয়তা বিধান করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(গ) বিচারকার্য পরিচালনা এবং মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধানের ব্যাপারে বিচার বিভাগকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে।

(৪) আইন তৈরীর ক্ষমতা, প্রশাসনিক এবং আর্থিক ক্ষমতা সহ সব ক্ষমতা ফেডারেল সরকার এবং প্রদেশসমূহের মধ্যে এমনভাবে ভাগ করা হবে যে একদিকে প্রদেশগুলো সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন অর্থাৎ সর্বাধিক পরিমাণ আইনগত, প্রশাসনিক এবং আর্থিক ক্ষমতা পাবে, অন্যদিকে ফেডারেল সরকারের ও বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি ব্যাপার তার দায়িত্ব পালন এবং দেশের স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখন্ডতা অক্ষুন্ন রাখার দায়িত্ব পালনের জন্য পর্যাপ্ত আইনগত, প্রশাসনিক, আর্থিক ও অন্যান্য ক্ষমতা থাকবে।

(ক) পাকিস্তানের যে সকল এলাকার জনগণ সব রকম জাতীয় প্রচেষ্টায় পুরোপুরি অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

(খ) বিভিন্ন আইনগত ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশ ও একই প্রদেশের বিভিন্ন এলাকার মধ্যেকার অর্থনৈতিক ও অন্য সকল রকম বৈষম্য দূর করা হবে।

শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনা

২১। শাসনতন্ত্রের ভূমিকায় এই মর্মে ঘোষণা থাকতে হবে যে,

(১) পাকিস্তানের মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক ইসলামের শিক্ষা অনুসারে জীবন গড়ে তোলার উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলা হবে।

(২) সংখ্যালঘুরা অবাধে তাদের ধর্ম বিশ্বাস ও তা পালন করতে পারবেন এবং পাকিস্তানের নাগরিক হিসেবে সবরকম অধিকার, সুযোগসুবিধা ও নিরাপত্তা ভোগ করবেন।

নির্দেশক মূলনীতিসমূহ

২২। শাসনতন্ত্রে, রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণের জন্য নির্দেশক হিসেবে কতগুলো মূলনীতি দেওয়া থাকবে। এসব মূলনীতি নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের ব্যাপারে রাষ্ট্রকে পরিচালনা করবে।

(১) ইসলামী জীবনধারা গড়ে তোলা;

(২) ইসলামের নৈতিক রীতি পালন;

(৩) পাকিস্তানের মুসলমানদেরকে পবিত্র কোরআন ও ইসলামিয়াত শিক্ষা দানের সুবিধাদির ব্যবস্থা করা।

(৪) পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ বর্ণিত ইসলামের শিক্ষাদীক্ষার পরিপন্থী কোন আইন প্রণয়ন নিষিদ্ধ করা।

জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহই হবে জাতীয় ও প্রাদেশিক প্রথম পর্যায়ে আইন পরিষদ

২৩। শাসনতন্ত্রে থাকবে যে,

(১) এই আদেশের অধীনে গঠিত জাতীয় পরিষদ।

ক) পূর্ণ মেয়াদের জন্য ফেডারেশনের প্রথম আইন পরিষদ হবে। যদি ফেডারেশনের আইন পরিষদে একটি মাত্র সভা থাকে। আর,

(খ) যদি ফেডারেশনের আইন পরিষদের দুইটি সভা থাকে, তা হলে তা পূর্ণ মেয়াদের জন্য ফেডারেশনের আইন পরিষদের প্রথম নিম্নসভা হবে।

(২) এই আদেশের অধীনে নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদসমূহ পূর্ণ মেয়াদের জন্য নিজ নিজ প্রদেশের প্রথম আইন পরিষদ হবে।

শাসনতন্ত্র তৈরি ও মেয়াদ

২৪। জাতীয় পরিষদ তার প্রথম অধিবেশনের ১২০ দিনের মধ্যে 'শাসনতন্ত্র বিল' নামে একটি বিলের আকারে শাসনতন্ত্র তৈরী করবেন এবং তা করতে ব্যর্থ হলে পরিষদ বাতিল হয়ে যাবে।

শাসনতন্ত্রের অনুমোদন

২৫। জাতীয় পরিষদের পাশ করা শাসনতন্ত্র বিল প্রেসিডেন্টের অনুমোদনের জন্য পেশ করা হবে। শাসনতন্ত্র যদি প্রেসিডেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত না হয়, তাহলে জাতীয় পরিষদ বাতিল হয়ে যাবে।

যে সব উদ্দেশ্যে পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে পারবে

২৬। (১) যতদিন পর্যন্ত পরিষদের পাশ করা এবং প্রেসিডেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত শাসনতন্ত্র বলবৎ না হয় ততদিন পর্যন্ত, এই আদেশ মোতাবেক পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র তৈরীর উদ্দেশ্যে ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে পরিষদ জাতীয় পরিষদ হিসেবে অধিবেশনে মিলিত হতে পারবেন না।

(২) জাতীয় পরিষদের পাশ করা এবং প্রেসিডেন্টের কর্তৃক অনুমোদিত শাসনতন্ত্র বলবৎ হওয়ার আগে কোন প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন ডাকা হবে না।

আদেশের ব্যাখ্যা ও সংশোধন

২৭। (১) এই আদেশের কোন ধারার ব্যাখ্যা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন কিংবা সন্দেহের সমাধান প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্ত অনুসারে করা হবে এবং তাকে কোন আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না।

(৩) প্রেসিডেন্টের এই আদেশ সংশোধনের ক্ষমতা রয়েছে কিন্তু জাতীয় পরিষদের এই আদেশ সংশোধনের কোন ক্ষমতা থাকবে না।

Dhaka University Institutional Repository

তালিকা নং ১

{অনুচ্ছেদ ৪(২)}

পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ

অঞ্চল	**সাধারণ আসন**	**মহিলা আসন**
পূর্ব পাকিস্তান	১৬২	৭
পাঞ্জাব	৮২	৩
সিন্ধু	২৭	১
বেলুচিস্তান	৪	১
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	১৮	০
কেন্দ্রশাসিত উপজাতীয় এলাকা	৭	১
মোট	**৩০০**	**১৩**

তালিকা নং ২

{অনুচ্ছেদ ৫(১)}

প্রাদেশিক পরিষদ

অঞ্চল	**সাধারণ আসন**	**মহিলা আসন**
পূর্ব পাকিস্তান	৩০০	১০
পাঞ্জাব	১৮০	৬
সিন্ধু	৬০	২
বেলুচিস্তান	২০	২
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৪০	২
মোট	**৬০০**	**২২**

সূত্রঃ হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২, পৃ. ৫০২-৫১৯

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৭

ঐতিহাসিক ছয় দফা

আমাদের বাঁচার দাবী

৬-দফা কর্মসূচী

শেখ মুজিবুর রহমান

আমার প্রিয় দেশবাসী ভাই-বোনেরা,

আমি পূর্ব পাকিস্তানবাসীর বাঁচার দাবী রূপে ৬-দফা কর্মসূচী দেশবাসী ও ক্ষমতাসীন দলের বিবেচনার জন্য পেশ করিয়াছি। শান্তভাবে উহার সমালোচনা করার পরিবর্তে কায়েমী স্বার্থবাদীদের দালালরা আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা শুরু করিয়াছেন। জনগণের দুশমনদের এই চেহারা ও গালাগালির সহিত দেশবাসী সুপরিচিত। অতীতে, পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিতান্ত সহজ ও ন্যায্য দাবী যখনই উঠিয়াছে, তখনই এই দালালরা এমনিভাবে হৈ চৈ করিয়া উঠিয়াছেন। আমাদের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী, পূর্ব পাক জনগণের মুক্তি সনদ একুশ দফা দাবীযুক্ত নির্বাচন প্রথার দাবী, বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার দাবী ইত্যাদি সকল প্রকার দাবীর মধ্যেই এই শোষকের দল ও তাহাদের দালালরা ইসলাম ও পাকিস্তান ধ্বংসের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন।

আমার প্রস্তাবিত ৬-দফা দাবীতেও এঁরা তেমনিভাবে পাকিস্তান দুই টুকরো করিবার দুরভিসন্ধি আরোপ করিতেছেন। আমার প্রস্তাবিত ৬-দফা দাবীতে যে পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে পাঁচ কোটি শোষিত বঞ্চিত আদম সন্তানের অন্তরের কথাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, তাহাতে আমার কোনও সন্দেহ নাই। খবরের কাগজের লেখায়, সংবাদে ও সভা-সমিতির বিবরণে, সকল শ্রেণীর সুধীজনের বিবৃতিতে আমি গোটা দেশবাসীর উৎসাহ উদ্দীপনার সাড়া দেখিতেছি। তাতে আমার প্রাণে সাহস ও বুকে বল আসিয়াছে। সর্বোপরি, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ আমার ৬-দফা দাবী অনুমোদন করিয়াছেন। ফলে ৬-দফা দাবী আজ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় দাবীতে পরিণত হইয়াছে। এ অবস্থায় কায়েমী স্বার্থবাদী শোষকদের প্রচারণায় জনগণ বিভ্রান্ত হইবেন না, সে বিশ্বাস আমার আছে।

কিন্তু এও আমি জানি, জনগণের দুশমনদের ক্ষমতা অসীম, তাঁদের বিত্ত প্রচুর, হাতিয়ার এঁদের অফুরন্ত, মুখ এঁদের দশটা, গলার সুর এঁদের শতাধিক। এঁরা বহুরূপী। ঈমান, ঐক্য ও সংহতির নামে এঁরা আছেন সরকারী দলে। আবার ইসলাম ও গণতন্ত্রের দোহাই দিয়া এঁরা আছেন অপজিশন দলে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দুশমনির বেলায় এঁরা সকলে একজোট। এঁরা নানা ছলাকালায় জনগণকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিবেন। সে চেষ্টা শুরুও হইয়া গিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিষ্কাম সেবার জন্য এঁরা ইতিমধ্যেই বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। এঁদের হাজার চেষ্টাতেও আমার অধিকার সচেতন দেশবাসী বিভ্রান্ত হইবেন না, তাতেও আমার কোন সন্দেহ নাই। তথাপি ৬-দফা দাবীর তাৎপর্য ও উহার অপরিহার্যতা জনগণের মধ্যে প্রচার করা সমস্ত গণতন্ত্রী, বিশেষতঃ আওয়ামী লীগ কর্মীদের অবশ্য কর্তব্য। আশা করি, তাঁরা সকলে অবিলম্বে ৬দফার ব্যাখ্যায় দেশময় ছড়াইয়া পড়িবেন। কর্মী ভাইদের সুবিধার জন্য ও দেশবাসী জনসাধারণের কাছে সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে আমি ৬-দফার প্রতিটি দফার দফাওয়ারী সহজ সরল ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও যুক্তিসহ এই পুস্তিকা প্রচার করিলাম।

Dhaka University Institutional Repository

১নং দফা

এই দফায় বলা হইয়াছে যে, ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করতঃ পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডরেশনরূপে গড়িতে হইবে। তাহাতে পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার থাকিবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কদের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হইবে। আইন সভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকিবে।

ইহাতে আপত্তির কি আছে? লাহোর প্রস্তাব পাকিস্তানের জনগণের নিকট কায়েদে আজমসহ সকল নেতার দেওয়া নির্বাচনী ওয়াদা। ১৯৪৬ সালে সাধারণ নির্বাচন এই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই হইয়াছিল। মুসলিম বাংলার জনগণ একাবাক্যে পাকিস্তানের বাক্সে ভোট দিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবের দরুনই। ১৯৫৪ সনের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব বাংলার মুসলিম আসনের শতকরা সাড়ে ৯৭টি যে একুশ দফার পক্ষে আসিয়াছিল, লাহোর-প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার দাবী ছিল তার অন্যতম প্রধান দাবী। মুসলিম লীগ তখন কেন্দ্রের ও প্রদেশের সরকারী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। সরকারী সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা লইয়া তাঁহারা এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলে ইসলাম বিপন্ন ও পাকিস্তান ধ্বংস হইবে, এসব যুক্তি তখনও দেওয়া হইয়াছিল। তথাপি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পক্ষের কথা বলিতে গেলে এই প্রশ্ন চূড়ান্তভাবে গণতান্ত্রিক উপায়ে মীমাংসিত হইয়াই গিয়াছে। কাজেই আজ লাহোর-প্রস্তাব ভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচনার দাবী করিয়া আমি কোনও নতুন দাবী তুলি নাই; পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পুরান দাবীরই পুনরুল্লেখ করিয়াছি মাত্র। তথাপি লাহোর-প্রস্তাবের নাম শুনিলেই যাঁরা আঁকিৎয়া উঠেন, তাঁরা হয় পাকিস্তান-সংগ্রামে শরিক ছিলেন না, অথবা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দাবী দাওয়ার বিরোধিতা ও কয়েমী স্বার্থবাদীদের দালালি করিয়া পাকিস্তানের অনিষ্ট সাধন করিতে চান।

এই দফায় পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার, সর্বজনীন ভোটে সরাসরি নির্বাচন ও আইন সভায় সার্বভৌমত্বেও যে দাবী করা হইয়াছে তাতে আপত্তির কারণ কি? আমার প্রস্তাবই ভাল, না প্রেসিডেনশিয়াল পদ্ধতির সরকার ও পরোক্ষ নির্বাচন এবং ক্ষমতাহীন আইন সভাই ভাল, এ বিচার-ভার জনগণের উপর ছাড়িয়া দেওয়াই কি উচিত নয়? তবে পাকিস্তানের ঐক্য-সংহতির এই তরফদারেরা এই সব প্রশ্নে রেফারেন্ডামের মাধ্যমে জনমত যাচাই এর প্রস্তাব না দিয়া আমার বিরুদ্ধে গালাগালি বর্ষণ করিতেছেন কেন? তাঁরা যদি নিজেদের মতে এতই আস্থাবান, তবে আসুন এই প্রশ্নের উপরই গণ-ভোট হইয়া যাক।

২ নং দফা

এই দফায় আমি প্রস্তাব করিয়াছি যে, ফেডারেশন সরকারের এখতিয়ারে কেবল মাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার এই দুইটি বিষয় থাকিবে। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় স্টেট সমূহের (বর্তমান ব্যবস্থায় যাকে প্রদেশ বলা হয়) হাতে থাকিবে।

এই প্রস্তাবের দরুনই কায়েমী স্বার্থের দালালরা আমার উপর সর্বাপেক্ষা বেশী চটিয়াছেন। আমি নাকি পাকিস্তানকে দুই টুকরা করতঃ ধ্বংস করিবার প্রস্তাব দিয়াছি। সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি ইহাদেরকে এতহা অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে যে ইঁহারা রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা ভুলিয়া যাইতেছেন যে, বৃটিশ সরকারের ক্যাবিনেট মিশন ১৯৪৬ সালে যে 'প্ল্যান' দিয়াছিলেন এবং যে 'প্ল্যান' কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই গ্রহণ করিয়াছিলেন তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এই তিনটি মাত্র বিষয় ছিল এবং বাকী সব বিষয়ই প্রদেশের হাতে দেওয়া হইয়াছিল। ইহা হইতে এটাই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে

Dhaka University Institutional Repository

যে, বৃটিশ সরকার, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সকলের মত এই যে, এই তিনটি মাত্র বিষয় কেন্দ্রের হাতে থাকিলেই কেন্দ্রীয় সরকার চলিতে পারে। অন্য কারণে কংগ্রেস চুক্তি-ভঙ্গ করায় ক্যাবিনেট প্ল্যান পরিত্যক্ত হয়। তাহা না হইলে এই তিন বিষয় লইয়াই আজও ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার চলিতে থাকিত। আমি আমার প্রস্তাবে ক্যাবিনেট প্ল্যানেরই অনুসরণ করিয়াছি। যোগাযোগ ব্যবস্থা আমি বাদ দিয়াছি সত্য, কিন্তু তার যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে। অখন্ড ভারতের বেলায় যোগাযোগ ব্যবস্থারও অখন্ডতা ছিল। ফেডারেশন গঠনের রাষ্ট্রবৈজ্ঞানিক মূলনীতি এই যে, যে-যে বিষয়ে ফেডারেটিং স্টেটসমূহের স্বার্থ এক ও অবিভাজ্য, কেবল সেই বিষয়ই ফেডারেশনের এখতিয়ারে দেওয়া হয়। এই মূলনীতি অনুসারে অখন্ড ভারতে যোগাযোগ ব্যবস্থা এক ও অবিভাজ্য ছিল। পেশাওয়ার হইতে চাটগাঁ পর্যন্ত একই রেল চলিতে পারিত। কিন্তু পাকিস্তানে তা নয়। দুই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা এক ও অবিভাজ্য ত নয়ই, বরঞ্চ সম্পূর্ণ পৃথক। রেলওয়েকে প্রাদেশিক সরকারের হাতে ট্রান্সফার করিয়া বর্তমান সরকারও তাই স্বীকার করিয়াছেন। টেলিফোন-টেলিগ্রাম পোস্টাফিসের ব্যাপারেও এ সত্য স্বীকার করিতেই হইবে।

তবে বলা যাইতে পারে যে, একুশ দফায় যখন কেন্দ্রকে তিনটি বিষয় দিবার সুপারিশ ছিল, তখন আমি আমার বর্তমান প্রস্তাবের মাত্র দুইটি বিষয় দিলাম কেন? এ প্রশ্নের জবাব ৩নং দফার ব্যাখ্যায় দিয়াছি। এখানে আর পুনরুক্তি করিলাম না।

আরেকটা ব্যাপারে ভুল ধারণা সৃষ্টি হইতে পারে। আমার প্রস্তাবে ফেডারেটিং ইউনিটকে 'প্রদেশ' না বলিয়া 'স্টেট' বলিয়াছি। ইহাতে কায়েমী স্বার্থবাদী শোষকরা জনগণকে এই বলিয়া ধোকা দিতে পারে এবং দিতেও শুরু করিয়াছে, 'স্টেট' অর্থে আমি 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট' স্টেট' বা স্বাধীন রাষ্ট্র বুঝাইয়াছি। কিন্তু তা সত্য নয়। ফেডারেটিং ইউনিটকে দুনিয়ার সর্বত্র সব বড় বড় ফেডারেশনেই 'প্রদেশ' বা প্রভিন্স' না বলিয়া 'স্টেটস' বলা হইয়া থাকে। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকে ফেডারেশন অথবা ইউনিয়ন বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ফেডারেল জার্মানী, এমনকি আমাদের প্রতিবেশী ভারত রাষ্ট্র সকলেই তাদের প্রদেশসমূহকে 'স্টেট' এবং কেন্দ্রকে ইউনিয়ন বা ফেডারেশন বলিয়া থাকে। আমাদের পাশ্ববর্তী আসাম ও পশ্চিম বাংলা 'প্রদেশ' নয় 'স্টেট'। এরা যদি ভারত ইউনিয়নের প্রদেশ হইয়া 'স্টেট' হওয়ার সম্মান পাইতে পারে, তবে পূর্ব পাকিস্তানকে এইটুকু নামের মর্যাদা দিতেইবা কর্তারা এত এলার্জিক কেন?

৩ নং দফা

এই দফায় আমি মুদ্রা সম্পর্কে দুইটি বিকল্প বা অল্টার্নেটিভ প্রস্তাব দিয়াছি। এই দুইটি প্রস্তাবের যে কোনও একটি গ্রহণ করিলেই চলিবে।

ক) পূর্ব ও পশ্চিম পকিস্তানের জন্য দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কারেন্সী কেন্দ্রের হাতে থাকিবে না, আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকিবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র স্টেট ব্যাংক থাকিবে।

খ) দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সী থাকিবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এ অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে। দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে।

Dhaka University Institutional Repository

এই দুইটি বিকল্প প্রস্তাব হইতে দেখা যাইবে যে, মুদ্রাকে সরাসরি কেন্দ্রের হাতে হইতে প্রদেশের হাতে আনিবার প্রস্তাব আমি করি নাই। যদি আমার দ্বিতীয় অল্টার্নেটিভ গৃহীত হয়, তবে মুদ্রা কেন্দ্রের হাতেই থাকিয়া যাইবে। ঐ অবস্থায় আমি একুশ দফার প্রস্তাবের খেলাফে কোনও সুপারিশ করিয়াছি, একথা বলা চলে না।

যদি পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা আমার এই প্রস্তাবে রাজী না হন, তবু শুধু প্রথম বিকল্প অর্থাৎ কেন্দ্রের হাতে হইতে মুদ্রাকে প্রদেশের হাতে আনিতে হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ভুল বুঝাবুঝির অবসান হইলে আমাদের এবং উভয় অঞ্চলের সুবিধার খাতিরে পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা এই প্রস্তাবে রাজী হইবেন। আমরা তাঁদের খাতিরে সংখ্য-গরিষ্ঠতা ত্যাগ করিয়া সংখ্যা-সাম্য মানিয়া লইয়াছি, তাহারা কি আমাদের খাতিরে এইটুকু করিবেন না?

আর যদি অবস্থা গতিকে মুদ্রাকে প্রদেশের এলাকায় আনিতেও হয়, তবু তাতে কেন্দ্র দুর্বল হইবে না; পাকিস্তানের কোনও অনিষ্ট হইবে না। ক্যাবিনেট প্ল্যানে নিখিল ভারতীয় কেন্দ্রের যে প্রস্তাব ছিল, তাতে মুদ্রা কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল না। ঐ প্রস্তাব পেশ করিয়া বৃটিশ সরকার এবং ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ, সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, মুদ্রাকে কেন্দ্রীয় বিষয় না করিয়াও কেন্দ্র চলিতে পারে। কথাটা সত্য। রাষ্ট্রীয় অর্থ-বিজ্ঞানে এই ব্যবস্থার স্বীকৃতি আছে। কেন্দ্রের বদলে প্রদেশের হাতে অর্থনীতি রাখা এবং একই দেশে পৃথক পৃথক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকার নজির দুনিয়ার বড় বড় শক্তিশালী রাষ্ট্রেও আাছে। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি চলে ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমের মাধ্যমে পৃথক পৃথক স্টেট ব্যাঙ্কের দ্বারা। এতে যুক্তরাষ্ট্র ধ্বংস হয় নাই; তাদের আর্থিক বুনিয়াদও ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। অত যে শক্তিশালী দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ সোভিয়েট ইউনিয়ন, তাদেরও কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও অর্থমন্ত্রী বা অর্থ দফতর নাই। শুধু প্রাদেশিক সরকারের অর্থাৎ স্টেট রিপাবলিক সমূহেরই অর্থমন্ত্রী ও অর্থ দফতর আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক প্রয়োজন ঐ সব প্রাদেশিক মন্ত্রী ও মন্ত্রীদফতর দিয়াই মিটিয়া থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকার মত দেশেও আঞ্চলিক সুবিধার খাতিরে দুইটি পৃথক ও স্বতন্ত্র রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বহুদিন আগে হইতই চালু আছে।

আমার প্রস্তাবের মর্ম এই যে, উপরোক্ত দুই বিকল্পের দ্বিতীয়টি গৃহীত হইলে মুদ্রা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে থাকিবে। সে অবস্থায় উভয় অঞ্চলের একই নকশার মুদ্রা বর্তমানে যেমন আছে তেমনি থাকিবে। পার্থক্য শুধু এই হইবে যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় মুদ্রা পুর্ব পাকিস্তানের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ইস্যু হইবে এবং তাতে 'পূর্ব পাকিস্তান' বা সংক্ষেপে 'ঢাকা" লেখা থাকিবে। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ইস্যু হইবে এবং তাতে পশ্চিম পাকিস্তান' বা সংক্ষেপে 'লাহোর' লেখা থাকিবে। পক্ষান্তরে, আমার প্রস্তাবের দ্বিতীয় বিকল্প না হইয়া যদি প্রথম বিকল্পও গৃহীত হয়, সে অবস্থাতেও উভয় অঞ্চলের মুদ্রা সহজে বিনিময়যোগ্য থাকিবে এবং পাকিস্তানের ঐক্যের প্রতীক ও নিদর্শন স্বরূপ উভয় আঞ্চলিক সরকারের সহযোগিতায় একই নকশার মুদ্রা প্রচলন করা যাইবে।

একটু তলাইয়া চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, এই দুই ব্যবস্থার একটি গ্রহণ করা ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানকে নিশ্চিত অর্থনৈতিক মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করার অন্য কোনও বিধি-নিষেধ ও নির্ভুল হিসাব নাই। মুদ্রা ও অর্থনীতি কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ারে থাকায় অতি সহজে পূর্ব পাকিস্তানের আয় পশ্চিম পাকিস্তানে চলিয়া যাইতেছে। সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, শিল্প-বাণিজ্য, ব্যাঙ্কিং, ইনসিওরেন্স ও বৈদেশিক মিশন সমূহের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত থাকায় প্রতি মিনিটে এই পাচারের কাজ অবিরাম গতিতে চলিতেছে'। সকলেই জানেন সরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক ও ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক সহ সমস্ত ব্যাঙ্কও হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে। এই সেদিন

Dhaka University Institutional Repository

মাত্র প্রতিষ্ঠিত ছোট দু-একখানি ব্যাঙ্ক ইহার সাম্প্রতিক ব্যতিক্রম মাত্র। এই সব ব্যাঙ্কেও ডিপজিটর টাকা, শেয়ারমানি, সিকিউরিটি মানি, শিল্প-বাণিজ্যের আয়, মুনাফা ও শেয়ার মানি, এক কথায় পূর্ব পাকিস্তানের অনুষ্ঠিত সমস্ত আর্থিক লেনদেনের টাকা বালুচরে ঢালা পানির মত একটানে তলদেশে হেড অফিসে অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানে চলিয়া যাইতেছে, পূর্ব পাকিস্তান শুকনা বালুচর হইয়া থাকিতেছে। বালুচরে পানির দরকার হইলে টিউব-ওয়ল খুদিয়া তলদেশ হইতে পানি তুলিতে হয়। অবশিষ্ট পানি তলদেশে জমা থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় অর্থও তেমনি চেকের টিউব-ওয়েলের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আনিতে হয়। উদ্ধৃত্ত আর্থিক সেভিং তলদেশেই অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানেই জমা থাকে। এই কারণেই পূর্ব পাকিস্তানে ক্যাপিটেল ফর্মেশন হইতে পারে নাই। সব ক্যাপিটেল ফর্মেশন পশ্চিমে হইয়াছে। বর্তমান ব্যবস্থা চলিতে থাকিলে কোনও দিনও পূর্ব পাকিস্তানে মুলধন গঠন হইবেও না। কারণ সেভিং মনেই ক্যাপিটেল ফর্মেশন।

শুধু ফ্লাইট-অব-ক্যাপিটেল বা মুদ্রা পাচারই নয়, মুদ্রাস্ফীতি হেতু পূর্ব পাকিস্তানে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দুমূল্যতা, জনগণের বিশেষতঃ পাটচাষীদের দুর্দশা, সমস্তের জন্য দায়ী এই মুদ্রা ব্যবস্থা ও অর্থনীতি। আমি ৫ নং দফার ব্যাখ্যায় এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিতভাবে এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। এখানে শুধু এইটুকু বলিয়া রাখিতেছি যে, এই ফ্লাইট-অব-ক্যাপিটেল বন্ধ করিতে না পারিলে পূর্ব পাকিস্তানীরা নিজেরা শিল্প-বাণিজ্যে এক পা-ও অগ্রসর হইতে পারিবে না। কারণ এ অবস্থায় মুলধন গড়িয়া উঠিতে পারে না।

৪ নং দফা

এই দফায় আমি প্রস্তাব করিয়াছি যে, সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা কর ধার্য্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউ-এর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে অটোমেটিক্যালি জমা হইয়া যাইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকিবে। এইভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিল হইবে।

আমার এই প্রস্তাবেই কায়েমী স্বার্থের কালাবাজারী ও মুনাফাখোর শোষকরা সবচেয়ে বেশী চমকিয়া উঠিয়াছে। তাহারা বলিতেছে, ট্যাক্স ধার্য্যের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের না থাকিলে সে সরকার চলিবে কিরূপে? কেন্দ্রীয় সরকার তাতে যে একেবাওে খয়রাতী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে। খয়রাতের উপর নির্ভর করিয়া কেন্দ্রীয সরকার দেশরক্ষা করিবেন কেমনে? পররাষ্ট্র নীতিই বা চালাইবেন কি দিয়া? প্রয়োজনের সময় চাঁদা না দিলে কেন্দ্রীয় সরকার ত অনাহারে মারা যাইবেন। অতএব এটা নিশ্চয়ই পকিস্তান ধ্বংসেরই ষড়যন্ত্র।

কায়েমী স্বার্থবাদীরা এই ধরনের কত কথাই না বলিতেছেন। অথচ এর একটা আশঙ্কাও সত্য নয়। সত্য যে নয় সেটা বুঝিবার মত বিদ্যা বুদ্ধি তাঁদের নিশ্চয়ই আছে। তবু যে তাঁরা এসব কথা বলিতেছেন, তার একমাত্র কারণ তাহাদের ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থ। সে স্বার্থ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে অবাধে শোষণ ও লুণ্ঠন করার অধিকার। তাঁহারা জানেন যে, আমার এই প্রস্তাবে কেন্দ্রকে ট্যাক্স ধার্য্যের দায়িত্ব না দেওয়া না হইলেও কেন্দ্রীয় সরকার নির্বিঘ্নে চলার মত যথেষ্ট অর্থের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সে ব্যবস্থা নিখুঁত করিবার শাসনতান্ত্রিক বিধান রচনার সুপারিশ করা হইয়াছে। এটাই সরকারী তহবিলের সবচেয়ে অমোঘ অব্যর্থ ও সর্বাপেক্ষা নিরাপদ

Dhaka University Institutional Repository

উপায়। তাঁরা এটাও জানেন যে, কেন্দ্রকে ট্যাক্স ধার্য্যের ক্ষমতা না দিয়াও ফেডারেশন চলার বিধান রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে স্বীকৃত। তারা এ খবরও রাখেন যে, ক্যাবিনেট মিশনের যে প্ল্যান বৃটিশ সরকার রচনা করিয়াছিলেন এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাতেও সমস্ত ট্যাক্স ধার্য্যের ক্ষমতা প্রদেশের হাতে দেওয়া হইয়াছিল; কেন্দ্রকে সে ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। ৩ নং দফার ব্যাখ্যায় আমি দেখাইয়াছি যে, অর্থমন্ত্রী ও অর্থ-দফতর ছাড়াও দুনিয়ার অনেক ফেডারেশন চলিতেছে। তার মধ্যে দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী ফেডারেশন সোভিয়েট ইউনিয়নের কথা আমি বলিয়াছি। তথায় কেন্দ্রে অর্থ-মন্ত্রী বা অর্থ-দফতর বলিয়া কোনও বাস্তব অস্তিত্বই নাই। আমার প্রস্তাব কার্যকরী হইলেও তেমনি পাকিস্তানের দেশরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হইবে না। কারণ আমার প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় তহবিলের নিরাপত্তার জন্য শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করা হইয়াছে। সে অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন এমন বিধান থাকিবে যে, আঞ্চলিক সরকার যেখানে যখন যে খাতেই যে টাকা ট্যাক্স ধার্য্য ও আদায় করুন না কেন, শাসনতন্ত্রের নির্ধারিত সে টাকার হারের অংশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা হইয়া যাইবে। সে টাকায় আঞ্চলিক সরকারের কোন হাত থাকবে না। এই ব্যবস্থায় অনেক সুবিধা হইবে। প্রথমতঃ কেন্দ্রীয় সরকারকে ট্যাক্স আদায়ের ঝামেলা পোহাইতে হইবে না। দ্বিতীয়তঃ ট্যাক্স ধার্য্য ও আদায়ের জন্য কোনও দফতর বা অফিসার বাহিনী রাখিতে হইবে না। তৃতীয়তঃ অঞ্চলে ও কেন্দ্রের জন্য ট্যাক্স ধার্য্য ও আদায়ের মধ্যে ডুপ্লিকেশন হইবে না। তাতে আদায়ী খরচায় অপব্যয় ও অপচয় বন্ধ হইবে। ঐভাবে সঞ্চিত টাকার দ্বারা গঠন ও উন্নয়মূলক অনেক কাজ করা যাইবে। অফিসার বাহিনীকেও উন্নততর সৎকাজে নিয়োজিত করা যাইবে। চতুর্থতঃ ট্যাক্স ধার্য্য ও আদায়ের একীকরণ সহজতর হইবে। সকলেই জানেন, অর্থ-বিজ্ঞানীরা এখন ক্রমেই সিঙ্গল ট্যাক্সেশনের দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন। সিঙ্গল ট্যাক্সেশনের নীতিকে সকলেই অধিকতর বৈজ্ঞানিক ও ফলপ্রসু বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। ট্যাক্সেশনকে ফেডারেশনের এলাকা হইতে অঞ্চলের এখতিয়ারভুক্ত করা এই সর্বোত্তম ও সর্বশেষ আর্থিক নীতি গ্রহণের প্রথম পদক্ষেপ বলা যইতে পারে।

৫ নং দফা

এই দফায় আমি বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাপারে নিম্মরূপ শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করিয়াছি:

১. দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখিতে হইবে,
২. পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখতিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকিবে,
৩. ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা দুই অঞ্চল হইতে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হইবে,
৪. দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানী-রফতানী চলিবে,
৫. ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানী-রফতানী করিবার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতান্ত্রিক বিধান করিতে হইবে।

পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক নিশ্চিত মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই ব্যবস্থা ৩ নং দফার মতই অত্যাবশ্যক। পাকিস্তানের আঠার বছরের আর্থিক ইতিহাসের দিকে একটু নজর বুলাইলেই দেখা যাইবে যে:

Dhaka University Institutional Repository

ক. পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদশী মুদ্রা দিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প গড়িয়া তোলা হইয়াছে এবং হইতেছে। সেই সকল শিল্প-জাত দ্রব্যের অর্জিত বিদেশী মুদ্রাকে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা বলা হইতেছে।

খ. পূর্ব পাকিস্তানে মুলধন গড়িয়া না উঠায় পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা ব্যবহারের ক্ষমতা পূর্ব পাকিস্তানের নাই এই অজুহাতে পূর্ব পাকিস্তানের বিদেশী আয় পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হইতেছে। এইভাবে পূর্ব পকিস্তান শিল্পায়িত হইতে পারিতেছে না।

গ. পূর্ব পাকিস্তান যে পরিমাণে আয় করে সেই পরিমাণ ব্যয় করিতে পারে না। সকলেই জানেন, পূর্ব পাকিস্তান যে পরিমাণ রফতানী করে, আমদানী করে সাধারণতঃ তার অর্ধেকেরও কম। ফলে অর্থনীতির অমোঘ নিয়ম অনুসারেই পূর্ব পাকিস্তান ইনফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফিতী ম্যালেরিয়া জ্বরের মত লাগিয়াই আছে। তার ফলে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম এত বেশী। বিদেশ হইতে আমদানী করা একই জিনিসের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী দামের তুলনা করিলেই এটা বুঝা যাইবে। বিদেশী মুদ্রা বন্টনের দায়িত্ব এবং অর্থনৈতিক অন্যান্য সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ারে থাকার ফলেই আমাদের এই দুর্দশা।

ঘ. পাকিস্তানের বিদেশী মুদ্রার তিন ভাগের দুই ভাগই অর্জিত হয় পাট হইতে। অথচ পাট চাষীকে পাটের ন্যায্য মূল্য ত দুরের কথা আবাদী খরচটাও দেওয়া হয় না। ফলে পাট চাষীদের ভাগ্য আজ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের খেলার জিনিসে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান সরকার পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ করেন; কিন্তু চাষীকে পাটের ন্যায্য দাম দিতে পারেন না। এমন অদ্ভুত অর্থনীতি দুনিয়ার আর কোন দেশে নাই। যত দিন পাট থাকে চাষীর ঘরে, ততদিন পাটের দাম থাকে পনের-বিশ টাকা। ব্যবসায়ীর গুদামে চলিয়া যাওয়ার সাথে সাথে তার দাম হয় পঞ্চাশ। এ খেলা গরীব পাট চাষী চিরকাল দেখিয়া আসিতেছে। পাট ব্যবসায় জাতীয়করণ করিয়া পাট রফতানীকে সরকারী আয়ত্বে আনা ছাড়া এর কোনও প্রতিকার নাই, একথা আমরা বহুবার বলিয়াছি। এ উদ্দেশ্যে আমরা আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার আমলে জুট মার্কেটিং কর্পোরেশন গঠন করিয়াছিলাম। পরে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে পুঁজিপতিরা আমাদের সেই আরদ্ধ কাজ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন।

ঙ. পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রাই যে শুধু পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ হইতেছে তা নয়, আমাদের অর্জিত বিদেশী মুদ্রার জোরে যে বিপুল পরিমাণ বিদেশী লোন ও এইড আসিতেছে, তাও পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হইতেছে। কিন্তু সে লোনের সুদ বহন করিতে হইতেছে পূর্ব পাকিস্তানকেই। ঐ অবস্থার প্রতিকার করিয়া পাট চাষীকে পাটের ন্যায্য মূল্য দিতে হইলে, আমদানী রফতানী সমান করিয়া জনসাধারণকে সস্তা দামে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করিয়া তাদের জীবন সুখময় করিতে হইলে এবং সর্বোপরি আমাদের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা দিয়া পূর্ব পাকিস্তানীর হাতে পূর্ব পাকিস্তানকে শিল্পায়িত করিতে হইলে আমার প্রস্তাব এই ব্যবস্থা ছাড়া উপায়ন্তর নাই।

৬ নং দফা

এই দফায় আমি পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারী রক্ষীবাহিনী গঠনের সুপারিশ করিয়াছি। এ দাবী অন্যায়ও নয়, নতুনও নয়। একুশ-দফার দাবীতে আমরা আনসার বাহিনীকে ইউনিফর্মধারী সশস্ত্র বাহিনীতে রূপান্তরিত করার দাবী করিয়াছিলাম। তা ত করা হয়ই নাই, বরঞ্চ পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অধীনস্থ ই-পি-আর বাহিনীকে এখন কেন্দ্রের অধীনে

Dhaka University Institutional Repository

নেওয়া হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানের অস্ত্র কারখানা ও নৌবাহিনীর হেডকোয়ার্টার স্থাপন করতঃ এ অঞ্চলকে আত্মরক্ষায় আত্মনির্ভর করার দাবী একুশ দফার দাবী। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বার বছরেও আমাদের একটি দাবীও পূরণ করেন নাই। পূর্ব পাকিস্তান অধিকাংশ পাকিস্তানীর বাসস্থান। এটাকে রক্ষা করা কেন্দ্রীয় সরকারেরই নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনে আমাদের দাবী করিতে হইবে কেন? সরকার নিজে হইতে সে দায়িত্ব পালন করেন না কেন? পশ্চিম পাকিস্তান আগে বাঁচাইয়া সময় ও সুযোগ থাকিলে পরে পূর্ব পাকিস্তান বাঁচান হইবে, ইহাই কেন্দ্রীয় সরকারের অভিমত? পূর্ব পাকিস্তানের রক্ষা-ব্যবস্থা পশ্চিম পাকিস্তানেই রহিয়াছে এমন সাংঘাতিক কথা শাসনকর্তারা বলেন কোন মুখে? মাত্র সতের দিনের পাক-ভারত যুদ্ধই কি প্রমাণ করে নাই আমরা কত নিরুপায়? শত্রুর দয়া ও মর্জির উপর ত আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারি না। কেন্দ্রীয় সরকারের দেশরক্ষা নীতি কার্যতঃ আমাদের তাই করিয়া রাখিয়াছে।

তবু আমরা পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির খাতিরে দেশরক্ষা ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাখিতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে এও চাই যে, কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানকে এ ব্যাপারে আত্মনির্ভর করিবার জন্য এখানে উপযুক্ত পরিমাণ দেশরক্ষা বাহিনী গঠন করুন। অস্ত্র-কারখানা স্থাপন করুন। নৌ-বাহিনীর দফতর এখানে নিয়া আসুন। এ-সব কাজ সরকার কবে করিবেন জানি না। কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা অল্প খরচে ছোটখাট অস্ত্র-শস্ত্র দিয়া আধা-সামরিক বাহিনী গঠন করিতে পশ্চিমা ভাইদের অত আপত্তি কেন? পূর্ব পাকিস্তান রক্ষার উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র যুদ্ধ তহবিলে চাঁদা উঠিল তাও কোন্দ্রীয় রক্ষা তহবিলে নিয়ে যাওয়া হয় কেন? এইসব প্রশ্নের উত্তর নাই। কেন্দ্রীয় ব্যাপারে অঞ্চলের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আমরাও চাই না। এ অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান যেমন করিয়া পারে গরীবি হালে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিবে এমন দাবী কি অন্যায়? এই দাবী করিলে সেটা হইবে দেশদ্রোহীতা?

এ প্রসঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইবোনদের খেদমতে আমার কয়েকটি আরজ আছে:

এক. তাহারা মনে করিবেন না আমি শুধু পূর্ব পাকিস্তানীদের অধিকার দাবী করিতেছি। আমার ৬-দফা কর্মসূচীতে পশ্চিম পাকিস্তানীদের দাবিও সমভাবে রহিয়াছে। এ দাবী স্বীকৃত হইলে পশ্চিম পাকিস্তানীরাও সমভাবে উপকৃত হইবে।

দুই. আমি যখন বলি পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার ও স্তুপীকৃত হইতেছে তখন আমি আঞ্চলিক বৈষম্যের কথা বলি, ব্যক্তিগত বৈষম্যের কথা বলি না। আমি জানি, এ বৈষম্য সৃষ্টির জন্য পশ্চিম পাকিস্তানীরা দায়ী নয়। আমি এও জানি যে, আমাদের মত দরিদ্র পশ্চিম পাকিস্তানে অনেক আছে। যতদিন ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার অবসান না হইবে, ততদিন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এ অসাম্য দূর হইবে না। কিন্তু তার আগে আঞ্চলিক শোষণও বন্ধ করিতে হইবে। এ আঞ্চলিক শোষণের জন্য দায়ী আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান এবং সে অবস্থানকে অগ্রাহ্য করিয়া যে অস্বাভাবিক ব্যবস্থা চালাইবার চেষ্টা চলিতেছে সে ব্যবস্থা। ধরুন, যদি পাকিস্তানের রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে না হইয়া পূর্ব পাকিস্তানে হইত, পাকিস্তানের দেশরক্ষা বাহিনীর তিনটি দফতরই যদি পূর্ব পাকিস্তানে হইতো, তবে কার কি অসুবিধা-সুবিধা হইতে একটু বিচার করুন। পাকিস্তানের মোট রাজস্বের শতকরা ৬২ টাকা খরচ হয় দেশরক্ষা বাহিনীতে শতকরা বত্রিশ টাকা খরচ হয় কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনায়। এই একুন শতকরা চুরানব্বই টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে না হইয়া তখন খরচ হইত পূর্ব পাকিস্তানে। আপনারা জানেন অর্থবিজ্ঞানের কথা; সরকারী আয় জনগণের ব্যয় এবং সরকারী ব্যয় জনগণের আয়। এ নিয়মে বর্তমান ব্যবস্থায় সরকারের গোটা আয়ের অর্ধেক পূর্ব পাকিস্তানের ব্যয় ঠিকই, কিন্তু সরকারী ব্যয়ের সবটুকুই পশ্চিম

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানের আয়। রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত থাকায় সরকারী আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বিদেশী মিশনসমূহ তাদের সমস্ত ব্যয় পশ্চিম পাকিস্তানেই করিতে বাধ্য হইতেছেন। এই ব্যয়ের সাকুল্যই পশ্চিম পাকিস্তানের আয়। ফলে প্রতিবছর পশ্চিম পাকিস্তানের আয় ঐ অনুপাতে বাড়িতেছে এবং পূর্ব পাকিস্তান তার মোকাবেলায় ঐ পরিমাণ গরীব হইতেছে। যদি পশ্চিম পাকিস্তানের বদলে পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের রাজধানী হইত তবে এইসব পূর্ব পাকিস্তানের হইত। আমরা পূর্ব পাকিস্তানবাসীরা এই পরিমাণে ধনী হইতাম। আপনারা পশ্চিম পাকিস্তানীরা ঐ পরিমাণে গরীব হইতেন। তখন আপনারা কি করিতেন? যে সব দাবী করার জন্য আমাকে প্রাদেশিক সংকীর্ণতার মতামত দিতেছেন, সেসব দাবী আপনারা নিজেরাই করিতেন। আমাদের চেয়ে জোরেই করিতেন। অনেক আগেই করিতেন। আমাদের মত আঠার বছর বসিয়া থাকিতেন না। সেটা করা আপনাদের অন্যায়ও হইত না।

তিন, আপনারা ঐ সব দাবী করিলে আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা কি করিতাম, জানেন? আপনাদের সব দাবী মানিয়া লইতাম। আপনাদিগকে প্রাদেশিকতাবাদী বলিয়া গাল দিতাম না। কারণ আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি, ও-সব আপনাদের হক পাওনা। নিজের হক পাওনা দাবী করা অন্যায় নয়, কর্তব্য। এ বিশ্বাস আমাদের এতই আন্তরিক যে, সে অবস্থা হইলে আপনাদের দাবী করিতে হইত না। আপনাদের দাবী করার আগেই আপনাদের হক আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিতাম। আমরা নিজেদের হক দাবী করিতেছি বলিয়া আমাদের স্বার্থপর বলিতেছেন। কিন্তু আপনারা যে নিজেদের হকের সাথে সাথে আমাদের হকটাও খাইয়া ফেলিতেছেন, আপনাদের লোকে কি বলিবে? আমরা শুধু নিজেদের হকটাই চাই। আপনাদের হকটা আত্মসাৎ করিতে চাই না। আমাদের দিবার আওকাৎ থাকিলে বরঞ্চ পরকে কিছু দিয়াও দেই। দৃষ্টান্ত চান? শুনুন তবে।

১. প্রথম গণ-পরিষদে আমাদের মেম্বার সংখ্যা ছিল ৪৪; আর আপনাদের ছিল ২৮। আমরা ইচ্ছা করিলে গণতান্ত্রিক শক্তিতে ভোটের জোরে রাজধানী ও দেশরক্ষার সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে আনিতে পারিতাম। তা করি নাই।

২. পশ্চিম পাকিস্তানীদের সংখ্যাল্পতা দেখিয়া ভাই-এর দরদ লইয়া আমাদের ৪৪ টা আসনের মধ্যে ৬ টাতে পূর্ব পাকিস্তানীর ভোটে পশ্চিম পাকিস্তানী মেম্বার নির্বাচন করিয়াছিলাম।

৩. ইচ্ছা করিলে ভোটের জোরে শুধু বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করিতে পারিতাম। তা না করিয়া বাংলার সাথে উর্দুকেও রাষ্ট্রভাষার দাবী করিয়াছিলাম।

৪. ইচ্ছা করিলে ভোটের জোরে পূর্ব পাকিস্তানের সুবিধাজনক শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারিতাম।

৫. আপনাদের মন হইতে মেজরিটি ভয় দূর করিয়া সে স্থলে ভ্রাতৃত্ব ও সমতাবোধ সৃষ্টির জন্য উভয় অঞ্চলে সকল বিষয়ে সমতা বিধানের আশ্বাসে আমরা সংখ্যা-গুরুত্ব ত্যাগ করিয়া সংখ্যা-সাম্য গ্রহণ করিয়াছিলাম।

চার. সুতরাং পশ্চিম পাকিস্তানী ভাই সাহেবান, আপনারা দেখিতেছেন, যেখানে -যেখানে আমাদের দান করিবার আওকাৎ ছিল, আমরা দান করিয়াছি। আর কিছুই নাই দান করিবার। থাকিলে নিশ্চয় দিতাম। যদি পূর্ব পাকিস্তানে রাজধানী হইত তবে আপনাদের দাবী করিবার আগেই আমরা পশ্চিম পাকিস্তানে সত্যসত্যই দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করিতাম। দ্বিতীয় রাজধানীর নামে ধোকা দিতাম না। সে অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের সকল প্রকার ব্যয় যাতে উভয় অঞ্চলে সমান হয়, তার নিখুঁত ব্যবস্থা করিতাম। সকল ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানকে সামগ্রিকভাবে এবং প্রদেশসমূহকে পৃথক পৃথক ভাবে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতাম। আমরা দেখাইতাম, পূর্ব পাকিস্তানীরা

Dhaka University Institutional Repository

মেজরিটি বলিয়াই পাকিস্তান শুধু পূর্ব পাকিস্তানীদের নয়, ছোট-বড় নির্বিশেষে তা সকল পাকিস্তানীর। পূর্ব পাকিস্তানে রাজধানী হইলে তার সুযোগ লইয়া আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা সহ অধিকার ও চাকুরি গ্রাস করিতাম না। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসনভার পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতেই দিতাম। আপনাদের কটন বোর্ডে আমরা চেয়ারম্যান হইতে যাইতাম না। আপনাদের প্রদেশের আমরা গর্ভনর হইতেও চাহিতাম না। আপনাদের পি.আই.ডি.সি আপনাদের ওয়াপদা, আপনাদের ডি-আই-টি, আপনাদের পোর্ট ট্রাষ্ট, আপনাদের রেলওয়ে ইত্যাদির চেয়ারম্যানি আমরা দখল করিতাম না। আপনাদেরই করিতে দিতাম। সমস্ত অল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠানকে পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত করিতাম না। ফলত পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনীতিতে মোটা ও পশ্চিম পাকিস্তানকে সরু করিতাম না। দুই অঞ্চলের মধ্যে এই মারাত্মক ডিসপ্যারিটি সৃষ্টি হইতে দিতাম না।

এমনি উদারতা, এমন নিরপেক্ষতা, পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে এমন ইনসাফ-বোধই পাকিস্তানী দেশপ্রেমের বুনিয়াদ। এটা যার মধ্যে আছে কেবল তিনিই দেশপ্রেমিক। যে নেতার মধ্যে এই প্রেম আছে, কেবল তিনিই পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের উপর নেতৃত্বের যোগ্য। যে নেতা বিশ্বাস করেন, দুইটি অঞ্চল আসলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় দেহের দুই চোখ, দুই কান, দুই নাসিকা, দুই পাটি দাঁত, দুই হাত, দুই পা; যে নেতা বিশ্বাস করেন পাকিস্তানকে শক্তিশালী করিতে হইলে এই সব জোড়ার দুইটিকেই সমান সুস্থ ও শক্তিশালী করিতে হইবে; যে নেতা বিশ্বাস করেন পাকিস্তানের এক অঙ্গ দুর্বল হইলে গোটা পাকিস্তানই দুর্বল হইয়া পরে; যে নেতা বিশ্বাস করেন ইচ্ছা করিয়া বা জানিয়া শুনিয়া যারা পাকিস্তানের এক অঙ্গকে দুর্বল করিতে চায় তারা পাকিস্তানের দুশমন; যে নেতা দৃঢ় ও সবল হস্তে সেই দুশমনদের শায়েস্তা করিতে প্রস্তুত আছেন, কেবল তিনিই পাকিস্তানের জাতীয় নেতা হইবার অধিকারী। কেবল তাঁরই নেতৃত্বে পাকিস্তানের ঐক্য অটুট ও শক্তি অপরাজেয় হইবে। পাকিস্তানের মত বিশাল ও অসাধারণ রাষ্ট্রের নায়ক হইতে হইলে নায়কের অন্তরও হইতে হইবে বিশাল ও অসাধারণ। আশাকরি, আমার পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা এই মাপকাঠিতে আমার ছয় দফা কর্মসূচীর বিচার করিবেন। তা যদি তাঁরা করেন তবে দেখিতে পাইবেন, আমার এই ছয়-দফা শুধু পূর্ব পাকিস্তানেরই বাঁচার দাবী।

আমার প্রিয় ভাই-বোনেরা, আপনারা দেখিতেছেন যে, আমার ৬-দফা দাবীতে একটিও অন্যায়, অসঙ্গত, পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী বা পাকিস্তান ধ্বংসকারী প্রস্তাব করি নাই। বরঞ্চ আমি যুক্তিতর্ক সহকারে দেখাইলাম, আমরা সুপারিশ গ্রহণ করিলে পাকিস্তান আরো অনেক বেশী শক্তিশালী হইবে। তথাপি কায়েমী স্বার্থের মুখপাত্ররা আমার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার এলজাম লাগাইতেছেন। এটা নতুনও নয়, বিস্ময়ের কথাও নয়। পুর্ব পাকিস্তানের মজলুম জনগণের পক্ষে কথা বলিতে গিয়া আমার বাপ-দাদার মত মুরুব্বিরাই এদের কাছে গাল খাইয়াছেন, এদের হাতে লাঞ্চনা ভোগ করিয়াছেন, আমি কোন ছার? দেশবাসীর মনে আছে, আমাদের নয়ন-মনি শেরে-বাংলা ফজলুল হককে এরা দেশদ্রোহী বলিয়াছিলেন। দেশাবসী এও দেখিয়াছেন যে পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা, পাকিস্তানের সর্বজন মান্য জাতীয় নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দীকেও দেশদ্রোহিতার অভিযোগে কারাবরণ করিতে হইয়াছিল এদেরই হাতে। অতএব দেখা গেল পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবীর কথা বলিতে গেলে দেশদ্রোহিতার বদনাম ও জেল-জুলুম ভুগিবার তকদির আমার হইয়াছে। মুরুব্বিদের দোওয়ায়, সহকর্মীদের সহৃদয়তায় এবং দেশবাসীর সমর্থনে সে সব সহ্য করিবার মত মনের বল আল্লাহ আমাকে দান করিয়াছেন। সাড়ে পাঁচ কোটি পূর্ব পাকিস্তানীর ভালবাসাকে সম্বল করিয়া আমি এ কাজে যে কোনও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত আছি। আমার দেশবাসীর কল্যাণের কাছে আমার মত নগণ্য ব্যক্তির জীবনের মূল্যই বা কতটুকু? মজলুম দেশবাসীর বাঁচার দাবীর জন্য সংগ্রাম করার চেয়ে মহৎ কাজ আর কিছু আছে বলিয়া আমি মনে করি না। মরহুম জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ন্যায় যোগ্য নেতার

Dhaka University Institutional Repository

কাছেই আমি এ জ্ঞান লাভ করিয়াছি। তিনিও আজ বাঁচিয়া নাই, আমিও আজ যৌবনের কোঠা বহু পিছনে ফেলিয়া পৌঢ়ত্বে পৌছিয়াছি। আমার দেশের প্রিয় ভাই-বোনেরা আল্লাহর দরগায় শুধু এই দোওয়া করিবেন, বাকী জীবনটুকু আমি যেন তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি সাধনায় নিয়োজিত করিতে পারি।

আপনাদের স্নেহ-ধন্য খাদেম

শেখ মুজিবুর রহমান

সূত্রঃ হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২, পৃ. ২৫৯-২৬৯

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৮

সোনার বাংলা শ্মাশান কেন?

১৯৭০ এ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের একটি প্রচারপত্র

বৈষম্য বিষয়	বাঙলাদেশ	পশ্চিম পাকিস্তান
রাজস্ব খাতে ব্যয়	১৫০০ কোটি টাকা	৫০০০ কোটি টাকা
উন্নয়ন খাতে ব্যয়	৩০০০ কোটি টাকা	৬০০০ কোটি টাকা
বৈদেশিক সাহায্য	শতকরা ২০ ভাগ	শতকরা ৮০ ভাগ
বৈদেশিক দ্রব্য আমদানী	শতকরা ২৫ ভাগ	শতকরা ৭৫ ভাগ
কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরী	শতকরা ১৫ ভাগ	শতকরা ৮৫ ভাগ
সামরিক বিভাগের চাকুরী	শতকরা ১০ জন	শতকরা ৯০ জন
চাউল মণ প্রতি	৫০ টাকা	২৫ টাকা
আটা মণ প্রতি	৩০ টাকা	১৫ টাকা
সরিষা তৈল সের প্রতি	৫ টাকা	২.৫০ পয়সা
স্বর্ণ প্রতি ভরি	১৭০ টাকা	১৩৫ টাকা

Source: Ranglal Sen, *Political Elites in Bangladesh*, Dhaka, UPL, 1986.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৯

শেখ মুজিবুর রহমানের নির্বাচনী আবেদন

আমার প্রিয় দেশবাসী ভাইবোনেরা,

আসসালামু আলাইকুম।

আমার সংগ্রামী অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

আগামী ৭ই ডিসেম্বর সারা দেশব্যাপী জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ধার্য করা হয়েছে। জনগণের ত্যাগ ও নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রামের ফল হচ্ছে এই নির্বাচন। সারা দেশ ও দেশের মানুষকে তীব্র সংকট ও দুর্গতি থেকে চিরদিনের মতো মুক্ত করার সুযোগ এই নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে গ্রহণ করা যেতে পারে।

দীর্ঘ তেইশ বছরের অবিরাম আন্দোলনের পথ বেয়ে শত শত দেশপ্রেমিকের আত্মদান, শহীদের তাজা রক্ত, আর হাজার হাজার ছাত্র-শ্রমিক ও রাজনৈতিক কর্মীর অশেষ নির্যাতন ভোগ ও ত্যাগের বিনিময়ে বাঙলাদেশের জনগণের সামনে আজ এক মহা সুযোগ উপস্থিত। এই নির্বাচনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, নির্বাচিত হবার পর পরই পরিষদ সদস্যরা বা রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতার গদিতে বসে পড়তে পারবে না। তাদেরকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজ সমাধা করতে হবে। বস্তুতঃ স্বাধীনতার তেইশ বছরের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের মূল দায়িত্ব এবং অধিকার সর্বপ্রথম এবারই জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা লাভ করেছে। তাই এই নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম।

আমার দেশবাসী,

আমাদের দীর্ঘদিনের সংগ্রাম, ত্যাগ ও তিতিক্ষার পরও যদি কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের প্রতিনিধিগণ দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্ব থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে পাকিস্তান বিশেষ করে বাঙলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ চিরতরে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হবে। কেননা সম্পদ লুণ্ঠনকারী ও একনায়ত্ববাদের প্রতিভূরা দেশের কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের ইচ্ছানুযায়ী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করার কাজে পদেপদে বাধা দেবে। ভোটাধিকারের নির্ভুল প্রয়োগের মাধ্যমে সেই মহা সুযোগ ও দায়িত্ব যদি আমরা কুচক্রীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে পারি, তাহলে কৃষক-শ্রমিক–সর্বহারা মানুষের দুঃখমোচন এবং বাঙলার মুক্তি সনদ ৬-দফা ও ১১-দফা বাস্তবায়িত করা যাবে। একমাত্র এই কারণেই আওয়ামী লীগ আসন্ন নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে যাচ্ছে এবং বাঙলাদেশের প্রতিটি আসনে প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রিয় দেশবাসী,

কারাগার থেকে বেরিয়ে আমরা জনসংখ্যাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব অর্থাৎ এক ব্যক্তি এক ভোটের দাবী তুলেছিলাম, আজ সেটা আদায় হয়েছে। তাই ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমরা বিশেষ যোগ্যতা ও সুযোগের অধিকারী। এখন বাঙলাদেশ থেকে নির্বাচিত পরিষদ সদস্যরা যদি একই দলের কর্মসূচী ও আদর্শের সমর্থক হন অর্থাৎ সকল প্রশ্নে তারা ঐক্যমত্যে থাকতে পারেন তবে আমরা অতীতে চাপিয়ে দেয়া সকল অবিচার, বৈষম্যমূলক আচরণ, আইনকানুন এবং বেইনসাফী শোষণের পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারব। আমাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ও সম্মিলিত দাবীর মুখে দেশের অপর অংশের পরিষদ সদস্যগণ বাঙলাদেশের মানুষের মুক্তিসনদ ৬-দফা ও ১১-দফা মেনে নিতে বাধ্য থাকবেন। এর কারণ, পরিষদে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকব। আর যদি আমরা বিভক্ত হয়ে যাই এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও মতাদর্শের অনৈক্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে আত্মঘাতী সংঘাতে মেতে উঠি তাহলে যারা এদেশের মানুষের ভালো চান না ও এখানকার সম্পদের উপর ভাগ বসাতে চান তাদেরই সুবিধে হবে এবং বাঙলাদেশের নির্যাতিত, নিপীড়িত, ভাগ্যাহত ও দুঃখী মানুষের মুক্তির দিনটি পিছিয়ে যাবে।

আমার ভাইবোনেরা,

শেরে বাংলা আজ পরলোকে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আমাদের মাঝে নেই। যারা প্রবীনতার দাবী করছেন তাদের অধিকাংশই হয় ইতিমধ্যেই পশ্চিম পাকিস্তানের একশ্রেণীর বাঙালী বিদ্বেষীদের নিকট নিজেদের বিকিয়ে দিয়ে তল্পীবাহকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, নয়তো নিষ্কর্মা, নির্জীব হয়ে পড়ছেন এবং অন্যের সলা-পরামর্শে বশীভূত হয়ে কথায় ও কাজে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। আমি নিশ্চিত বুঝতে পারছি, ভাগ্য-বিপর্যস্ত মানুষের হয়ে আমাদেরকেই কথা বলতে হবে। তাদের চাওয়া ও পাওয়ার সার্থক রূপদানের দায়িত্ব আওয়ামী লীগকেই গ্রহণ করতে হবে এবং সে কঠিন দায়িত্ব গ্রহণে আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তার উপযোগী করেই আমাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগকে গড়ে তোলা হয়েছে। নিজেদের প্রাণ দিয়েও যদি এদেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জীবনকে কন্টকমুক্ত করতে পারি এবং দেশবাসীর জন্যে যে কল্পনার নকশা এতদিন ধরে মনের পটে একেছিলাম–সে স্বপ্নের বাস্তব রূপায়নের পথ প্রশস্ত করে দুঃখের বোঝা যদি কিছুটাও লাঘব করে যেতে পারি– তাহলে আমাদের সংগ্রাম সার্থক হবে।

আমার প্রিয় দেশবাসী,

আমি ক্ষমতার প্রত্যাশী নই। কারণ, ক্ষমতার চেয়ে জনতার দাবী আদায়ের সংগ্রাম অনেক বড়। এখন নির্বাচনের মাধ্যমে বক্তব্য পেশ ও দাবী আদায়ের দায়িত্ব যদি আমাদের উপর ন্যস্ত করতে চান তাহলে আমাদের শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। সে শক্তি হলো পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ। কারণ, এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা হচ্ছে অধিকার আদায়ের চাবিকাঠি। তাই আমার জীবনের সুদীর্ঘ সংগ্রামের এক ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আপনাদের কাছে আমার একটি মাত্র আবেদন– বাঙলাদেশের সকল আসনে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থীদেরকে 'নৌকা' মার্কায় ভোট দিন।

সংগ্রামী দেশবাসী,

সর্বশেষে, আমি ব্যক্তিগত পর্যায়ে আপনাদের কাছে কয়েকটি কথা পেশ করতে চাই। আপনারা জানেন ১৯৬৫ সালের ১৭ দিনের যুদ্ধের সময় আমরা বাঙালীরা কিরূপ বিচ্ছিন্ন, অসহায় ও নিরুপায় হয়ে পড়েছিলাম। বিশ্বের সাথে এবং দেশের কেন্দ্রের সঙ্গে প্রায়

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের সকল যোগাযোগ ও সম্পর্ক ভেঙে পড়েছিলো। অবরুদ্ধ দ্বীপের ন্যায় বাঙলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ কেবলমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা রেখে এক সীমাহীন অনিশ্চয়তার মুখে দিন কাটাচ্ছিল। তথাকথিত শক্তিশালী কেন্দ্রের প্রশাসনযন্ত্র বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে সেদিনের সেই জরুরী প্রয়োজনের দিনেও আমাদের নাগালের বাইরে ছিল। তাই আমার নিজের জন্যে নয়, বাঙলার মানুষের দুঃখের অবসানের জন্যে ১৯৬৬ সালে আমি ৬-দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলাম। এই দাবী হচ্ছে আমাদের স্বাধিকার, স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের দাবী, অঞ্চলে অঞ্চলে যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে, তার অবসানের দাবী। এই দাবী তুলতে গিয়ে আমি নির্যাতিত হয়েছি। একটার পর একটি মিথ্যা মামলা জড়িয়ে আমাকে হয়রানী করা হয়েছে। আমার ছেলেমেয়ে, বৃদ্ধ পিতা মাতা ও আপনাদের কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে কারাগারে আটক করে রাখা হয়েছিল। আমার সহকর্মীদেরকেও একই অন্যায় অত্যাচারের শিকার হতে হয়েছে। সেই দুর্দিনে পরম করুণাময় আল্লাহর আশীবাদ স্বরূপ আপনারাই কেবল আমার সাথে ছিলেন। কোন নেতা নয়, কোন দলপতি নয়, আপনারা–বাঙলার বিপ্লবী, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ও সর্বহারা মানুষ রাতের অন্ধকারে কারফিউ ভেঙে মনুমিয়া, আসাদ, মতিয়ুর, রুস্তম, জহুর, জোহা, আনোয়ারার মতো বাঙলাদেশের দামাল ছেলেমেয়েরা প্রাণ দিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলে আমাকে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কবল থেকে মুক্ত করে এনেছিলেন। সেদিনের কথা আমি ভুলে যাইনি। জীবনে কোনদিন ভুলবো না, ভুলতে পারব না। জীবনে আমি যদি একলাও হয়ে যাই, মিথ্যা আগরতলা মামলার মত আবার যদি মৃত্যুর পরোয়ানা আমার সামনে এসে দাঁড়ায়, তাহলেও আমি শহীদের পবিত্র রক্তের সাথে বেঈমানী করবো না। আপনারা যে ভালবাসা আমার প্রতি আজও অক্ষুন্ন রেখেছেন, জীবনে যদি কোনদিন প্রয়োজন হয় তবে আমার রক্ত দিয়ে হলেও আপনাদের এ ভালবাসার ঋণ পরিশোধ করবো।

প্রিয় ভাইবোনেরা,

বাঙলার যে জননী শিশুকে দুধ দিতে গুলীবিদ্ধ হয়ে তেজগাঁর নাখালপাড়ায় মারা গেল, বাঙলার যে শিক্ষক অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে ঢলে পড়লো, বাঙলার যে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলতে গিয়ে জীবন দিলো, বাঙলার যে ছাত্র স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রামে রাজপথে রাইফেলের সামনে বুক পেতে দিলো, বাঙলার যে কৃষক ধানক্ষেতের আলের পাশে প্রাণ হারালো-তাদের বিদেহী অমর আত্মা বাঙলাদেশের পথে-প্রান্তরে ঘরে-ঘরে ঘুরে ফিরছে এবং অন্যায় অত্যাচারের প্রতিকার দাবী করছে। রক্ত দিয়ে, প্রাণ দিয়ে যে আন্দোলন তারা গড়ে তুলেছিলেন, সে আন্দোলন ৬-দফা ও ১১-দফার। আমি তাদেরই ভাই। আমি জানি, ৬-দফা ও ১১-দফা বাস্তবায়নের পরই তাদের বিদেহী আত্মা শান্তি পাবে। কাজেই আপনারা আওয়ামী লীগের প্রতিটি প্রার্থীকে 'নৌকা' মার্কায় ভোট দিয়ে বাঙলাদেশের প্রতিটি আসনে জয়যুক্ত করে আনুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে জালেমদের ক্ষুরধার নখদন্ত জননী বঙ্গভুমির বক্ষ বিদীর্ণ করে তার হাজারো সন্তানকে কেড়ে নিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমরা জয়যুক্ত হবো।

শহীদের রক্ত বৃথা যেতে পারে না। ন্যায় ও সত্যের সংগ্রামে নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সহায় হবেন।

জয় বাংলা।। পাকিস্তান জিন্দাবাদ।।

নিবেদক–

আপনাদেরই

শেখ মুজিবুর রহমান।

সূত্রঃ হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২, পৃ. ৫৮১-৫৮৩

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১০

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে বিজয়ী সদস্যদের তালিকা

আসন	এলাকা	সংসদ সদস্যের নাম	রাজনৈতিক দল
এনই-১	রংপুর-১	মোজাহের হোসেন	আওয়ামী লীগ
এনই-২	রংপুর-২	রিয়াজউদ্দিন আহমেদ	আওয়ামী লীগ
এনই-৩	রংপুর-৩	সাদেকাত হোসেন	আওয়ামী লীগ
এনই-৪	রংপুর-৪	মোঃ লুৎফর রহমান	আওয়ামী লীগ
এনই-৫	রংপুর-৫	শাহ আবদুল হামিদ	আওয়ামী লীগ
এনই-৬	রংপুর-৬	ডঃ আবু মোঃ সোলাইমান মন্ডল	আওয়ামী লীগ
এনই -৭	রংপুর-৭	মোঃ আজিজুর রহমান	আওয়ামী লীগ
এনই-৮	রংপুর-৮	মোঃ নুরুল হক	আওয়ামী লীগ
এনই-৯	রংপুর-৯	আবদুল আওয়াল	আওয়ামী লীগ
এনই-১০	রংপুর-১০	মতিউর রহমান	আওয়ামী লীগ
এনই-১১	রংপুর-১১	আবদুল রউফ	আওয়ামী লীগ
এনই-১২	রংপুর-১২	আফসার আলী আহমদ	আওয়ামী লীগ
এনই-১৩	দিনাজপুর-১	মোশাররফ হোসেন চৌধুরী	আওয়ামী লীগ
এনই-১৪	দিনাজপুর-২	মোঃ আজিজুর রহমান এড.	আওয়ামী লীগ
এনই-১৫	দিনাজপুর-৩	এ বি এম মোকসেদ আলী	আওয়ামী লীগ
এনই-১৬	দিনাজপুর-৪	অধ্যাপক মোঃ ইউসুফ আলী	আওয়ামী লীগ
এনই-১৭	দিনাজপুর-৫	শাহ মাহতাব আহমদ	আওয়ামী লীগ
এনই-১৮	দিনাজপুর-৬	ডাঃ মোঃ ওয়াকিল উদ্দিন মন্ডল	আওয়ামী লীগ
এনই-১৯	বগুড়া-১	মফিজ চৌধুরী	আওয়ামী লীগ
এনই-২০	বগুড়া-২	মজিবুর রহমান	আওয়ামী লীগ
এনই-২১	বগুড়া-৩	আকবর আলী খান চৌধুরী	আওয়ামী লীগ
এনই-২২	বগুড়া-৪	মোঃ হাবিবুর রহমান	আওয়ামী লীগ
এনই-২৩	বগুড়া-৫	ডাঃ মোঃ জাহিদুর রহমান	আওয়ামী লীগ
এনই-২৪	পাবনা-১	মোতাহার হোসেন তালুকদার	আওয়ামী লীগ
এনই -২৫	পাবনা-২	মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ	আওয়ামী লীগ
এনই-২৬	পাবনা-৩	আবদুল মমিন তালুকদার	আওয়ামী লীগ
এনই-২৭	পাবনা-৪	সৈয়দ হোসেন মনসুর	আওয়ামী লীগ
এনই-২৮	পাবনা-৫	আবু সাইদ	আওয়ামী লীগ
এনই-২৯	পাবনা-৬	মোঃ আমজাদ হোসেন	আওয়ামী লীগ
এনই-৩০	রাজশাহী-১	আতাউর রহমান তালুকদার	আওয়ামী লীগ
এনই-৩১	রাজশাহী-২	আজিজুর রহমান	আওয়ামী লীগ
এনই-৩২	রাজশাহী-৩	মোঃ বায়েতুল্লাহ	আওয়ামী লীগ
এনই-৩৩	রাজশাহী-৪	মোঃ খালেদ আলী মিয়া	আওয়ামী লীগ

Dhaka University Institutional Repository

এনই-৩৪	রাজশাহী-৫	রাইসুউদ্দিন আহমেদ	আওয়ামী লীগ
এনই-৩৫	রাজশাহী-৬	এ এইচ এম কামরুজ্জামান	আওয়ামী লীগ
এনই-৩৬	রাজশাহী-৭	শাহ মোঃ জাফরউল্লাহ	আওয়ামী লীগ
এনই-৩৭	রাজশাহী-৮	মোঃ নাজমুল হক সরকার	আওয়ামী লীগ
এনই-৩৮	রাজশাহী-৯	ডাঃ শেখ মোবারক হোসেন	আওয়ামী লীগ
এনই-৩৯	কুষ্টিয়া-১	ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম	আওয়ামী লীগ
এনই-৪০	কুষ্টিয়া-২	আজিজুর রহমান আক্কাস	আওয়ামী লীগ
এনই-৪১	কুষ্টিয়া-৩	কফিলউদ্দিন	আওয়ামী লীগ
এনই-৪২	কুষ্টিয়া-৪	আবু আহমেদ আফজালুর রশিদ	আওয়ামী লীগ
এনই-৪৩	যশোহর-১	কামরুজ্জামান	আওয়ামী লীগ
এনই-৪৪	যশোহর-২	ইকবাল আনোয়ারুল ইসলাম	আওয়ামী লীগ
এনই-৪৫	যশোহর-৩	মোঃ মশিউর রহমান	আওয়ামী লীগ
এনই-৪৬	যশোহর-৪	সুবোধ কুমার মিত্র	আওয়ামী লীগ
এনই-৪৭	যশোহর-৫	মোঃ রওশন আলী	আওয়ামী লীগ
এনই-৪৮	যশোহর-৬	মোঃ সোহরাব হোসেন	আওয়ামী লীগ
এনই-৪৯	যশোহর-৭	খন্দকার আবদুল হাফিজ	আওয়ামী লীগ
এনই-৫০	খুলনা-১	আবুল খায়ের	আওয়ামী লীগ
এনই-৫১	খুলনা-২	শেখ আবদুল আজিজ	আওয়ামী লীগ
এনই-৫২	খুলনা-৩	মোঃ লুৎফর রহমান	আওয়ামী লীগ
এনই-৫৩	খুলনা-৪	এম এ গফুর	আওয়ামী লীগ
এনই-৫৪	খুলনা-৫	মোঃ মহসিন	আওয়ামী লীগ
এনই-৫৫	খুলনা-৬	সালাহউদ্দিন ইউসুফ	আওয়ামী লীগ
এনই-৫৬	খুলনা-৭	মোঃ আবদুর গফুর	আওয়ামী লীগ
এনই৫৭	খুলনা-৮	সৈয়দ কামাল বখত	আওয়ামী লীগ
এনই-৫৮	বাকেরগঞ্জ-১	আবদুর রব সেরনিয়াবাত	আওয়ামী লীগ
এনই-৫৯	বাকেরগঞ্জ-২	সালাহউদ্দিন আহমেদ	আওয়ামী লীগ
এনই-৬০	বাকেরগঞ্জ-৩	মোঃ নুরুল ইসলাম মঞ্জুর	আওয়ামী লীগ
এনই-৬১	বাকেরগঞ্জ-৪	মোঃ আবদুল বারেক	আওয়ামী লীগ
এনই-৬২	বাকেরগঞ্জ-৫	মোঃ মান্নান হাওলাদার	আওয়ামী লীগ
এনই-৬৩	বাকেরগঞ্জ-৬	তোফায়েল আহমেদ	আওয়ামী লীগ
এনই-৬৪	বাকেরগঞ্জ-৭	ডাঃ আজহার উদ্দিন আহমেদ	আওয়ামী লীগ
এনই-৬৫	বাকেরগঞ্জ-৮	এ কে ফাইজুল হক	আওয়ামী লীগ
এনই-৬৬	বাকেরগঞ্জ-৯	এনায়েত হোসেন খান	আওয়ামী লীগ
এনই-৬৭	বাকেরগঞ্জ-১০	মোঃ শামসুল হক	আওয়ামী লীগ
এনই-৬৮	পটুয়াখালী-১	গোলাম আহাদ চৌধুরী	আওয়ামী লীগ
এনই-৬৯	পটুয়াখালী-২	আবদুল হাদী তালুকদার	আওয়ামী লীগ
এনই-৭০	পটুয়াখালী-৩	আজমত আলী শিকদার	আওয়ামী লীগ
এনই-৭১	টাংগাইল-১	আবদুল মান্নান	আওয়ামী লীগ

Dhaka University Institutional Repository

এনই-৭২	টাংগাইল-২	মোঃ শওকত আলী খান	আওয়ামী লীগ
এনই-৭৩	টাংগাইল-৩	অধ্যক্ষ হুমায়ন খালিদ	আওয়ামী লীগ
এনই-৭৪	টাংগাইল-৪	হাতেম আলী তালুকদার	আওয়ামী লীগ
এনই-৭৫	টাংগাইল-৫	শামসুর রহমান খান	আওয়ামী লীগ
এনই-৭৬	ময়মনসিংহ-১	মোঃ আবদুস সামাদ	আওয়ামী লীগ
এনই-৭৭	ময়মনসিংহ-২	করিমুজ্জামান তালুকদার	আওয়ামী লীগ
এনই-৭৮	ময়মনসিংহ-৩	মোঃ আবদুল হাকিম এড.	আওয়ামী লীগ
এনই-৭৯	ময়মনসিংহ-৪	মোঃ আনিসুর রহমান	আওয়ামী লীগ
এনই-৮০	ময়মনসিংহ-৫	আবদুল হাকিম সরকার	আওয়ামী লীগ
এনই-৮১	ময়মনসিংহ-৬	মোশাররফ হোসেন আজাদ	আওয়ামী লীগ
এনই-৮২	ময়মনসিংহ-৭	মোহাম্মদ ইব্রাহীম এড.	আওয়ামী লীগ
এনই-৮৩	ময়মনসিংহ-৮	নুরুল আমীন	পিডিপি
এনই-৮৪	ময়মনসিংহ-৯	সৈয়দ আবদুস সুলতান	আওয়ামী লীগ
এনই-৮৫	ময়মনসিংহ-১০	এ এম এম নজরুল ইসলাম	আওয়ামী লীগ
এনই-৮৬	ময়মনসিংহ-১১	মোঃ শামসুল হুদা	আওয়ামী লীগ
এনই-৮৭	ময়মনসিংহ-১২	সদরুদ্দিন	আওয়ামী লীগ
এনই-৮৮	ময়মনসিংহ-১৩	আবদুল মোমিন	আওয়ামী লীগ
এনই-৮৯	ময়মনসিংহ-১৪	জুবেদ আলী	আওয়ামী লীগ
এনই-৯০	ময়মনসিংহ-১৫	আসাদুজ্জামান খান এড.	আওয়ামী লীগ
এনই-৯১	ময়মনসিংহ-১৬	জিল্লুর রহমান খান এড.	আওয়ামী লীগ
এনই-৯২	ময়মনসিংহ-১৭	সৈয়দ নজরুল ইসলাম	আওয়ামী লীগ
এনই-৯৩	ময়মনসিংহ-১৮	আবদুল হামিদ এড.	আওয়ামী লীগ
এনই-৯৪	ফরিদপুর-১	এ বি এম নুরুল ইসলাম	আওয়ামী লীগ
এনই-৯৫	ফরিদপুর-২	সৈয়দ কামরুল ইসলাম	আওয়ামী লীগ
এনই-৯৬	ফরিদপুর-৩	কে এম ওবায়দুর রহমান	আওয়ামী লীগ
এনই-৯৭	ফরিদপুর-৪	শামসুদ্দিন মোল্লা	আওয়ামী লীগ
এনই-৯৮	ফরিদপুর-৫	মোঃ আবুল খায়ের	আওয়ামী লীগ
এনই-৯৯	ফরিদপুর-৬	মোল্লা জালালউদ্দিন আহমেদ	আওয়ামী লীগ
এনই-১০০	ফরিদপুর-৭	আদেল উদ্দিন আহমেদ	আওয়ামী লীগ
এনই-১০১	ফরিদপুর-৮	আমজাদ হোসেন খান	আওয়ামী লীগ
এনই-১০২	ফরিদপুর-৯	আবিদুর রেজা খান	আওয়ামী লীগ
এনই-১০৩	ফরিদপুর-১০	ডাঃ এম কাশেম	আওয়ামী লীগ
এনই-১০৪	ঢাকা-১	মোঃ নুরুল ইসলাম	আওয়ামী লীগ
এনই-১০৫	ঢাকা-২	মোছলেহ উদ্দীন খান	আওয়ামী লীগ
এনই-১০৬	ঢাকা-৩	খন্দকার নুরুল ইসলাম	আওয়ামী লীগ
এনই-১০৭	ঢাকা-৪	শামসুল হক	আওয়ামী লীগ
এনই-১০৮	ঢাকা-৫	তাজউদ্দিন আহমেদ	আওয়ামী লীগ
এনই-১০৯	ঢাকা-৬	আশরাফ আলী চৌধুরী	আওয়ামী লীগ

Dhaka University Institutional Repository

এনই-১১০	ঢাকা-৭	জহির উদ্দিন	আওয়ামী লীগ
এনই-১১১	ঢাকা-৮	শেখ মুজিবুর রহমান	আওয়ামী লীগ
এনই-১১২	ঢাকা-৯	ড. কামাল হোসেন	আওয়ামী লীগ
এনই-১১৩	ঢাকা-১০	ফজলুর রহমান ভূঞা	আওয়ামী লীগ
এনই-১১৪	ঢাকা-১১	আফতাব উদ্দিন ভূঞা	আওয়ামী লীগ
এনই-১১৫	ঢাকা-১২	আবদুর রাজ্জাক ভূঞা	আওয়ামী লীগ
এনই-১১৬	ঢাকা-১৩	মোঃ শহর আলী মিঞা	আওয়ামী লীগ
এনই-১১৭	ঢাকা-১৪	এ কে এম শামসুজ্জোহা	আওয়ামী লীগ
এনই-১১৮	ঢাকা-১৫	কফিলউদ্দিন চৌধুরী	আওয়ামী লীগ
এনই-১১৯	ঢাকা-১৬	আবদুল করিম ব্যাপারী	আওয়ামী লীগ
এনই-১২০	সিলেট-১	মোস্তফা আলী	আওয়ামী লীগ
এনই-১২১	সিলেট-২	মোঃ আবদুর রব	আওয়ামী লীগ
এনই-১২২	সিলেট-৩	এ কে লতিফুর রহমান সিদ্দিকী	আওয়ামী লীগ
এনই-১২৩	সিলেট-৪	মোঃ ইলিয়াস	আওয়ামী লীগ
এনই-১২৪	সিলেট-৫	আবদুল মোনতাকিব চৌধুরী	আওয়ামী লীগ
এনই-১২৫	সিলেট-৬	আতাউল গণী ওসমানী	আওয়ামী লীগ
এনই-১২৬	সিলেট-৭	আবদুর রহিম	আওয়ামী লীগ
এনই-১২৭	সিলেট-৮	দেওয়ান ফরিদ গাজী	আওয়ামী লীগ
এনই-১২৮	সিলেট-৯	আবদুল হক এড.	আওয়ামী লীগ
এনই-১২৯	সিলেট-১০	আবদুস সামাদ আজাদ	আওয়ামী লীগ
এনই-১৩০	সিলেট-১১	ডি এইচ ওবায়দুর রেজা চৌধুরী	আওয়ামী লীগ
এনই-১৩১	কুমিল্লা-১	তাহের উদ্দিন ঠাকুর	আওয়ামী লীগ
এনই-১৩২	কুমিল্লা-২	আলী আজম	আওয়ামী লীগ
এনই-১৩৩	কুমিল্লা-৩	দেওয়ান আবদুল আব্বাস	আওয়ামী লীগ
এনই-১৩৪	কুমিল্লা-৪	সিরাজুল হক	আওয়ামী লীগ
এনই-১৩৫	কুমিল্লা-৫	খোরশেদ আলম	আওয়ামী লীগ
এনই-১৩৬	কুমিল্লা-৬	কাজী জহিরুল কাইউম	আওয়ামী লীগ
এনই-১৩৭	কুমিল্লা-৭	এ এম আহমেদ খালেক	আওয়ামী লীগ
এনই-১৩৮	কুমিল্লা-৮	খন্দকার মোশতাক আহমেদ	আওয়ামী লীগ
এনই-১৩৯	কুমিল্লা-৯	আবুল হাশেম	আওয়ামী লীগ
এনই-১৪০	কুমিল্লা-১০	মোঃ সুজাত আলী	আওয়ামী লীগ
এনই-১৪১	কুমিল্লা-১১	আবদুর আউয়াল	আওয়ামী লীগ
এনই-১৪২	কুমিল্লা-১২	হাফেজ হাবিবুর রহমান	আওয়ামী লীগ
এনই-১৪৩	কুমিল্লা-১৩	মোঃ ওলি উল্লাহ	আওয়ামী লীগ
এনই-১৪৪	কুমিল্লা-১৪	মিজানুর রহমান চৌধুরী	আওয়ামী লীগ
এনই-১৪৫	নোয়াখালী-১	মোঃ ওবায়দুল্লাহ মজুমদার	আওয়ামী লীগ
এনই-১৪৬	নোয়াখালী-২	খাজা আহমেদ	আওয়ামী লীগ
এনই-১৪৭	নোয়াখালী-৩	নুরুল হক	আওয়ামী লীগ

Dhaka University Institutional Repository

এনই-১৪৮	নোয়াখালী-৪	আবদুল মালেক উকিল	আওয়ামী লীগ
এনই-১৪৯	নোয়াখালী-৫	দেলোয়ার হোসেন এড.	আওয়ামী লীগ
এনই-১৫০	নোয়াখালী-৬	খালেদ মোহাম্মদ আলী	আওয়ামী লীগ
এনই-১৫১	নোয়াখালী-৭	মোহাম্মদ হানিফ	আওয়ামী লীগ
এনই-১৫২	নোয়াখালী-৮	মোঃ আবদুর রশিদ	আওয়ামী লীগ
এনই-১৫৩	চট্টগ্রাম-১	মোস্তাফিজুর রহমান সিদ্দিক	আওয়ামী লীগ
এনই-১৫৪	চট্টগ্রাম-২	এম এ মজিদ	আওয়ামী লীগ
এনই-১৫৫	চট্টগ্রাম-৩	মোঃ ইদ্রিস	আওয়ামী লীগ
এনই-১৫৬	চট্টগ্রাম-৪	সৈয়দ ফজলুল হক	আওয়ামী লীগ
এনই-১৫৭	চট্টগ্রাম-৫	মোহাম্মদ খালেদ	আওয়ামী লীগ
এনই-১৫৮	চট্টগ্রাম-৬	নুরুল ইসলাম চৌধুরী	আওয়ামী লীগ
এনই-১৫৯	চট্টগ্রাম-৭	আতাউর রহমান খান	আওয়ামী লীগ
এনই-১৬০	চট্টগ্রাম-৮	আবু সালেহ	আওয়ামী লীগ
এনই-১৬১	চট্টগ্রাম-৯	নুর আহমেদ	আওয়ামী লীগ
এনই-১৬২	পার্বত্য চট্টগ্রাম-১	রাজা ত্রিদিব রায়	স্বতন্ত্র
এনই-১৬৩	মহিলা আসন-১	নুরজাহান মোর্শেদ	আওয়ামী লীগ
এনই-১৬৪	মহিলা আসন-২	রাফিয়া আখতার ডলি	আওয়ামী লীগ
এনই-১৬৫	মহিলা আসন-৩	সাজেদা চৌধুরী	আওয়ামী লীগ
এনই-১৬৬	মহিলা আসন-৪	মমতাজ বেগম	আওয়ামী লীগ
এনই-১৬৭	মহিলা আসন-৫	রাজিয়া বানু	আওয়ামী লীগ
এনই-১৬৮	মহিলা আসন-৬	তসলিমা আবেদ	আওয়ামী লীগ
এনই-১৬৯	মহিলা আসন-৭	বদরুনেছা আহমদ	আওয়ামী লীগ

সূত্রঃ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮-১০ ডিসেম্বর ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১১

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদে বিজয়ী সদস্যদের তালিকা

আসন	এলাকা	সংসদ সদস্যের নাম	রাজনৈতিক দল
পিই-১	রংপুর-১	আবদুর রহমান চৌধুরী	আওয়ামী লীগ
পিই-২	রংপুর-২	মোহাম্মদ আমিন	আওয়ামী লীগ
পিই-৩	রংপুর-৩	আজহারুল ইসলাম	আওয়ামী লীগ
পিই-৪	রংপুর-৪	ডাঃ জিকরুল হক	আওয়ামী লীগ
পিই-৫	রংপুর-৫	আবিদ আলী	আওয়ামী লীগ
পিই-৬	রংপুর-৬	করিমউদ্দিন আহমেদ	আওয়ামী লীগ
পিই-৭	রংপুর-৭	এলাহী বক্স সরকার	আওয়ামী লীগ
পিই-৮	রংপুর-৮	মোঃ সিদ্দিক হোসেন	আওয়ামী লীগ
পিই-৯	রংপুর-৯	শাহ আবদুর রাজ্জাক	আওয়ামী লীগ
পিই-১০	রংপুর-১০	মোঃ হামিদুজ্জামান সরকার	আওয়ামী লীগ
পিই-১১	রংপুর-১১	মোঃ গাজী রহমান	আওয়ামী লীগ
পিই-১২	রংপুর-১২	শামসুল হক চৌধুরী	আওয়ামী লীগ
পিই-১৩	রংপুর-১৩	আবদুল হাকিম	আওয়ামী লীগ
পিই-১৪	রংপুর-১৪	আবুল হোসেন	আওয়ামী লীগ
পিই-১৫	রংপুর-১৫	আবদুল্লাহ সোরওয়ার্দী	আওয়ামী লীগ
পিই-১৬	রংপুর-১৬	নুরুল ইসলাম	আওয়ামী লীগ
পিই-১৭	রংপুর-১৭	শামসুল হোসেন	আওয়ামী লীগ
পিই-১৮	রংপুর-১৮	এম এ তালেব মিয়া	আওয়ামী লীগ
পিই-১৯	রংপুর-১৯	মোঃ ওয়ালিউর রহমান	আওয়ামী লীগ
পিই-২০	রংপুর-২০	ডাঃ মফিজুর রহমান	আওয়ামী লীগ
পিই-২১	রংপুর-২১	জামালুর রহমান প্রধান	আওয়ামী লীগ
পিই-২২	রংপুর-২২	আজিজুর রহমান	আওয়ামী লীগ
পিই-২৩	দিনাজপুর-১	কামরুদ্দিন আহমেদ	আওয়ামী লীগ
পিই-২৪	দিনাজপুর-২	সিরাজুল ইসলাম এড.	আওয়ামী লীগ
পিই-২৫	দিনাজপুর-৩	মোঃ ফজলুর করিম	আওয়ামী লীগ
পিই-২৬	দিনাজপুর-৪	মোঃ একরামুল হক	আওয়ামী লীগ
পিই-২৭	দিনাজপুর-৫	মোঃ গোলাম রহমান	আওয়ামী লীগ
পিই-২৮	দিনাজপুর-৬	এস এম ইউসুফ	আওয়ামী লীগ
পিই-২৯	দিনাজপুর-৭	মোঃ আবদুর রহিম	আওয়ামী লীগ
পিই-৩০	দিনাজপুর-৮	মোঃ খতিবুর রহমান	আওয়ামী লীগ
পিই-৩১	দিনাজপুর-৯	সাদার মোশারফ হোসেন	আওয়ামী লীগ
পিই-৩২	দিনাজপুর-১০	কাজী আবদুল মজিদ চৌধুরী	আওয়ামী লীগ
পিই-৩৩	বগুড়া-১	সাইদুর রহমান	আওয়ামী লীগ
পিই-৩৪	বগুড়া-২	কাছিম উদ্দিন আহমেদ	আওয়ামী লীগ
পিই-৩৫	বগুড়া-৩	শেখ আবুল হাসনাত চৌধুরী	আওয়ামী লীগ
পিই-৩৬	বগুড়া-৪	মোজাফর হেসেন	আওয়ামী লীগ
পিই-৩৭	বগুড়া-৫	হাসেন আলী সরকার	আওয়ামী লীগ
পিই-৩৮	বগুড়া-৬	তাহেরুল ইসলাম খান	আওয়ামী লীগ

Dhaka University Institutional Repository

পিই-৩৯	বগুড়া-৭	ডাঃ মোঃ গোলাম সারোয়ার	আওয়ামী লীগ
পিই-৪০	বগুড়া-৮	মোঃ আবদুর রহমান ফকির	জামায়াতে ইসলামি
পিই-৪১	বগুড়া-৯	মোঃ মাহমুদুল হাসান খান	আওয়ামী লীগ
পিই-৪২	রাজশাহী-১	ডাঃ মাইনুদ্দিন আহমেদ	আওয়ামী লীগ
পিই-৪৩	রাজশাহী-২	এন এ হামিদুর রহমান	আওয়ামী লীগ
পিই-৪৪	রাজশাহী-৩	ডাঃ এ এ এস মেজবাহুল হক	আওয়ামী লীগ
পিই-৪৫	রাজশাহী-৪	ডাঃ মোঃ বসিরুল হক	আওয়ামী লীগ
পিই-৪৬	রাজশাহী-৫	কাজিমদার ওয়াসিমুদ্দিন আহমেদ	আওয়ামী লীগ
পিই-৪৭	রাজশাহী-৬	ক্যা. ইসমাইল হোসেন চৌধুরী	আওয়ামী লীগ
পিই-৪৮	রাজশাহী-৭	ইমাজউদ্দিন প্রামাণিক	আওয়ামী লীগ
পিই-৪৯	রাজশাহী-৮	গিয়াসউদ্দিন সরদার	আওয়ামী লীগ
পিই-৫০	রাজশাহী-৯	মোঃ আজিজুল ইসলাম খান	আওয়ামী লীগ
পিই-৫১	রাজশাহী-১০	রিয়াজউদ্দিন আহমেদ	আওয়ামী লীগ
পিই-৫২	রাজশাহী-১১	আবদুল হাদী	আওয়ামী লীগ
পিই-৫৩	রাজশাহী-১২	সরদার আমজাদ হোসেন	আওয়ামী লীগ
পিই-৫৪	রাজশাহী-১৩	ডাঃ মোঃ আলাউদ্দিন	আওয়ামী লীগ
পিই-৫৫	রাজশাহী-১৪	জিল্লুর রহমান	আওয়ামী লীগ
পিই-৫৬	রাজশাহী-১৫	শংকর গোবিন্দ চৌধুরী	আওয়ামী লীগ
পিই-৫৭	রাজশাহী-১৬	আশরাফুল ইসলাম মিয়া	আওয়ামী লীগ
পিই-৫৮	রাজশাহী-১৭	মোঃ আবদুস সালাম	আওয়ামী লীগ
পিই-৫৯	পাবনা-১	এম মনসুর আলী	আওয়ামী লীগ
পিই-৬০	পাবনা-২	সৈয়দ হায়দার আলী	আওয়ামী লীগ
পিই-৬১	পাবনা-৩	রওশানুল হক	আওয়ামী লীগ
পিই-৬২	পাবনা-৪	গোলাম হাসনাইন	আওয়ামী লীগ
পিই-৬৩	পাবনা-৫	কে বি এম আবু হেনা	আওয়ামী লীগ
পিই-৬৪	পাবনা-৬	এ বি এম মাহবুবুল ইসলাম	আওয়ামী লীগ
পিই-৬৫	পাবনা-৭	আবদুর রহমান	আওয়ামী লীগ
পিই-৬৬	পাবনা-৮	মোহাম্মদ রফিক	আওয়ামী লীগ
পিই-৬৭	পাবনা-৯	তফিজউদ্দিন আহমেদ	আওয়ামী লীগ
পিই-৬৮	পাবনা-১০	মোঃ মোজাম্মেল হক	আওয়ামী লীগ
পিই-৬৯	পাবনা-১১	আমিন উদ্দিন	আওয়ামী লীগ
পিই-৭০	পাবনা-১২	মোঃ আবদুর রব	আওয়ামী লীগ
পিই-৭১	কুষ্টিয়া-১	জহুরুল হক	আওয়ামী লীগ
পিই-৭২	কুষ্টিয়া-২	আবদুর রব চৌধুরী	আওয়ামী লীগ
পিই-৭৩	কুষ্টিয়া-৩	আহসান উল্লাহ	আওয়ামী লীগ
পিই-৭৪	কুষ্টিয়া-৪	গোলাম কিবরিয়া	আওয়ামী লীগ
পিই-৭৫	কুষ্টিয়া-৫	নুরুল হক	আওয়ামী লীগ
পিই-৭৬	কুষ্টিয়া-৬	ডাঃ আহসানুল হক	আওয়ামী লীগ
পিই-৭৭	কুষ্টিয়া-৭	ইউনুছ আলী	আওয়ামী লীগ
পিই-৭৮	যশোহর-১	কাজী খাদেমুল ইসলাম	আওয়ামী লীগ
পিই-৭৯	যশোহর-২	এ বি এম গোলাম মজিদ	আওয়ামী লীগ
পিই-৮০	যশোহর-৩	জে কে এম এ আজিজ	আওয়ামী লীগ
পিই-৮১	যশোহর-৪	মোঃ মাঈনদ্দিন	আওয়ামী লীগ
পিই-৮২	যশোহর-৫	মোঃ তবিবুর রহমান সরদার	আওয়ামী লীগ

Dhaka University Institutional Repository

পিই-৮৩	যশোহর-৬	মোঃ আবু ইসলাম	আওয়ামী লীগ
পিই-৮৪	যশোহর-৭	মোঃ নুরুল ইসলাম	আওয়ামী লীগ
পিই-৮৫	যশোহর-৮	শাহ বদিউজ্জামান	আওয়ামী লীগ
পিই-৮৬	যশোহর-৯	মোঃ মোশাররফ হোসেন	আওয়ামী লীগ
পিই-৮৭	যশোহর-১০	আসাদুজ্জামান	আওয়ামী লীগ
পিই-৮৮	যশোহর-১১	সৈয়দ আতাহার আলী	আওয়ামী লীগ
পিই-৮৯	যশোহর-১২	শহীদ আলী খান	আওয়ামী লীগ
পিই-৯০	যশোহর-১৩	এস এম মতিউর রহমান	আওয়ামী লীগ
পিই-৯১	খুলনা-১	শেখ আলী আহমেদ	আওয়ামী লীগ
পিই-৯২	খুলনা-২	আবদুর রহমান শেখ	আওয়ামী লীগ
পিই-৯৩	খুলনা-৩	মীর শওকত আলী	আওয়ামী লীগ
পিই-৯৪	খুলনা-৪	আবদুল লতিফ খান	আওয়ামী লীগ
পিই-৯৫	খুলনা-৫	কুবের চন্দ্র বিশ্বাস	আওয়ামী লীগ
পিই-৯৬	খুলনা-৬	হাবিবুর রহমান খান	আওয়ামী লীগ
পিই-৯৭	খুলনা-৭	ডাঃ মনসুর আলী	আওয়ামী লীগ
পিই-৯৮	খুলনা-৮	এনায়েত আলী সানা	আওয়ামী লীগ
পিই-৯৯	খুলনা-৯	মমিন উদ্দিন আহমেদ	আওয়ামী লীগ
পিই-১০০	খুলনা-১০	মোহাম্মদ সাইদ	আওয়ামী লীগ
পিই-১০১	খুলনা-১১	ফজলুল হক সরদার	আওয়ামী লীগ
পিই-১০২	খুলনা-১২	মোঃ খায়রুল আলম	আওয়ামী লীগ
পিই-১০৩	খুলনা-১৩	মমতাজ আহমেদ সরদার	আওয়ামী লীগ
পিই-১০৪	খুলনা-১৪	এস এম আলাউদ্দিন	আওয়ামী লীগ
পিই-১০৫	পটুয়াখালী-১	মোঃ রোস্তম আলী খান	আওয়ামী লীগ
পিই-১০৬	পটুয়াখালী-২	শাহজাদা আবদুল মালেক খান	আওয়ামী লীগ
পিই-১০৭	পটুয়াখালী-৩	এ কে এম নুরুল হক	আওয়ামী লীগ
পিই-১০৮	পটুয়াখালী-৪	মজিবুর রহমান তালুকদার	আওয়ামী লীগ
পিই-১০৯	পটুয়াখালী-৫	সৈয়দ মোঃ আবুল হাসেম	আওয়ামী লীগ
পিই-১১০	পটুয়াখালী-৬	আবদুল আজিজ খন্দকার	আওয়ামী লীগ
পিই-১১১	পটুয়াখালী-৭	আবদুর বারেক	আওয়ামী লীগ
পিই-১১২	বাকেরগঞ্জ-১	মোশারফ হোসেন মিয়া	আওয়ামী লীগ
পিই-১১৩	বাকেরগঞ্জ-২	মোঃ নজরুল ইসলাম	আওয়ামী লীগ
পিই-১১৪	বাকেরগঞ্জ-৩	মোঃ মোতাহার উদ্দিন	আওয়ামী লীগ
পিই-১১৫	বাকেরগঞ্জ-৪	রিয়াজ ইকরিম চৌধুরী	আওয়ামী লীগ
পিই-১১৬	বাকেরগঞ্জ-৫	মোজাম্মেল হোসেন	আওয়ামী লীগ
পিই-১১৭	বাকেরগঞ্জ-৬	কবির উদ্দিন আহমেদ	আওয়ামী লীগ
পিই-১১৮	বাকেরগঞ্জ-৭	এ কে এস ইসমাইল মিয়া	আওয়ামী লীগ
পিই-১১৯	বাকেরগঞ্জ-৮	মোঃ আমির হোসেন	আওয়ামী লীগ
পিই-১২০	বাকেরগঞ্জ-৯	ফজলুল হক তালুকদার	আওয়ামী লীগ
পিই-১২১	বাকেরগঞ্জ-১০	মহিউদ্দিন আহমেদ	আওয়ামী লীগ
পিই-১২২	বাকেরগঞ্জ-১১	এ কে এস নূরুল করিম	আওয়ামী লীগ
পিই-১২৩	বাকেরগঞ্জ-১২	হরনাইথ বাইন	স্বতন্ত্র
পিই-১২৪	বাকেরগঞ্জ-১৩	আবদুল করিম সরদার	আওয়ামী লীগ
পিই-১২৫	বাকেরগঞ্জ-১৪	ডাঃ শাহ মোজহার উদ্দিন	আওয়ামী লীগ
পিই-১২৬	বাকেরগঞ্জ-১৫	ক্ষিতিশ চন্দ্র মন্ডল	আওয়ামী লীগ

Dhaka University Institutional Repository

পিই-১২৭	বাকেরগঞ্জ-১৬	ডাঃ আবদুল হাই	আওয়ামী লীগ
পিই-১২৮	বাকেরগঞ্জ-১৭	নুরুল ইসলাম	আওয়ামী লীগ
পিই-১২৯	বাকেরগঞ্জ-১৮	শওকাতুল আলম সগীর	আওয়ামী লীগ
পিই-১৩০	টাংগাইল-১	ডাঃ শেখ নিজামুল ইসলাম	আওয়ামী লীগ
পিই-১৩১	টাংগাইল-২	বদিউজ্জামান খান	আওয়ামী লীগ
পিই-১৩২	টাংগাইল-৩	এম এ বাছেদ সিদ্দিকী	আওয়ামী লীগ
পিই-১৩৩	টাংগাইল-৪	আবদুল লতিফ সিদ্দিকী	আওয়ামী লীগ
পিই-১৩৪	টাংগাইল-৫	মোঃ ইনসান আলী মোক্তার	আওয়ামী লীগ
পিই-১৩৫	টাংগাইল-৬	মির্জা তোফায়েল হোসেন মুকুল	আওয়ামী লীগ
পিই-১৩৬	টাংগাইল-৭	সেতাব আলী খান	আওয়ামী লীগ
পিই-১৩৭	টাংগাইল-৮	ফজলুর রহমান খান	আওয়ামী লীগ
পিই-১৩৮	টাংগাইল-৯	মোঃ শামসুদ্দিন আহমেদ	আওয়ামী লীগ
পিই-১৩৯	ময়মনসিংহ-১	মোঃ আশরাফ হোসেন	আওয়ামী লীগ
পিই-১৪০	ময়মনসিংহ-২	মোঃ রাশেদ মোশাররফ	আওয়ামী লীগ
পিই-১৪১	ময়মনসিংহ-৩	মোঃ আবদুল হাই	আওয়ামী লীগ
পিই-১৪২	ময়মনসিংহ-৪	আবদুল মালেক	আওয়ামী লীগ
পিই-১৪৩	ময়মনসিংহ-৫	আখতারুজ্জামান	আওয়ামী লীগ
পিই-১৪৪	ময়মনসিংহ-৬	নিজাম উদ্দিন আহমদ	আওয়ামী লীগ
পিই-১৪৫	ময়মনসিংহ-৭	ডাঃ নাছিরুজ্জামান খান	আওয়ামী লীগ
পিই-১৪৬	ময়মনসিংহ-৮	মোঃ আবদুল হালিম	আওয়ামী লীগ
পিই-১৪৭	ময়মনসিংহ-৯	কুদরুত্ উল্লাহ	আওয়ামী লীগ
পিই-১৪৮	ময়মনসিংহ-১০	শামসুল হক	আওয়ামী লীগ
পিই-১৪৯	ময়মনসিংহ-১১	হাতেম আলী মিয়া	আওয়ামী লীগ
পিই-১৫০	ময়মনসিংহ-১২	মোঃ আবদুল মতিন ভূঞা	পিডিপি
পিই-১৫১	ময়মনসিংহ-১৩	এ কে মোশাররফ হোসেন	পিডিপি
পিই-১৫২	ময়মনসিংহ-১৪	মোঃ ইনাম আলী মিয়া	আওয়ামী লীগ
পিই-১৫৩	ময়মনসিংহ-১৫	খন্দকার আবদুল মালেক শহীদুল্লাহ	আওয়ামী লীগ
পিই-১৫৪	ময়মনসিংহ-১৬	মোঃ মোছলেম উদ্দিন	আওয়ামী লীগ
পিই-১৫৫	ময়মনসিংহ-১৭	আবুল মনসুর আহমেদ	আওয়ামী লীগ
পিই-১৫৬	ময়মনসিংহ-১৮	মোস্তফা এম এ মতিন	আওয়ামী লীগ
পিই-১৫৭	ময়মনসিংহ-১৯	মোঃ আবদুল হাশেম	আওয়ামী লীগ
পিই-১৫৮	ময়মনসিংহ-২০	আবদুল মজিদ তারা মিয়া	আওয়ামী লীগ
পিই-১৫৯	ময়মনসিংহ-২১	নাজমুল হুদা	আওয়ামী লীগ
পিই-১৬০	ময়মনসিংহ-২২	ডাঃ আখলাকুল হোসেন	আওয়ামী লীগ
পিই-১৬১	ময়মনসিংহ-২৩	আব্বাস আলী খান	আওয়ামী লীগ
পিই-১৬২	ময়মনসিংহ-২৪	হাফিছ্ উদ্দিন চৌধুরী	আওয়ামী লীগ
পিই-১৬৩	ময়মনসিংহ-২৫	আবদুল খালেক	আওয়ামী লীগ
পিই-১৬৪	ময়মনসিংহ-২৬	এ কে এম শামসুল হক	আওয়ামী লীগ
পিই-১৬৫	ময়মনসিংহ-২৭	মোস্তাফিজুর রহমান খান	আওয়ামী লীগ
পিই-১৬৬	ময়মনসিংহ-২৮	এম এ সাত্তার	আওয়ামী লীগ
পিই-১৬৭	ময়মনসিংহ-২৯	এম এ কুদ্দুছ	আওয়ামী লীগ
পিই-১৬৮	ময়মনসিংহ-৩০	আবদুল কাদের	আওয়ামী লীগ
পিই-১৬৯	ময়মনসিংহ-৩১	মঞ্জুর আহমেদ	আওয়ামী লীগ
পিই-১৭০	ময়মনসিংহ-৩২	সৈয়দ বদরুজ্জামান	আওয়ামী লীগ

Dhaka University Institutional Repository

পিই-১৭১	ঢাকা-১	মোঃ সিদ্দিকুর রহমান	আওয়ামী লীগ
পিই-১৭২	ঢাকা-২	আখতারউদ্দিন বিশ্বাস	আওয়ামী লীগ
পিই-১৭৩	ঢাকা-৩	খন্দকার মাজহারুল হক	আওয়ামী লীগ
পিই-১৭৪	ঢাকা-৪	মীর আবদুল খায়ের	আওয়ামী লীগ
পিই-১৭৫	ঢাকা-৫	শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন	আওয়ামী লীগ
পিই-১৭৬	ঢাকা-৬	জামাল উদ্দিন চৌধুরী	আওয়ামী লীগ
পিই-১৭৭	ঢাকা-৭	মোঃ শামসুল হক মিয়া	আওয়ামী লীগ
পিই-১৭৮	ঢাকা-৮	এ কে এম শামসুল হুদা	আওয়ামী লীগ
পিই-১৭৯	ঢাকা-৯	রফিউদ্দিন আহমেদ	আওয়ামী লীগ
পিই-১৮০	ঢাকা-১০	আবু মোঃ সুবিদ আলী	আওয়ামী লীগ
পিই-১৮১	ঢাকা-১১	হামিদুর রহমান	আওয়ামী লীগ
পিই-১৮২	ঢাকা-১২	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	আওয়ামী লীগ
পিই-১৮৩	ঢাকা-১৩	গাজী গোলাম মোস্তফা	আওয়ামী লীগ
পিই-১৮৪	ঢাকা-১৪	ডাঃ মোশাররফ হোসেন	আওয়ামী লীগ
পিই-১৮৫	ঢাকা-১৫	হেদায়েতুল ইসলাম	আওয়ামী লীগ
পিই-১৮৬	ঢাকা-১৬	শফির উদ্দিন	আওয়ামী লীগ
পিই-১৮৭	ঢাকা-১৭	আবদুল হাকিম মাষ্টার	আওয়ামী লীগ
পিই-১৮৮	ঢাকা-১৮	মোঃ আনোয়ার জং	আওয়ামী লীগ
পিই-১৮৯	ঢাকা-১৯	মোঃ জামাল উদ্দিন	আওয়ামী লীগ
পিই-১৯০	ঢাকা-২০	ফকির শাহাবুদ্দিন আহমদ	আওয়ামী লীগ
পিই-১৯১	ঢাকা-২১	মোঃ ময়েজ উদ্দিন	আওয়ামী লীগ
পিই-১৯২	ঢাকা-২২	গাজী ফজলুর রহমান	আওয়ামী লীগ
পিই-১৯৩	ঢাকা-২৩	শামসুদ্দিন ভূঞা	আওয়ামী লীগ
পিই-১৯৪	ঢাকা-২৪	রাজিউদ্দিন আহমদ	আওয়ামী লীগ
পিই-১৯৫	ঢাকা-২৫	মোছলেহউদ্দিন ভূঞা	আওয়ামী লীগ
পিই-১৯৬	ঢাকা-২৬	কাজী শাহবউদ্দিন	আওয়ামী লীগ
পিই-১৯৭	ঢাকা-২৭	ডাঃ সাদাত আলী শিকদার	আওয়ামী লীগ
পিই-১৯৮	ঢাকা-২৮	সাজাত আলী মোক্তার	আওয়ামী লীগ
পিই-১৯৯	ঢাকা-২৯	আফজাল হোসেন	আওয়ামী লীগ
পিই-২০০	ঢাকা-৩০	এস এ সাত্তার ভূঞা	আওয়ামী লীগ
পিই-২০১	ফরিদপুর-১	কাজী হেদায়েত হোসেন	আওয়ামী লীগ
পিই-২০২	ফরিদপুর-২	মোঃ মোছলেম উদ্দিন মৃধা	আওয়ামী লীগ
পিই-২০৩	ফরিদপুর-৩	গৌরচন্দ্র বালা	আওয়ামী লীগ
পিই-২০৪	ফরিদপুর-৪	ডাঃ আফতাবউদ্দিন মোল্লা	আওয়ামী লীগ
পিই-২০৫	ফরিদপুর-৫	ইমামউদ্দিন আহমদ	আওয়ামী লীগ
পিই-২০৬	ফরিদপুর-৬	মোশারফ হোসেন	আওয়ামী লীগ
পিই-২০৭	ফরিদপুর-৭	এ ওয়াই আমিন উদ্দিন আহমদ	আওয়ামী লীগ
পিই-২০৮	ফরিদপুর-৮	সৈয়দ হায়দার হোসেন	আওয়ামী লীগ
পিই-২০৯	ফরিদপুর-৯	কাজী আবদুর রশীদ	আওয়ামী লীগ
পিই-২১০	ফরিদপুর-১০	আখতার উদ্দিন মিয়া	আওয়ামী লীগ
পিই-২১১	ফরিদপুর-১১	শেখ মোশারফ হোসেন	আওয়ামী লীগ
পিই-২১২	ফরিদপুর-১২	সতীশ চন্দ্র হালদার	আওয়ামী লীগ
পিই-২১৩	ফরিদপুর-১৩	ইলিয়াছ আহমদ চৌধুরী	আওয়ামী লীগ
পিই-২১৪	ফরিদপুর-১৪	আছমত আলী খান	আওয়ামী লীগ

Dhaka University Institutional Repository

পিই-২১৫	ফরিদপুর-১৫	আমিনুল ইসলাম	আওয়ামী লীগ
পিই-২১৬	ফরিদপুর-১৬	মোঃ মতিউর রহমান	আওয়ামী লীগ
পিই-২১৭	ফরিদপুর-১৭	আলী আহমদ খান	আওয়ামী লীগ
পিই-২১৮	ফরিদপুর-১৮	মোঃ আবদুর রাজ্জাক	আওয়ামী লীগ
পিই-২১৯	ফরিদপুর-১৯	শ্রী ফণিভূষণ মজুমদার	আওয়ামী লীগ
পিই-২২০	সিলেট-১	আবদুল হাকিম চৌধুরী	আওয়ামী লীগ
পিই-২২১	সিলেট-২	সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত	ন্যাপ
পিই-২২২	সিলেট-৩	আবদুর রইস	আওয়ামী লীগ
পিই-২২৩	সিলেট-৪	শামসু মিয়া	আওয়ামী লীগ
পিই-২২৪	সিলেট-৫	এম এ জহুর	আওয়ামী লীগ
পিই-২২৫	সিলেট-৬	লুৎফর রহমান	আওয়ামী লীগ
পিই-২২৬	সিলেট-৭	কাজী সিরাজউদ্দিন আহমদ	আওয়ামী লীগ
পিই-২২৭	সিলেট-৮	ডাঃ এ মালিক	আওয়ামী লীগ
পিই-২২৮	সিলেট-৯	হাবিবুর রহমান	আওয়ামী লীগ
পিই-২২৯	সিলেট-১০	মোঃ আবদুল লতিফ	আওয়ামী লীগ
পিই-২৩০	সিলেট-১১	মাসুদ আহমেদ চৌধুরী	আওয়ামী লীগ
পিই-২৩১	সিলেট-১২	তায়মুস আলম	আওয়ামী লীগ
পিই-২৩২	সিলেট-১৩	নওয়াব আলী খান	আওয়ামী লীগ
পিই-২৩৩	সিলেট-১৪	তৈয়ুবুর রহিম	আওয়ামী লীগ
পিই-২৩৪	সিলেট-১৫	আলতাফুর রহমান চৌধুরী	আওয়ামী লীগ
পিই-২৩৫	সিলেট-১৬	আজিজুর রহমান	আওয়ামী লীগ
পিই-২৩৬	সিলেট-১৭	এনামুল হক	আওয়ামী লীগ
পিই-২৩৭	সিলেট-১৮	আসাদ আলী	আওয়ামী লীগ
পিই-২৩৮	সিলেট-১৯	ডাঃ আবুল হাশেম	আওয়ামী লীগ
পিই-২৩৯	সিলেট-২০	গোপাল কৃষ্ণ মহারত্ন	আওয়ামী লীগ
পিই-২৪০	সিলেট-২১	আবদুল আজিজ চৌধুরী	স্বতন্ত্র
পিই-২৪১	কুমিল্লা-১	মোজাম্মেল হক	আওয়ামী লীগ
পিই-২৪২	কুমিল্লা-২	সৈয়দ সেরাজুল ইসলাম	আওয়ামী লীগ
পিই-২৪৩	কুমিল্লা-৩	লুৎফুল হাই	আওয়ামী লীগ
পিই-২৪৪	কুমিল্লা-৪	সৈয়দ এমদাদুল বারী	আওয়ামী লীগ
পিই-২৪৫	কুমিল্লা-৫	আহমেদ আলী	আওয়ামী লীগ
পিই-২৪৬	কুমিল্লা-৬	কাজী একবার উদ্দিন আহমদ	আওয়ামী লীগ
পিই-২৪৭	কুমিল্লা-৭	মৌলভী মহিউদ্দিন	আওয়ামী লীগ
পিই-২৪৮	কুমিল্লা-৮	মোজাফর আলী	আওয়ামী লীগ
পিই-২৪৯	কুমিল্লা-৯	আবদুর রশিদ	আওয়ামী লীগ
পিই-২৫০	কুমিল্লা-১০	মোঃ হাশেম	আওয়ামী লীগ
পিই-২৫১	কুমিল্লা-১১	হাজী রমিজউদ্দিন	স্বতন্ত্র
পিই-২৫২	কুমিল্লা-১২	আবদুল আজিজ খান	আওয়ামী লীগ
পিই-২৫৩	কুমিল্লা-১৩	আবদুল হাকিম	আওয়ামী লীগ
পিই-২৫৪	কুমিল্লা-১৪	আমির হোসেন	আওয়ামী লীগ
পিই-২৫৫	কুমিল্লা-১৫	মোঃ আবদুল মালেক	আওয়ামী লীগ
পিই-২৫৬	কুমিল্লা-১৬	আলী আকবর মজুমদার	আওয়ামী লীগ
পিই-২৫৭	কুমিল্লা-১৭	মীর হোসেন চৌধুরী	আওয়ামী লীগ
পিই-২৫৮	কুমিল্লা-১৮	আবদুল আউয়াল	আওয়ামী লীগ

Dhaka University Institutional Repository

পিই-২৫৯	কুমিল্লা-১৯	জালাল আহমেদ	আওয়ামী লীগ
পিই-২৬০	কুমিল্লা-২০	সেকান্দার আলী	আওয়ামী লীগ
পিই-২৬১	কুমিল্লা-২১	আবদুস সাত্তার	আওয়ামী লীগ
পিই-২৬২	কুমিল্লা-২২	এ বি সিদ্দিক সরকার	আওয়ামী লীগ
পিই-২৬৩	কুমিল্লা-২৩	গোলাম মোরশেদ	আওয়ামী লীগ
পিই-২৬৪	কুমিল্লা-২৪	আবদুল করিম বেপারী	আওয়ামী লীগ
পিই-২৬৫	কুমিল্লা-২৫	সিরাজুল ইসলাম পাটওয়ারী	আওয়ামী লীগ
পিই-২৬৬	কুমিল্লা-২৬	মোঃ রাজা মিয়া	আওয়ামী লীগ
পিই-২৬৭	নোয়াখালী-১	এ এফ কে সফদার	আওয়ামী লীগ
পিই-২৬৮	নোয়াখালী-২	মৌলভী খায়ের উদ্দিন	আওয়ামী লীগ
পিই-২৬৯	নোয়াখালী-৩	এ বি এম তালেব আলী	আওয়ামী লীগ
পিই-২৭০	নোয়াখালী-৪	আবু নাসের চৌধুরী	আওয়ামী লীগ
পিই-২৭১	নোয়াখালী-৫	আবদুস সোবহান	আওয়ামী লীগ
পিই-২৭২	নোয়াখালী-৬	মাষ্টার রফিকুল্লাহ মিয়া	আওয়ামী লীগ
পিই-২৭৩	নোয়াখালী-৭	মোঃ শওকত উল্লাহ	আওয়ামী লীগ
পিই-২৭৪	নোয়াখালী-৮	নুরুল আহমেদ চৌধুরী	আওয়ামী লীগ
পিই-২৭৫	নোয়াখালী-৯	মোহাম্মদ উল্লাহ এড.	আওয়ামী লীগ
পিই-২৭৬	নোয়াখালী-১০	বিসমিল্লাহ মিয়া	আওয়ামী লীগ
পিই-২৭৭	নোয়াখালী-১১	মোঃ আবদুল মোহাইমেন	আওয়ামী লীগ
পিই-২৭৮	নোয়াখালী-১২	শহীদউদ্দিন ইসকান্দার	আওয়ামী লীগ
পিই-২৭৯	নোয়াখালী-১৩	সিরাজুল ইসলাম	আওয়ামী লীগ
পিই-২৮০	নোয়াখালী-১৪	আমিরুল ইসলাম	আওয়ামী লীগ
পিই-২৮১	চট্টগ্রাম-১	মোশারফ হোসেন	আওয়ামী লীগ
পিই-২৮২	চট্টগ্রাম-২	অধ্যাপক শামসুল হক	আওয়ামী লীগ
পিই-২৮৩	চট্টগ্রাম-৩	মৌলভি ওবায়দুল হক	আওয়ামী লীগ
পিই-২৮৪	চট্টগ্রাম-৪	মির্জা আবু মনসুর	আওয়ামী লীগ
পিই-২৮৫	চট্টগ্রাম-৫	আবদুল ওয়াহাব	আওয়ামী লীগ
পিই-২৮৬	চট্টগ্রাম-৬	আবদুল্লাহ আল হারুন	আওয়ামী লীগ
পিই-২৮৭	চট্টগ্রাম-৭	মোঃ ইসহাক	আওয়ামী লীগ
পিই-২৮৮	চট্টগ্রাম-৮	জহুর আহমেদ চৌধুরী	আওয়ামী লীগ
পিই-২৮৯	চট্টগ্রাম-৯	ডাঃ এম এ মান্নান	আওয়ামী লীগ
পিই-২৯০	চট্টগ্রাম-১০	ডাঃ আবুল কাশেম	আওয়ামী লীগ
পিই-২৯১	চট্টগ্রাম-১১	সুলতান আহমদ	আওয়ামী লীগ
পিই-২৯২	চট্টগ্রাম-১২	আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবু	আওয়ামী লীগ
পিই-২৯৩	চট্টগ্রাম-১৩	ডাঃ বি এম ফাইজুর রহমান	আওয়ামী লীগ
পিই-২৯৪	চট্টগ্রাম-১৪	সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী	আওয়ামী লীগ
পিই-২৯৫	চট্টগ্রাম-১৫	আহমেদ সগীর শাহজাদা	নেজামে ইসলাম
পিই-২৯৬	চট্টগ্রাম-১৬	জহিরুল ইসলাম	আওয়ামী লীগ
পিই-২৯৭	চট্টগ্রাম-১৭	মোস্তাক আহমেদ চৌধুরী	স্বতন্ত্র
পিই-২৯৮	চট্টগ্রাম-১৮	ওসমান সারোয়ার চৌধুরী	আওয়ামী লীগ
পিই-২৯৯	পার্বত্য চট্টগ্রাম-১	মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা	আওয়ামী লীগ

সূত্রঃ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮-২১ ডিসেম্বর ১৯৭০; ১৮ জানুয়ারি ১৯৭১